শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম

নিবদ্ধঃ প্রেষিতেনায়ং
তদ্ভাবভাবিতাত্মনা।

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
ভাগবত ১০ স্ক, ৬৯ অ, ২৪ শ্লোক।

[চতুর্থ সংস্করণ]

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়
কর্ত্তৃক নিবদ্ধ।

কলিকাতা
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
"নববিধান প্রেস"
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৯৪০ খৃঃ, ১৮৬২ শক।

মূল্য ১৷৷৹ আনা।

অবতরণিকা

ভূতত্ত্ববিদ্গণ পৃথিবীর স্তরসম্বন্ধে যে প্রকার যুগনির্ণয় করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-জগতেও সেই প্রকার যুগের পর যুগ সমাগত হয়। এক যুগ অন্য যুগের সহিত এমনই ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ যে, একটিকে পরিহার করিয়া, অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সমুদায় তত্ত্ব কিছুতেই আয়ত্ত করা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ; তাঁহাদিগের মধ্যে বিরোধ নাই, বিবাদ নাই, অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু জনসমাজ ক্ষীণদৃষ্টি-বশতঃ যেখানে বিবাদ নাই, সেখানে বিবাদ আনয়ন করিয়াছে; যেখানে অসম্মিলন অসামঞ্জস্য নাই, সেখানে অসম্মিলন অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ প্রাকৃতিক ক্রমোন্মেষের মধ্যে নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। ভ্রূণের যখন প্রথমাবস্থা, তখন তাহার সমুদায় দৈহিক যন্ত্র প্রকাশ পায় নাই, একটি যন্ত্র একাই পাঁচটি যন্ত্রের কার্য্যনির্ব্বাহ করে। জনসমাজে ধর্ম্মের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত অতিসুস্পষ্ট। ভ্রূণাবস্থ জনসমাজে ধর্ম্ম অতি সামান্যাকারে প্রকাশ পায়; অথচ উহাই আত্মসমুচিত একটিমাত্র ভাবে মানবীয় বৃত্তিনিচয়ে কথঞ্চিৎ বলবিধানকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যদি মনে করা যায়, প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মে কেবল বাহ্যানুষ্ঠান ছিল, তাহা হইলে সেই বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা যে অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের চরিতার্থতা হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। ভক্তিবৃত্তিতো চরিতার্থ হইতই, জ্ঞানবৃত্তিও তদ্দ্বারা চরিতার্থ হইত। কেন না কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া, প্রতিপদে জ্ঞানবৃত্তিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরি-চালিত হইয়া থাকে।

প্রথমাবস্থায় ধর্ম্ম এইরূপ অমুদ্ভিন্ন অবস্থায় থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। যখন ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বা ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে অভ্যু-দিত হয়, তখন সে সকল পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন থাকে। বিজ্ঞান-বিদ্গণ বলেন, এ পৃথিবী যখন বর্ত্তমান আকার ধারণ করে নাই, তখন প্রথমতঃ বাষ্পাকারে উপাদানগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়ান ছিল। ক্রমে ঘনীভূত হইয়া

আসিল, এবং তাহা হইতে কতকগুলি উপাদান প্রকাশ পাইল। তখনও ইহা বিদিত হয় নাই যে, এই সকল উপাদান চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর আকারে পরিণত হইবে। যে শক্তি প্রথম হইতে অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছিল, সেই শক্তি ক্রমান্বয়ে ভিন্নাকার দান করিয়া, পরিশেষে বর্ত্তমান আকারে ইহাকে পরিণত করিয়াছে। এখন ইহাকে পৃথিবীর আকারে সকলে পরিগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী শক্তি যদি আকার না দিত, তাহা হইলে কোথায় থাকিত সেই সকল জীব, যাহারা আজ পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে, ইহার সমুদায় সম্পৎ সম্ভোগ করিতেছে।

উপরে যতগুলি কথা বলা হইল, তৎসহ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভারতের ধর্ম্মমধ্যে এক মহাশক্তি প্রথম হইতে কার্য্য করিতেছিল। এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জনসমাজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া, তন্মধ্য হইতে ইহার এক একটি উপাদান বিনিঃসৃত করিল। এ সমুদায় উপাদান পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, সেই মহাশক্তি যথাসময়ে এক জন ব্যক্তিকে অভ্যুদিত করিলেন, যিনি দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে ধর্ম্মের যে উপাদানগুলি ছড়ান আছে, তাহার কোনটিকে তিনি ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িলে তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহার প্রকৃতির মূলে সে সমুদায়ের প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল যে, বলপূর্ব্বক সে আকর্ষণকে তিনি কিছুতেই পরিহার করিতে পারেন নাই। তিনি বেদবাদী, বেদান্তবাদী, পৌরাণিক, সাংখ্য ও যোগানুসারী ব্যক্তিগণকে দেখিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা বিরোধে প্রবৃত্ত, কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারেন না, কেহ কাহাকেও স্বীকার করেন না, সকলেই আত্মমতে গর্ব্বিত ও অভিমানী। তিনি মিশিতে গিয়া, কোন এক দলে মিশিতে পারিলেন না। তিনি জানিলেন, আমায় আমার পথে চলিতে হইবে, এবং সেই পথে সকল ভিন্ন ভিন্ন পথের মিলন হইবে। এ ব্যক্তি কে, যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহার উত্তর, এ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যুগের পর যুগ সমাগত হয়, পূর্ব্ব যুগ পর যুগের সহিত ঘনিষ্ঠযোগে সংযুক্ত। মধ্য হইতে কোন একটিকে বাদ দিলে পূর্ব্বাপরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিবাদ বিসংবাদ প্রবৃত্ত হয়, এবং আত্মপক্ষের

গৌরবে জননিচয় স্ফীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ধর্ম্মসম্বন্ধে এই বিরোধ ভঞ্জন করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাকে ভারত তাঁহার জীবনকালেও ভাল করিয়া বুঝে নাই, পর সময়েও ভাল করিয়া বুঝে নাই। এরূপ হইল কেন? ইহার মধ্যে সেই মহাশক্তির কি অভিপ্রায় লুক্কায়িত ছিল, যিনি ধর্ম্ম-মধ্যে নিরন্তর পরিবর্ত্তন এবং পূর্ব্বাপরকে একত্র করিয়া একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী উৎপাদন করিতেছেন? সেই মহাশক্তি কেবল এক ভারতে কার্য্য করিতেছেন, তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে তাঁহার ক্রিয়া চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহাতে এক দেশ ও এক জাতির মধ্যে ধর্ম্মের যে সকল উপাদান বিশ্লিষ্ট ভাবে ছিল, তাহা একীভূত হইল; সকল দেশ, সকল জাতির ধর্ম্মোপাদানকে একীভূত করা বর্ত্তমান যুগের জন্য ছিল। সেই মহাশক্তি যথাসময় সেই যুগধর্ম্ম আনয়ন করিলেন এবং পৃথিবীতে তাহার নাম নববিধান হইল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের তত্ত্ব যেরূপে কেহ পাঠ করে নাই, সেরূপে এ যুগে যে পঠিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে, ইহা কেবল এই বর্ত্তমান যুগের বিশেষ মাহাত্ম্য।

বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবন যে আলোকে পঠিত হইয়াছে, সে আলোক একটি জীবন হইতে সমুত্থিত। যদি সে জীবন সম্মুখে প্রকাশ না পাইত, জীবনলেখকের সাধ্য ছিল না যে, এরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত সামঞ্জস্যের ব্যাপার জনসমাজকে সে কখন জ্ঞাপন করে। আজ কাল শ্রীকৃষ্ণের জীবন এ দেশে অনেকে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিও প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্বজীবন বন্ধুবর্গকে বলিয়া-ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রসম্বন্ধে দেশীয় লোকের যে অনুচিত সংস্কার আছে, সে সমুদায়ই মিথ্যা। বন্ধুগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তবে কেন তাঁহাকে জনসমাজে উপস্থিত করা হয় না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, আজও এ দেশ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহাকে আনয়ন করিলে, তাঁহার জীবনের পবিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া, লোকসকলের চরিত্র, নারীসম্বন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিশেষ ভাব আছে, তদনুসরণে কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে। আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে কোন প্রকারে অপবিত্রতা না আসিতে পারে, তৎপক্ষে তাঁহার এত দূর সুদৃঢ় দৃষ্টি ছিল যে, তিনি এরূপ বিধি করিয়াছিলেন যে,

"যাহাতে সাত শত বৎসরের মধ্যে ব্যভিচার না আসিতে পারে, দেখিতে হইবে।" তিনি পৌত্তলিকতা হইতে ব্যভিচারকে সমধিক পাপ মনে করিয়া, তাঁহার বন্ধুবর্গকে তাহা হইতে দূরে রাখিতে যত্ন করিয়াছেন। "এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে, এ সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক হওয়া সম্ভব, তবু যেন ব্যভিচার পাপ সম্ভব হয় না" এই তাঁহার স্পষ্ট বাক্য ছিল। এই ভাবে পরিচালিত হইয়া, তিনি শেষ জীবনে, কেবল বন্ধুবর্গের বা অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে আপনাকে স্ত্রীসমাজ হইতে দূরে রাখিতেন। যাঁহারা এরূপ অবহিতদৃষ্টি, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে অসময়ে উপস্থিত করিতে শঙ্কিত হইবেন, ইহা তো স্বাভাবিক *। ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়ার কতক দিন পর, এক জন প্রেরিত বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। বর্ত্তমান লেখক সেই প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংযুক্ত করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শকে) মুদ্রিত করেন। এ শাস্ত্রীয়প্রমাণাদিসংগ্রহ, আচার্য্য শ্রীমৎকেশবচন্দ্র সেন যখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের নির্দ্দোষিতার কথা কহিয়াছিলেন, তাহার পর হয়। আশ্চর্য্য এই, তাঁহার বলিবার পূর্ব্বে লেখক সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে এ সকল প্রমাণ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই।

যাঁহার সঙ্গে লেখকের নিত্যকালের সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে, যিনি বিশ্বাসাকারে তাঁহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানের স্থানাধিকার করিয়া আছেন, যিনি মহাজন মহর্ষিগণকে এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবং হৃদয়ে সে সম্বন্ধ বদ্ধমূল করিয়াছেন, যাঁহার সঙ্গে জ্যেষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব এবং বিনেতৃত্বসম্বন্ধ কোন দিন কোন কারণে অপনীত হইবে না, আজ যদি তাঁহার কোন একটী ইচ্ছা লেখক কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন, তাহাতে কেনই বা তাঁহার আহ্লাদ

* আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন, ১৮০২ শকের ১৮ই আশ্বিনের 'একাধারে নরনারীর প্রকৃতি' উপদেশে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উপদেশের চরম ভাগেও তিনি বলিয়াছেন, "যত দিন মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করিতে না পারে, তত দিন পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। যদি নিজের প্রাণের ভিতরে নারী মনের মত পুরুষ না পায়, এবং পুরুষ নারী না পায়, তবে পুরুষ বাহিরে নারী খুঁজিবে এবং নারী বাহিরে পুরুষ খুঁজিবে এবং পরিণামে দুর্নীতি ব্যভিচার উৎপন্ন হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।"

হইবে না? তাঁহার ইচ্ছা ছিল, হিন্দুশাস্ত্র হইতে নববিধান সপ্রমাণ করিয়া, লেখক জগতের নিকটে উপস্থিত করেন। আজ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল। কেবল বচনপ্রমাণে নয়, একটি জীবন আজ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমন্বয়ের ভাবে পরিচালিত হইয়া যাহা নিষ্পন্ন করিয়াছিল, অন্ত পূর্ণ সময়ে মহাসমন্বয়নিষ্পাদক বিধান সমাগত হইয়া, সমুদায় দেশ কাল জাতির ব্যবধান ঘুচাইয়া, ব্যাপকভাবে তাহাই নিষ্পন্ন করিল, 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' ইহাই জগতের নিকটে প্রকাশ করিবে। যাঁহার ভাবে পরিচালিত হইয়া এই গ্রন্থ লিখিত, তিনিই প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা, লেখক কেবল প্রণালীমাত্র। লেখকের জীবনে প্রথম তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ শ্রীকৃষ্ণ হইতে হয়, প্রণালীমাত্র হইয়া যদি সে ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ লেখকের ভাগ্যে ঘটে, তাহাতে তিনি কেনই বা সুখী হইবেন না?

গ্রন্থসম্বন্ধে দু একটী কথা বলা প্রয়োজন। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের' প্রথমাংশ সুলভ পত্রিকায় বাহির হয়। এক জন বন্ধুরূপে পরিচয় দিয়া, বিনানুমতিতে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ইহাতে লেখকের প্রথমতঃ ক্লেশ হয়; কিন্তু এখন দেখিতেছেন, অন্যায় কার্য্য করিয়াও তিনি বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, কেন না তিনি মুদ্রিত না করিলে, হয় তো সুলভের লেখাগুলি বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত না হইয়াই মুদ্রিত হইত। ধর্ম্মের অংশ পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই নাই, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে * * * *

এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রীয়প্রমাণানুসরণে লিপিবদ্ধ। ইতিহাস, জীবনীভূত ভাব, পুর্ব্বাপরসঙ্গতি, এমন কি ব্যাকরণঘটিত সম্বন্ধ পর্য্যন্ত গণনায় না আনিলে, এরূপ প্রমাণসংগ্রহে পদে পদে ভ্রমে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণই যথেষ্ট। ১৪ পৃষ্ঠায় বায়ুপুরাণের একটি বচন এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে উহার পাঠ এইরূপ ছিল, "উগ্রসেনাত্মজায়াঞ্চ কন্যামানকদুন্দভেঃ।" ইহাতে এই অর্থ হইতেছে যে, দেবকী উগ্রসেনের কন্যা। বস্তুতঃ দেবকী উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের কন্যা। বাঙ্গালার অক্ষরের 'থ' একটু উপরিভাগে মিশিয়া গেলে এবং থকারের অন্ত্য মাত্রা নীচের দিকে একটু নামিয়া গেলে 'ঞ্চ' হইয়া যায়।

অবধানশূন্য লিপিকরের হাতে এরূপ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সম্পাদক যদি ইতিহাস, অর্থ ও ব্যাকরণের দিকে একটু দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে 'অথ' শব্দ অনায়াসে বাহির করিতে পারিতেন এবং তাঁহাকে 'দুন্দুভিঃ' শব্দের ইকারকে একারে পরিণত বা তদাকারে অধ্যয়ন করিতে হইত না। এই মুদ্রিত গ্রন্থের পত্রে পত্রে যদি বহু ভ্রম দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে হয়তো লেখককে পাঠগত ভ্রম আর্ষ মনে করিয়া, বায়ুপুরাণের প্রমাণে এও এক মতান্তর বলিয়া স্থির করিতে হইত।

১৮১১ শক।

দ্বিতীয় সংস্করণ

'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তিন বর্ষ পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া, অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়; অথচ নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ সাধারণের ব্যগ্রতাসত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল যে যে স্থলে কিছু ভ্রম ছিল বা পূর্ব্বে কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই, তৎসম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বাক্ ছিলেন, অথবা তাঁহার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হন নাই, এই বলিয়া যাঁহাদিগের ভ্রম আছে, তাঁহারা ১৮০২ শকের ১৮ই আশ্বিনের 'সেবকের নিবেদনে'. 'একাধারে নরনারীপ্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশ, ১৮৭৬ সনের ১০ই ও ২৪শে ডিসেম্বরের এবং ১৮[illegible]১ সনের ১৪ই আগষ্টের সণ্ডেমিরর, ১৮৮১ সনের ৯ই জুন ও ২২শে জুলাই, এবং ১৮৮৩ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বরের নিউডিস্পেনসেশন এবং ১৭৯৮ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই নিঃসংশয় হইবেন। ১৮১৪ শক।

তৃতীয় সংস্করণ

১৮১৯ শকে তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হয়। কিন্তু বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃতিনিবন্ধন অদ্য প্রায় সাত বর্ষ পরে সেই সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু তাঁহার "ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন" মধ্যে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ সহজেই অবধারণ করিতে পারিবেন।

১৮২৬ শক।

সূচীপত্র

বিষয়।					পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রয়োজন				...	১
কি কি গ্রন্থ অনুসর্তব্য				...	৫
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম				...	৯
		বাল্যকাল (১৭—২৭)			
শকটভঞ্জন	...	১৮	কালিয়দমন	...	২৪
পূতনাবধ	...	১৯	ধেনুকবধ	...	২৫
যমলার্জ্জুনভঙ্গ	...	২৩	গোবর্দ্ধনধারণ	...	২৫
		কৈশোর (২৭—৪৫)			
প্রাচীন আচার	...	২৮	রাস	...	৩২
বয়সনির্ণয়	..	২৯	শাস্ত্রপ্রমাণ	...	৩৪
রাসসম্বন্ধে মতভেদ কেন ?				...	৪৫
ভাবোন্মেষ				...	৫০
		মথুরাগমন (৫৬——৫৯)			
বৃষভ ও কেশিবধ	...	৫৬	কংসবধ	...	৫৭
		মথুরায় স্থিতি (৫৯—৬৩)			
উগ্রসেনাভিষেক	...	৫৯	পাণ্ডুপুত্রগণের সংবাদগ্রহণ		৬১
শস্ত্রশিক্ষা	...	৬১	জরাসন্ধসহ যুদ্ধ ও কালযবনবধ		৬২
		দ্বারকায় স্থিতি (৬৪—৭২)			
রুক্মিণীপরিণয়	...	৬৪	অপূর্ব্ব দাম্পত্য	...	৬৯
স্যমন্তকবৃত্তান্ত	...	৬৫	উষাহরণ	...	৭১
			পৌণ্ড্রবধ	...	৭২
		কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ (৭২—২১০)			
পাণ্ডবগণের বিবাহ	...	৭২	জরাসন্ধবধ	...	৭৮
সুভদ্রাহরণ	...	৭৪	শিশুপালবধ	...	৮২
কালিন্দীর পাণিগ্রহণ		৭৬	সাল্ববধ	...	৯১
মিত্রবিন্দাপ্রভৃতির পরিণয়		৭৭	দন্তবক্র ও বিদূরথবধ	...	[illegible]
বংশবিস্তার		৭৭	প্রভাসে সাক্ষাৎকার	...	৯৩

বিষয়।					পৃষ্ঠা।
দ্রৌপদী ও সত্যভামা		৯৮	ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞযোগ	...	১৬৬
দুর্ব্বাসা-সংবাদ	...	১০৩	গুণত্রয়বিভাগ	...	১৬৮
অভিমন্যুপরিণয়	...	১০৪	পরমাত্মতত্ত্ব	...	১৬৯
রাজগণের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি		১০৬	দেবাসুরসম্পদ্বিভাগ	...	১৭১
সারথ্যস্বীকার	...	১১০	গুণভেদে শ্রদ্ধাভেদ	...	১৭২
দূতপ্রতি কৃষ্ণবাক্য	...	১১১	উপসংহার	...	১৭৪
শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য	...	১১৫	সুহৃৎপারবশ্য	...	১৭৮
সৈন্যদর্শন	...	১৩৭	অসত্যভাষণে প্ররোচনা	...	১৮২
সাংখ্যযোগ	...	১৩৮	বিনেতৃত্ব	...	১৮৪
কর্ম্মযোগ	...	১৪৪	সারথ্যে নিপুণতা	...	১৮৮
কর্ম্মার্পণ	...	১৪৭	ছলস্বীকার	...	১৮৮
আত্মসংযম	...	১৫০	গর্ভসংরক্ষণ-প্রতিজ্ঞা	...	১৯১
ধ্যানযোগ	...	১৫২	গান্ধারীর অভিশাপ	...	১৯২
বিজ্ঞানযোগ	...	১৫৫	ভীষ্মদর্শন	...	১৯৩
অধ্যাত্মযোগ	...	১৫৭	দ্বারকাগমন	...	১৯৭
রাজযোগ	...	১৫৯	সমুদ্রবিহার	...	২০১
বিভূতিযোগ	...	১৬১	পরিক্ষিৎ জন্ম	...	২০২
বিশ্বরূপদর্শন	...	১৬৪	যদুকুলধ্বংস	...	২০৪
ভক্তিযোগ	...	১৬৫	পরিশিষ্ট	...	২০৯

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন (২১১—২৮৪)

অনুক্রম ২১১

বৈদিক মত (২১৩—২২১)

কর্ম্ম	...	২১৩	পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ	...	২১৮
অধিকারিভেদ	...	২১৭	সমন্বয়	...	২২০

বৈদান্তিক মত (২২১—২২৯)

আত্মতত্ত্ব	...	২২১	সমন্বয়	...	২২৯
অহংবাদ	..	২২৬			

পৌরাণিক মত (২৩০—২৫১)

পৌরাণিক মতের ভিত্তি		২৩০	ভক্তি	...	২৩৮
ঈশ্বরের বিভূতি	...	২৩১	ভজনীয়	...	২৪৭
অবতারবাদ	...	২৩৪	সমন্বয়	...	২৫০

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সাংখ্যমত (২৫১—২৬৩)

দোষনিরসন	...	২৫১	গুণাতীতত্ব	...	২৬২
পুরুষ	...	২৫৯	বেদের গুণাধীনত্ব	...	২৬৩
গুণত্রয়	...	২৬০			

যোগের মত (২৬৪—২৬৮)

আলম্বন	...	২৬৪	চরিত্রযোগ	...	২৬৭
বিভূতি	...	২৬৭			

ধর্ম্মজীবন (২৬৮—২৮৩)

নিত্যকৃত্য	...	২৬৮	বিশ্বাসের পরীক্ষা	...	২৭৬
কৃষ্ণ কি শৈব ?	...	২৭১	উপদিষ্টত্ব	...	২৭৭
দ্বিজভক্তি	...	২৭২	উপদেষ্টৃত্ব	...	২৭৮
উপেয়বাদিত্ব	...	২৭৪	ভাগবত ও কৃষ্ণচৈতন্য	.	২৮০
ক্ষাত্রধর্ম্ম	...	২৭৫			
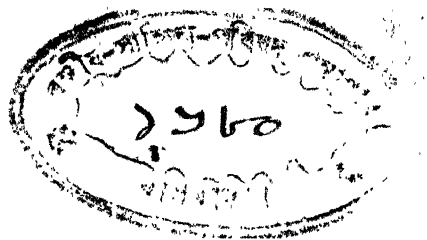
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রয়োজন

জনসমাজ কোন প্রকার বিপ্লবের অধীন না হইলে, কথন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে অবশ্য এমন কোন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিবিধান জন্য তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তৎসময়ের জনসমাজের অবস্থা অবগত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তাঁহার ধর্ম্মের মর্ম্ম সর্ব্বথা অবধারণ করা যাইতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে সংক্ষেপে সে সময়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা সমুচিত।

সাধারণতঃ এ দেশের ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, বৈদিক, বৈদান্তিক ও পৌরাণিক, এই তিন ভাগে উহাকে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এরূপ বিভাগ দেখিয়া সহজে মনে হয়, বৈদিক সময় নিঃশেষ হইয়া বৈদান্তিক সময়, বৈদান্তিক সময় নিঃশেষ হইয়া পৌরাণিক সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এ তিন সময় যে যুগপৎ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে বিকাশলাভ করিয়া চলিতেছিল, যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, পুরাণ শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। এ কথা শুনিয়া অতি অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবেন যে, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্ব্ববংশীয়দিগের সময়ে ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত নিবদ্ধ হইয়াছে। পৌরব ও যাদবগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পূর্ব্বপুরুষ নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদে উল্লিখিত ঋষি ও রাজন্যবর্গের নামানুসারে, পরবর্ত্তী ঋষি ও নরপতিগণের নামকরণ হইয়াছে; সুতরাং বেদোক্ত নাম দেখিয়া, পরসময়ের রাজা বা ঋষি বেদে উল্লিখিত হইয়াছেন, এরূপ মনে করা উচিত নহে। যাঁহারা এরূপ যুক্তি

দেন, তাঁহারা পৌরাণিক ব্যাখ্যার প্রথা অবলম্বন করেন। বেদব্যাখ্যাতৃগণ এরূপ পন্থাবলম্বন করেন নাই, বেদভাষ্য দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বেদান্তে যে সকল গভীর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, বেদে সে সকলের মূল নিবিষ্ট নাই, এ কথাও কেহ বলিতে পারেন না। পৌরাণিক আখ্যায়িকার অধিকাংশ যে বেদসমুৎপন্ন, এবং অনেক ঋষি ও রাজন্যবর্গ যে পুরাণবর্ণিত মহাত্মাদিগের ন্যায় পরিগৃহীত, ইহাও কাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রাধান্য লইয়া স্বতন্ত্র হইলেও, এ তিনের যে যুগপৎ ক্রমোন্মেষ হইয়াছে, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে। তবে এক এক ভাবের বিশেষ প্রাধান্য লইয়া সেই সেই সময়নির্দ্দেশ হইয়াছে, ইহা বলাতে কিছু ক্ষতি নাই। আমরা যাঁহার চরিত্রের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহাতে বেদ, বেদান্ত ও পুরাণের সামঞ্জস্য হইয়াছে বলিয়াই, আমাদিগকে এতগুলি কথা বলিতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে এমন কি বিপ্লব হইয়াছিল, যাহার জন্য তাঁহার আগমনের প্রয়োজন হইল, এক বার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ, এ তিনের প্রসিদ্ধ বিশেষ ভাব যখন অস্ফুট ছিল, তখন তিনে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। কালে এ তিন প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়া, পরস্পর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল এবং কেহ বা বেদের, কেহ বা বেদান্তের, কেহ বা পুরাণের পক্ষপাতী হইয়া, এক অপরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে তিনের বিরোধ এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, কখনও যে এ তিনের সামঞ্জস্য হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহারা বেদবাদী ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু যে অনুসরণীয় বিষয় আছে, অথবা তদ্দ্বারা কোন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা আছে, ইহা স্বীকার করিতেন না। কেবল স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, কর্ম্মত্যাগিগণকে ভ্রষ্ট ও পতিত মনে করিতেন। যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানের অনুসরণ করিতেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বানুভব করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাঁহারা বেদবাদী কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে অজ্ঞানী বালক বলিয়া উপহাস করিতেন। যাঁহারা ভক্তি-পথাশ্রয়ী হইয়া, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণকে অবতীর্ণ ঈশ্বর মনে করত অর্চ্চনা করিতেন, তাঁহারা জ্ঞানিগণের নিকটে ভ্রান্ত, বেদবাদিগণের নিকটে পথভ্রষ্ট

বলিয়া নিন্দিত হইতেন। ইঁহারা আবার স্বপথাশ্রয়িগণের মধ্যেও, ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করিয়া, পরস্পর ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সময়েই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পথাশ্রয়ীরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময়েই ধর্ম্মের প্রতি অনেকের সংশয় সমুপস্থিত হয়, এবং এক দল নিরাত্মবাদী অবসর পাইয়া, সংশয়জাল বিস্তার করে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে, সমাজের উপরে তাহার ক্রিয়া শীঘ্রই প্রকাশ পায়। সমাজমধ্যে যাঁহারা ক্ষমতাশালী, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সংশয়বাদের আশ্রয় লইয়া, নিজ নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হন। সে কালে অধিকাংশ নৃপতি এইরূপে নৃশংসাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক জন আর এক জনের অধিকৃত রাজ্যে বিনাকারণে প্রবিষ্ট হইতেন, এবং যথেচ্ছ ধনাদি লুণ্ঠন করিতেন। এক এক প্রবল রাজা শত শত দুর্ব্বল নৃপতিগণকে আনয়ন করিয়া, বিনাপরাধে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ধনধান্যাদির সঙ্গে নারীগণও লুণ্ঠনসামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া, নৃশংসগণের নিকটে কোন প্রকার দয়া আশা করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সামান্য পরিচারিকা-পদে নিযুক্ত হইতেন; যাঁহারা সৎসাহস প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা বন্দিগণমধ্যে পরিগণিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়সময়ে এ সকল ব্যাপার নিয়ত ঘটিত, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

ধর্ম্মে অবিশ্বাসী রাজন্যবর্গের আচরণ অনেকে মহাভারতাদিতে পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা যে বিপ্লবের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার প্রমাণ কোথায় আছে, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বেদে বেদান্তে পুরাণে এরূপ বিবাদ লিপিবদ্ধ আছে, একটু পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান করিলে, সকলেই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এসকলেতে যাহা লেখা আছে, তাহা বিবাদের সূত্রপাতমাত্র। বলা যাইতে পারে, সে সকল শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাঁহার সময়ের বিরোধ, অনৈক্য ও প্রভেদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কথাতেই তাহা প্রদর্শন করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ (গীতা ২।৪২)।" যাহারা বেদবাদে রত, তাহারা তাহা ছাড়া যে আর কিছু আছে, স্বীকার করে না। এই গেল বেদবাদিগণের অবস্থাবর্ণন। কর্ম্মবিরোধিগণসম্বন্ধে

তিনি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে (গীতা ৩।৪)।" কেবল কর্ম্ম না করিলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্যের ফললাভ হয়, তাহা নহে। যাঁহারা বেদবাদের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, বরং কর্ম্মকে নিন্দা করিতেন, "অবিদ্যয়া বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তে বালাঃ।" অজ্ঞানতাবশতঃ বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মূর্খেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ (গীতা ৯।১১)।" আমি মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া থাকি, মূর্খতাবশতঃ আমায় অবমাননা করে, এইটী গেল ভক্তিপথবিরোধী জ্ঞানগর্ব্বিতগণের ভক্তগণের প্রতি নিন্দাবাদের হেতু। "তেঽপি কৌন্তেয় মামেব যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ (গীতা ৯।২৩)।" তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই যজনা করিয়া থাকে। এখানে বহুদেববাদের উল্লেখ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ এই সকল বিরোধের মীমাংসার উপযোগী। আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষ-বিশেষ-ঘটনা-মধ্যে দেখিতে পাই, সেই সকল ঘটনা তাঁহার জীবনের লক্ষ্যসাধনে কেমন সহায়তা করিয়াছে। মনুষ্য যখন স্বভাবে স্থিতি করে, তখন বিরোধ অবস্থিতি করে না। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ স্বভাবের সীমামধ্যে যখন ছিল, তখন নির্ব্বিবাদে একত্র অবস্থিত ছিল। স্বভাবাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে বিবাদ ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন লোকদিগকে স্বভাবে প্রত্যানয়নের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং স্বভাবে স্থিতি করিয়া, বিবদমান মত সমুদায়ের একতাসাধন করিয়াছেন। অনেক বিভ্রান্তপথবর্ত্তী লোকদিগকে তিনি স্বীয় আচার ও উপদেশের দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতিতে স্থিতি করিয়াও প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন, এবং অপরকেও ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।

পুরাণপ্রণেতৃগণ উপপ্লবের বিষয় বর্ণনা-না-করিয়া, কখন কোন অবতারের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, উপরে যাহা কথিত হইল, তৎসহ তাহার মূলে একতা আছে। যখনই ধর্ম্ম ও নীতির উচ্ছেদ হইয়াছে, এবং পৃথিবীতে দুরাত্মতার বৃদ্ধি হইয়াছে, তখনই ধর্ম্ম ও নীতির পুনঃস্থাপন ও ভূভারহরণ জন্য ভগবানের অবতরণ হয়, পুরাণের এই বিশেষ

মত। যাহারা দুরাত্মা, তাহারা অসুরনামে আখ্যাত; অবতীর্ণ ভগবানের স্বপক্ষ যাঁহারা, তাঁহারা দেবাংশে উৎপন্ন। এ মত পুরাণে কেন, বেদান্তে পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। বেদান্তে সৃষ্টিকালীন ভূত ও ইন্দ্রিয়গণে দেবতা ও অসুরের প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকলেতে ভাল মন্দ উভয়ই যে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, এই দেবাসুরের প্রবেশ। দেবতাগণ প্রথমে প্রবিষ্ট হন, অসুরগণ তাঁহাদিগের উচ্ছেদের জন্য তৎপর প্রবেশ-করে। এই যে দেবাসুরে অতি প্রথম হইতে বিবাদ, ইহাই পুরাণশাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে হৃদয়ে আসুরিক ভাব সকল অতীব প্রবল, সেখানে দেবভাব সিংহাসনবিচ্যুত, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুরাত্মব্যক্তিকে অসুরের অবতার বলিয়া, পুরাণ-কর্ত্তৃগণ কিছু অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। যে সকল ব্যক্তিতে দেবভাব প্রবল, এই একই যুক্তিতে তাঁহারা যে দেবাংশ বা দেবাবতার, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে। দেবগণ নিজ নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে, ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন, তাঁহাদিগের আর উপায়ান্তর কি আছে? স্বয়ং ঈশ্বর দুষ্কৃতিবিনাশ করিয়া, পুনরায় দেবগণকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য অধিকারে স্থাপিত করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে, আমরা যেরূপ উপরে বলিয়াছি, পৃথিবীর যদি ধর্ম্মাদিসম্বন্ধে নিশ্চয় সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণেতে ভগবানের অবতরণ হইয়া, তৎসময়ের দুষ্কৃতিবিনাশ ও উপযুক্ত ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কি কারণ আছে? শ্রীকৃষ্ণের সময়ে কংসাদি অসুর এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দেবাংশপ্রসূত।

কি কি গ্রন্থ অনুসর্ত্তব্য

শ্রীকৃষ্ণের জীবন লিখিতে গিয়া, কোন্ কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন-করিয়া উহা লিখিত হইয়াছে, আরম্ভে বলা একান্ত প্রয়োজন। জীবনসম্বন্ধে সেই সকল গ্রন্থ প্রামাণিক, যাহা সমকালবর্ত্তী লোকগণ কর্ত্তৃক প্রণীত। কৃষ্ণের সমকাল-বর্ত্তী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও পরাশর। যতগুলি পুরাণ আছে, সকলগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত, এইরূপ প্রসিদ্ধ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে

যে পুরাণে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পুরাণগুলির লেখা ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে এত বিপর্য্যয় আছে যে, আভ্যন্তরিক প্রমাণে এক জনের লেখা বা এক সময়ের লেখা বলিয়া সিদ্ধ হয় না। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয় *, স্কন্দ, পদ্ম ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন, কোথাও তাঁহার সম্পর্কে কোন কোন বিষয় বর্ণিত আছে। এতদ্‌-ব্যতীত ভবিষ্যোত্তর পুরাণে দেখা যায়, তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবিধ বিষয় বলিয়াছেন; কিন্তু এই পুরাণখানিতে এমন সকল বিষয় আছে, যাহা বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বক্তার প্রয়োজন নাই, যে কোন ব্যক্তি সে-গুলি বলিতে পারে।

শাস্ত্রপ্রণয়নবিষয়ে মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য সনাতন ও জীব গোস্বামী কৃষ্ণের জীবনীসম্বন্ধে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত মুখ্য-রূপে অবলম্বন করিয়াছেন। যেখানে কোন একটি বিশেষ মত স্থাপন করিতে হইবে, অথচ এই সকল গ্রন্থে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই,

---

* দুঃখের বিষয় এই যে, সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে নারদীয়োক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষাংশ একেবারে নাই। নারদীয়পুরাণমতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৯০০০, মুদ্রিত পুরাণের শেষ ভাগে অতিরিক্ত পত্রিকায় এইরূপ শ্লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে :—

"শ্লোকানাং ষট্ সহস্রাণি তথা চাষ্টশতানি চ।
শ্লোকাস্তত্র নবাশীতিরেকাদশ সমাহিতাঃ॥
কথিতা মুনিনা পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা॥"

মুদ্রিত গ্রন্থে ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সমুদায়ে শ্লোকসংখ্যা ৬২৭৪। উদ্ধৃত শ্লোকানুসারেও মুদ্রিত গ্রন্থে ৬২৯ শ্লোক ন্যূন রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণিত ছিল না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যখন আরম্ভে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, অন্তে থাকিবে না কেন? বিশেষতঃ বৈষ্ণবতোষণীতে (১০ স্ক, ২৯ অ, ১০ শ্লোকে) বাসনাভাষ্যধৃত এই মার্কণ্ডেয় বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, "তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলম্। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকাঃ॥" এই শ্লোকটি দেখাইতেছে, মার্কণ্ডেয় রাসের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ সকল দেখিয়া কে না বলিবেন যে, সোসাইটীর মুদ্রিত গ্রন্থ খণ্ডিতকলেবর।

সেখানে অন্যান্য পুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন, কিন্তু এরূপে প্রমাণিত করিয়াও তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি হয় নাই। এ জন্য তাঁহারা প্রামাণিক গ্রন্থত্রয়ের, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্পষ্টার্থ শ্লোকগুলির দু একটি শব্দ লইয়া এমনই অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন যে, প্রমাণিত বিষয় তাহার মধ্যে অন্তর্ভূত ছিল, এইটি তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের এই টুকুতে প্রয়োজন যে, কৃষ্ণসম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ তাঁহাদিগের মতে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ। কৃষ্ণসম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে, এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বনীয়, আমরাও মনে করি। গোস্বামিগণ মহাভারতের আদর করিতেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মত উহা আদৃত হয় নাই। আমরা মহাভারতের বিশেষ সমাদর করি, কেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রণীত যদি কিছু থাকে, তাহা মহাভারত। হরিবংশ মহাভারতেরই অংশ, লেখা দেখিলে উহা যে মহাভারতের অঙ্গীভূত, ইহাতে বড় সংশয় হয় না। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিলক্ষণ প্রস্ফুট, তবে মহাভারতেও যে কিছু ঈশ্বরত্বের অল্পতা আছে, তাহা নহে। সুতরাং এ দুই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক প্রণীত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অল্প কারণ আছে। মহাভারত ও হরিবংশকে আমরা এই জন্য সর্ব্বপ্রধান অবলম্ব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

মহাভারত ও হরিবংশের পর আমরা বিষ্ণুপুরাণকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিয়াছি। বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশর। তিনি কৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য। হরিবংশাপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণে কোন কোন বিষয়ে আধিক্য আছে, কিন্তু সে সকলেতে এত ব্যতিক্রম ঘটে নাই যে, তাহাতে মূল বিষয়ের প্রতি সংশয় সমুত্থিত হইতে পারে। কাহার কাহার মত এই যে, কোন একটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হইলে, যদি বর্ণনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে বর্ণিত বিষয়টির বিশ্বাসযোগ্যতা বর্দ্ধিত হয়। কেন না বর্ণনাকারিগণ এক জন আর এক জনের অনুসরণ করেন নাই, স্বাধীনভাবে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনাধিক্য অত্যন্ত অধিক। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে

উহার আধুনিকত্বের ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইহার রচনাপ্রণালী মহাভারত হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। রচনার কাঠিন্যদর্শনে অনেকে মুগ্ধবোধব্যাকরণপ্রণেতা বোপদেব এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। শাক্তগণ দ্বেষবশতঃ, কোন এক জন তন্তুবায় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই অপবাদ দিয়া থাকেন। বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রায় আট শত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া, 'মুক্তাফল' নামক গ্রন্থরচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ভক্তমালগ্রন্থের লেখানুসারে ইনি ঐ গ্রন্থের উদ্ধারকর্ত্তা। এক জন বিদ্বেষী শাক্ত রাজা সমুদায় ভাগবতগ্রন্থ নদীজলে নিক্ষেপ করেন। সেই নদী হইতে গ্রন্থ তুলিয়া বোপদেব গ্রন্থ রক্ষা করেন ও উহার শ্লোকসংগ্রহ করেন। সম্ভব এই যে, বোপদেব বিলুপ্ত-পাঠ-সমুদায়ের পুনরুদ্ধার করেন, তাহাতেই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। সমগ্র শাস্ত্রাপেক্ষা ইহার কথা তাঁহাদিগের নিকটে সমধিক প্রামাণিক। এই গ্রন্থমধ্যে যেরূপ উচ্চ ভক্তি ও প্রেমের কথা সকল নিবদ্ধ আছে, বৈরাগ্য-জ্ঞান-যোগাদি সমঞ্জসভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থকে অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। যিনিই এই গ্রন্থের রচয়িতা হউন, এ গ্রন্থ ব্যাসের নামে পরিচিত হইয়া, তাঁহাকে সমধিক গৌরবান্বিতই করিয়াছে। তবে কৃষ্ণের জীবনীসম্বন্ধে প্রমাণ হইলেও, ইহার অত্যুক্তি-দোষ আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিহার করিতে হইতেছে। ভাগবতে রসের আধিক্য। এ বিষয়ে ইহাকে একখানি প্রধান কাব্য বলিলে, কিছু ক্ষতি হয় না। সুতরাং যেখানে কাব্যাংশ আছে, সে সকল স্থলে হস্তসঙ্কোচ করিয়া, আমাদিগকে ইহার প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। ভাগবতের একাংশে যাহা কাব্যাকারে নিবদ্ধ, অন্যাংশে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব আছে বলিয়া, আমাদিগকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। অন্য দুই গ্রন্থের সঙ্গে ইহার মিল অনেকটা এইরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়।

এই তিন গ্রন্থের বিরোধী কোন গ্রন্থকে কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কতকগুলি গ্রন্থ কৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলা অনুচিত প্রণালীতে নিবদ্ধ করিবার জন্য সমধিক ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতায় সত্য

খণ্ডিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামে বৃথা অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তাহা লইয়া যে সকল গ্রন্থে বাড়াবাড়ি, সে সকল গ্রন্থের প্রতি কেনই বা সমাদর প্রদর্শিত হইবে? ইহাতে যে আমরা আমাদের অনুকূল গ্রন্থগুলির পক্ষপাতী, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। যে পদ্মপুরাণ হইতে আধুনিক শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যের বিষয়ে প্রমাণ বাহির হয়, সে পদ্মপুরাণকে আমরা কিরূপে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিব? এ কথা সত্য যে, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে যে সমুদায় ভবিষ্যৎ রাজার বিষয় নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এ দুই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তবে যদি এ কথা অযুক্ত না হয় যে, ক্রমে এই সকল গ্রন্থের অঙ্গবৃদ্ধি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহে হইয়াছে, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সমকালিকত্ব রক্ষা পায়; কিন্তু যখন এ কথা বলিবার উপায় নাই, কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত, কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত নহে, তখন মহাভারত ও হরিবংশকে প্রমাণস্থলে রাখিয়া, তৎসহ সামঞ্জস্যে এ দুই গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অনেকটা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা।

গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থের অনাদর করিতে পারা যায় না। ভাগবতের টীকা ও সন্দর্ভগ্রন্থাদি সময়ে সময়ে প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত হইবে, এবং তাঁহারা মূল বিষয়ে কত দূর প্রমাণ দিতেছেন, তদ্দ্বারা নিশ্চিত হইবে। আধুনিক গ্রন্থনিচয়ের যে সুমহান্ দোষ আছে, সে সকলেরও সময়ে সময়ে উল্লেখ করা যাইবে, তাহার ভাল মন্দ পাঠকেরাই বিচার করিয়া লইবেন। কৃষ্ণসম্পর্কে আধুনিক যে সকল কাব্যগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রতি কিছুতেই আদরপ্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কেন না সেই সকলের অন্যায় বর্ণনেই শ্রীকৃষ্ণের অমন মহত্ত্ব বর্ত্তমান জনসমাজের নিকটে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

শ্রীকৃষ্ণের জীবন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন সমুপস্থিত হয়। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বতন বৃত্তান্তনিচয়ের কালনির্ণয় হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এখন যেমন বর্ষগণনার জন্য শকাদি প্রচলিত, সেরূপ পূর্ব্বে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে মহাভারতের সময়নির্ণয়

হইবার উপায় পুরাণে নিবদ্ধ আছে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সময় নিরূপণ করা সহজ হইয়াছে। কহ্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকে রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুরাণোক্ত * পরিক্ষিতের রাজ্যকাল হইতে গণনা করিয়া, তিনি

---

* মহাভারতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে (২৫। ২৬ শ্লোকে) যেমন, তেমনি বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ২৪ অধ্যায়ের ৩৩। ৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে :—

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥"

সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে নৈঋ‌র্ত ও বায়ু কোণস্থ পুলহক্রতুনামক যে দুইটী তারা প্রথমে উদিত হয়, তাহার মাঝামাঝি দক্ষিণোত্তর রেখায় সমদেশে অবস্থিত অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের এক একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্র সহকারে সপ্তর্ষি এক শত বৎসর অবস্থিতি করিয়া থাকে। পরিক্ষিতের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিল। সেই মঘানক্ষত্রে স্থিতি লইয়াই কহ্লণ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন। বায়ুপুরাণে ৯৯ অধ্যায়ের ৪১৯। ২১। ২২। ২৩ শ্লোকে বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ কালনির্ণয়ের কথা লেখা আছে।

কহ্লণ লিখিয়াছেন :—

"প্রায়স্তৃতীয়গোনন্দাদারভ্য শরদাং তদা।
দ্বে সহস্রে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ম্ ॥
বর্ষাণাং দ্বাদশশতী ষষ্টিঃ ষড়্ভিশ্চ সংযুতা।"

(রাজতরঙ্গিণী, ১ তরঙ্গ, ৫৩—৫৪ শ্লোক)

গোনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের রাজ্যকাল ১,২৬৬, তৃতীয় গোনন্দ হইতে ২,৩৩০ বর্ষ, উভয়ের সমষ্টি, ৩,৫৯৬। কহ্লণের লিখিবার সময় ১০৭০ শক :—

"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ ॥"

(রাজতরঙ্গিণী, ১ তরঙ্গ, ৫২ শ্লোক)

বর্ত্তমানে (গ্রন্থকারের জীবিতকালে তৃতীয় সংস্করণ সময়ে) ১৮২৫ শক, সুতরাং কহ্লণের সময় ১০৭০ হইতে ৭৫৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। কহ্লণের পরিগণিত ৩,৫৯৬ বর্ষের সঙ্গে ৭৫৫ বর্ষ সংযুক্ত করিলে ৪,৩৫১ হইল।

কহ্লণ সংক্ষেপে মহাভারতের কাল এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন :—

মহাভারতের কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। যে সময়ে মহারাজ পরিক্ষিত রাজ্যশাসন করেন, সে সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থিতি করিয়া থাকে। সপ্তর্ষির এই স্থিতি অনুসারে কহ্লণ যখন সময় গণনা করেন, তখন ৩,৫৯৬ বর্ষ ছিল। কহ্লণের সময় হইতে আজ (১৮২৫ শকে) ৭৫৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং এখন ৪,৩৫১ বৎসর মহাভারতের সময়। জ্যোতির্নিবন্ধমতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহগণের বিশেষ বিশেষ রাশিতে স্থিতি অনুসারে গণনায় ৪,৩৫৭ বৎসর হয়। এ দুই গণনায় কেবল ৬ বৎসরের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ ব্যতিক্রম অতি সামান্য। অতএব এই গণনানুসারে ৪,৩৫১ বৎসর শ্রীকৃষ্ণের সময় নির্ণীত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন সাধারণ লোকের জীবনের ন্যায় নহে। বাল্যকাল হইতে তাঁহাতে এমন কিছু অসাধারণতা ছিল, যাহাতে সকলে লোকাতীত বৈভব অনুভব করিত। অনেকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল গণনায় আনিতে চাহেন না। তাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। অসাধারণ লোক-সকলের বাল্যকাল গণনায় না আনা কখন সমুচিত নহে। কেন না যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য সাধারণ লোকসকলের ন্যায় নহে, তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। এ কথা সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে ক্ষাত্র স্বভাবের পরিচয়ই সমধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেন, শৈশব কালে অধিকাংশ বালকে ক্ষাত্রোচিত ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে কালে উৎসাহ উদ্যম এমনই প্রবল যে, একটি ভীরু শিশুও ভয়ের কারণ উপস্থিত না হইলে তেজস্বিতা প্রদর্শন করে। তবে যদি কোন বালক, অপরের দেখিয়া নহে, কেবল স্বভাবের প্রেরণায়, বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গে অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রকাশ-করে, তাহা হইলে তাহাতে যে অধ্যাত্মবিষয়ে কিছু অসাধারণতা আছে, কালে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া বিশেষ আকারধারণ করিবে, ইহা সহজে প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-

---

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী, ১ তরঙ্গ, ৫১ শ্লোক)

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পৃথিবীতে কুরুপাণ্ডবগণের অভ্যুদয় হয়। বর্ত্তমানে (১৮২৫ শকে) কলির গতাব্দা ৫০০৪, তাহা হইতে ৬৫৩ বাদ দিলে, ৪,৩৫১ বৎসর হইল।

জীবনে এরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টিবিষয়ে অসাধারণতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন বলিবার পূর্ব্বে, তাঁহার জন্ম সহ যে সকল ঘটনা অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা অগ্রে বলা সমুচিত। পূর্ব্বকালে শূরসেন নামক নৃপতি মথুরাপুরীতে বাস করেন। সেই হইতে মথুরানগরী যদুবংশীয়গণের রাজধানী হয়। এই শূরসেনবংশে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবকরাজকন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকীর ভ্রাতা * উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ † জ্যেষ্ঠ পুত্র

---

* হরিবংশপাঠে দেবকী কংসের পিতৃষ্বসা হঠাৎ বোধ হয় :—

"তত্রৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং পিতৃষ্বসা।
যোঽস্যা গর্ভোঽষ্টমঃ কংস স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১ অ, ১৬ শ্লোক।

শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী এই "পিতৃষ্বসা" শব্দের অর্থ এইরূপে পরিষ্কার করিয়াছেন—"তত্র পিতৃষ্বসেতি পিতৃসম্বন্ধেন স্বসেতি" —পিতার সম্বন্ধে ভগিনী। বর্দ্ধমান রাজধানী হইতে মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, "তত্রৈষা দেবকী যা তে মথুরায়াং লঘুস্বসা।" এরূপ পাঠান্তর এবং গোস্বামিপাদকর্ত্তৃক অর্থসংস্থান দেবক ও উগ্রসেনের সহোদরত্ববশতঃ সঙ্গত। কংস অনুতপ্ত হইয়া যখন দেবকীর নিকটে অনুনয় বিনয় করে, সে সময়ে দেবকী এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন,—

"মমাগ্রতো হতা গর্ভা যে ত্বয়া কালরূপিণা।
কারণং ত্বং ন বৈ পুত্র কৃতান্তো হ্যত্র কারণম্ ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪ অ, ৫৮ শ্লোক।

কনিষ্ঠা ভগিনী হইতে "পুত্র" সম্বোধন, এ কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যবহার।

† উগ্রসেনপত্নী বনবিহারকালে ছদ্মবেশী সৌভপতিকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হন, তাহাতেই কংসের জন্ম হয়।

"সুযামুনং নাম গিরিং তব মাতা রজস্বলা।
প্রেক্ষিতুং সহিতা স্ত্রীভির্গতা বৈ সা কুতূহলাৎ ॥
* * * *
অথ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ।
ভবিষ্যদ্দৈবযোগেন বিধাত্রা তত্র নীয়তে ॥
* * * *
উগ্রসেনস্য রূপেণ মাতরং তে ব্যধর্ষয়ৎ ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ২৮অ, ৫৮।৬৬।৯২ শ্লোক।

কংস পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া, আপনি মথুরার রাজা হয়। সে নারদ-মুখে * শ্রবণ করে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে বধ করিবে। এই শুনিয়া দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানগুলিকে বধ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হয়। নিরপরাধ বসুদেব ও দেবকীকে রক্ষিগণের দৃষ্টির অধীনে রাখিয়া, দুরাত্মা ক্রমে ছয়টি নব-প্রসূত সন্তান বধ করে। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে নিশীথ সময়ে অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। বসুদেব রজনীযোগে যশোদাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, তাঁহার সদ্যপ্রসূত কন্যা সহ নিজ পুত্রের বিনিময় করেন †। বায়ুপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে এই প্রতীত হয় যে, এই বিনিময়কার্য্য জ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এটি একটি প্রকাণ্ড ষড়্যন্ত্রের ব্যাপার, ইহাও ঐ বায়ুপুরাণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়। সিংহাসনচ্যুত উগ্রসেন কৃষ্ণকে বিনিময় করিবার জন্য উপদেশ দেন, তদনুসারে বসুদেব নন্দগৃহে গিয়া যশোদাকে নিজ পুত্র দিয়া, তাঁহার কন্যা গ্রহণ করেন ‡।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (১০স্ক, ১অ) লিখিত আছে যে. বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন. তখন কংস স্নেহবশতঃ রথের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়। পথে এই দৈববাণী শ্রবণ করে, যাহাকে রথে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, তাহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় বিনাশ করিবে। এই কথা শুনিয়া কংস ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হয়। বসুদেব বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া. পরিশেষে সমুদায় সন্তানগুলিকে জন্মমাত্র তাহাকে অর্পণ করিবেন বলিয়া. পত্নীর প্রাণরক্ষা করেন। দেবকীর গর্ভস্থ পুত্রসন্তান রাজ্যের ভাবী অধিকারী. তাই সে পুত্রসন্তান বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, ইহাই সহজ কথা।

† "বসুদেবস্তু সংগৃহ্য দারকং ক্ষিপ্রমেব চ।
যশোদায়া গৃহং রাত্রৌ বিবেশ সুতবৎসলঃ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব. ৪ অ, ২৫ শ্লোক।

‡ "অনুজ্ঞাতঃ পিত্রা ত্বেনং নন্দগোপগৃহং নয়ন্।
উগ্রসেনমতে তিষ্ঠন্ যশোদায়ৈ তদাদদৎ॥"

বায়ুপুরাণ. ৯৬ অ. ২০৬ শ্লোক।

"যামেব রজনীং জজ্ঞে কৃষ্ণো বৃষ্ণিকুলপ্রভুঃ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত॥
তং জাতং রক্ষমাণস্তু বসুদেবো মহাযশাঃ।
প্রাদাৎ পুত্রং যশোদায়ৈ কন্যান্তু জগৃহে স্বয়ম্॥
দত্ত্বৈনং নন্দগোপস্য রক্ষ মামিতি চাব্রবীৎ।

এই পুত্রকর্ত্তৃক সমুদায় যাদবকুলের হিত হইবে, এইরূপ প্রবোধ দিয়া, এই বিনিময়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাদবকুলের হিত হইবে, এ অনুনয় শুনিয়া, নন্দ কেন আত্মকন্যা তাঁহাকে দিলেন, অনেকের মনে এই সংশয় হইতে পারে। এরূপ সংশয়ের কোন কারণ নাই। নন্দ যাদববংশসম্ভূত, যাদববংশের কল্যাণে তাঁহার কল্যাণ, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। বসুদেবের পিতার বৈমাত্রেয়ভ্রাতার ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। সুতরাং ইনি সম্পর্কে বসুদেবের ভ্রাতা *। সে যাহা হউক, দেবকীর কন্যা জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়াও, দুরাত্মা কংস আসিয়া সেই কন্যাকেই বধ করিতে উদ্যত হয়। কথিত আছে, নিদ্রাদেবী বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; তাই যশোদা নিদ্রাবিহ্বলা হইয়া, পুত্র জন্মিয়াছিল, কি কন্যা জন্মিয়াছিল, বিস্মৃত হইয়া যান। আখ্যায়িকা এই, কংসের হস্ত হইতে নিদ্রাদেবী অপসৃত হইয়া যান, এবং যাইবার বেলা বলিয়া যান, যাঁহার হাতে তাহার মৃত্যু হইবে, তিনি অবতরণ করিয়াছেন। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত এই গ্রন্থত্রয়ের অনুরোধে এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইল। এ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে যাহা লিখিত আছে, তাহাই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। দেবকীর পুত্র জন্মিয়াছে, না জানিতে পাইয়া, কংস কন্যাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় এবং মনে করে যে, কন্যা মরিয়া গিয়াছে। ফলতঃ কন্যা মরে নাই, যদুকুলে গুপ্ত-ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল †।

সুতস্তে সর্ব্বকল্যাণো যাদবানাং ভবিষ্যতি।
অয়ং স গর্ভো দেবক্যা অস্মৎক্লেশান্ হনিষ্যতি॥"
বায়ুপুরাণ, ৯৬ অ, ২০৮—২১০ শ্লোক।

* এই জন্যই ভাগবতে লিখিত আছে, "বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।" (১০স্ক, ৫অ, ১৪ শ্লোক) এস্থলে তোষণীধৃত হরিবংশবচনে "যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভাঃ;" স্কন্দপুরাণবচনে "যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া;" মধ্বাচার্য্য-বাক্যে [ভ্রাতরমিতি] "বৈশ্যকন্যায়াং শূরবৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাৎ;" ব্রহ্মার বাক্যে "স চ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবোঽথ গোপঃ" ভাগবতের উক্তি সুদৃঢ় করে।

"উগ্রসেনাত্মজায়াথ কন্যামানকদুন্দুভিঃ।
নিবেদয়ামাস তদা কন্যেতি শুভলক্ষণা॥
স্বসায়াং তনয়ং কংসো জাতং নৈবাবধারয়ৎ। (স্বসায়াং আর্ষঃ)
অথ তামপি দুষ্টাত্মা বিসসর্জ্জ মুদান্বিতঃ॥

ভাগবতে (১০ স্ক, ৩ অ, ৩৯—৪১ শ্লোক) লিখিত আছে, বসুদেব পুত্র ক্রোড়ে করত গভীর মেঘান্ধকারে ব্রজে গমন করেন। অগাধনীরা যমুনা তাঁহাকে পথ দান করেন। হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫ অ) এ কথার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং এইরূপ লিখিত আছে, নিজ অন্য পত্নী রোহিণীর ব্রজে একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া, বসুদেব সত্বর নন্দকে যশোদা সহ তথায় যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিয়া দেন, নৃশংস কংস হইতে বহু বিঘ্ন সমুপস্থিত হইবে। সুতরাং তাঁহার রোহিণীজাত সন্তানকে যেন অতিযত্নে পালন করেন, নিজ পুত্রের অগ্রজরূপে যেন তাহাকে দেখেন। নন্দ ব্রজে গিয়া কৃষ্ণকে রোহিণীর পুত্রসহকারে একত্র রক্ষা করেন।

ঘোর রজনীতে শত্রুপরিবেষ্টিত মথুরা নগর হইতে বহির্গত হইয়া, ভীষণ যমুনার পরপারস্থ ব্রজে গমন, একটি অসম্ভব না হউক, অতি দুঃসাহসিক কার্য্য। পূর্ব্ব হইতে ষড়্যন্ত্র না থাকিলে, ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ কথা নহে। মথুরা হইতে বহির্গমন সময়ে মন্দমন্দ বৃষ্টি হইতেছিল, অনন্ত সর্প ফণা দ্বারা বৃষ্টিনিবারণ করিতেছিল, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ (৫ অং, ৩ অ, ১৭ শ্লোক) উভয়ই এইরূপ বর্ণন করেন। বিষ্ণুপুরাণের লেখা অনুসারে জানা যায়, নন্দ ও তাঁহার পত্নী বার্ষিককরদানের জন্য ব্রজ ছাড়িয়া যমুনার * পারেই স্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং অধিক হয় তো, বসুদেবকে কেবল যমুনামাত্র পার হইতে হইয়াছিল, দূরস্থ ব্রজে গমন করিতে হয় নাই।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ বর্ণনা করেন, পূর্ণতম, পূর্ণতর, এবং পূর্ণ। তাঁহাদিগের মতে ব্রজে যিনি, তিনি পূর্ণতম; মথুরা এবং দ্বারকায় যিনি, তিনি পূর্ণতর; এবং যুদ্ধবিগ্রহকালে যিনি প্রকট, তিনি পূর্ণ। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তৎকৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে বন্দনায় লিখিয়াছেন, "ব্রজে যিনি গোপ,

---

হৃতা বৈষা যদা কন্যা জপত্যেষ বৃথামতিঃ।
কন্যা সা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা॥"

বায়ুপুরাণ, ৯৬ অ, ২১১—১৩ শ্লোক।

* "কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে।
নন্দাদীন্ গোপবৃন্দাংশ্চ যমুনায়া দদর্শ সঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ৩ অ, ১৯ শ্লোক।

সেই ঈশ্বর কৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর, ক্ষত্রিয় যিনি, তিনি পূর্ণ কথিত হইয়া থাকেন *।" ব্রজ, দ্বারকা, মথুরা ও যুদ্ধস্থলে একই কৃষ্ণ তত্তল্লীলা করিতেছেন, সনাতন রূপ জীবগোস্বামী প্রভৃতি সকলে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণমধ্যে এমন সকল পৌরাণিক গাথা প্রচলিত আছে, যাহাতে ব্রজধামের কৃষ্ণ এবং অন্যত্র প্রকাশমান কৃষ্ণ এক নন, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। সনাতন এবং তদনুগামী গোস্বামিগণ বসুদেব এবং নন্দ এ দুইকে কৃষ্ণের পিতা বলিয়া, বসুদেব অপেক্ষা নন্দকে বাড়াইয়াছেন। বসুদেব শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ চিত্ত, নন্দ শব্দের অর্থ আনন্দ। বসুদেব জ্ঞানপ্রধান ভক্ত, নন্দ প্রেমপ্রধান। বসুদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, নন্দের নিকট সে ভাবে নহে। এক জনের নিকটে ঐশ্বর্য্যের ভাব, আর এক জনের নিকটে তাঁহার মধুর ভাব প্রকাশিত। এ ভেদ কিছু সামান্য নয়। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণবগণ এ পার্থক্যেও সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা মথুরার কৃষ্ণ এবং ব্রজের কৃষ্ণ এ দুয়ের অত্যন্ত-পার্থক্যপ্রদর্শনজন্য একটী আখ্যায়িকার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বসুদেব যখন যমুনা পার হন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে কৃষ্ণ যমুনার জলে পড়িয়া যান। বসুদেব ব্যস্তসমস্ত হইয়া যত্নসহকারে কৃষ্ণকে জল হইতে পুনরুদ্ধার করেন। এরূপ আখ্যায়িকা নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পূর্ণতম ভগবান্, তিনি দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যিনি পূর্ণ বা পূর্ণতর, তিনি জলে নিপতিত হন, এবং সেখানেই থাকেন। বসুদেব যাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া লন, তিনি পূর্ণতম ভগবান্। ব্রজে বিচিত্র-লীলা-করিবার জন্য, ইনি নন্দগৃহে গমন করেন। অক্রূর যখন কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আইসেন, তখন যমুনার জলে স্নান করিবার সময় জলমধ্যে কৃষ্ণকে অবলোকন করেন। এই সময়ে জলস্থ পূর্ণ বা পূর্ণতর কৃষ্ণ রথে উত্থিত হন, রথস্থ পূর্ণতম ভগবান্ পুনরায় যমুনাগত হন। যিনি পূর্ণতম, তিনি নিমেষের জন্যও ব্রজভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে কেবল এই একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা নহে। আর একটী আখ্যায়িকা এই যে, যশোদা এক পুত্র এবং কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব যখন তাঁহার পুত্রকে লইয়া যশোদাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন আত্মতনয়সদৃশ দ্বিতীয় একটি তনয়

---

* "স চেশ্বরো গোপ এব কৃষ্ণঃ পূর্ণতমো ব্রজে।
পুরদ্বয়ে পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥"

দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইবামাত্র, "মেঘে যেমন বিদ্যুৎ বিলীন হইয়া যায়, তেমনই নন্দসুতে বসুদেবসুত বিলীন হইয়া যান।" এ সকল আধুনিক বৃত্তান্তের সারবত্তা পাঠকেরাই অবধারণ-করুন, আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন শঙ্খচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ ছিলেন, পরে বসুদেবের অনুরোধে মনুষ্যাকার ধারণ করেন। বৈষ্ণবগণের মতে চতুর্ভুজ হইতে নরাকারই শ্রেষ্ঠ।

বাল্যকাল

নন্দগোপ যশোদা সহ ব্রজে আগমন করিয়া, রোহিণীপুত্র বলরাম সহ কৃষ্ণের লালনপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌরাণিকেরা বলেন, দেবকীর সপ্তম গর্ভ * হইতে বলদেবকে আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর গর্ভে নিদ্রাদেবী সংক্রামিত করেন, এই জন্য ইহার নাম সঙ্কর্ষণ। ফলতঃ সপ্তম মাসে ভয়প্রযুক্ত দেবকীর সপ্তম গর্ভ পাত হয়, ইহাই মূল কথা। কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে, যাঁহার জীবন সকলের আনন্দবর্দ্ধন, তাঁহারই কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কৃষ্ণের বাল্যজীবনে কতকগুলি বিপৎ সমুপস্থিত হয়, সেইগুলিকে পৌরাণিক-গণ কংসপ্রেরিত অসুরগণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কথিত আছে, কংস যখন জানিতে পাইল, তাহার বধের জন্য শিশু স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতেছে, তখন মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া, তাহাদিগের মন্ত্রণানুসারে, শিশুবধে তাহাদিগকে নিয়োগ করে। শত্রুর জন্মগ্রহণের কথা নারদমুখে শুনিয়া, দুরাত্মা কংস

---

* দেবকীর ছয় গর্ভসম্বন্ধে আখ্যায়িকা এই যে, হিরণ্যকশিপুর ষড়্গর্ভ নামে খ্যাত পৌত্রগণ তপস্যাপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হয়। ইহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। তাহারা পাতালে গর্ভে নিদ্রিত ছিল। বিষ্ণু পাতালে গমন করিয়া তাহাদিগকে নিদ্রাদেবীর হস্তে অর্পণ করেন, এবং দেবকীর ছয় গর্ভে ষড়্গর্ভকে ক্রমে সঞ্চারিত করিতে অনুমতি দেন। সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম, তাহাকে রোহিণীগর্ভে সঞ্চারিত করিতে অনুমতি করেন। আর বলেন, আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিব, তুমি সেই একই সময়ে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিও।

শত্রুপক্ষের লোকদিগের হিংসায় এবং গর্ভবিনাশে অসুরগণকে নিযুক্ত করিল, হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ১অ, ২৬—২৮ শ্লোক) এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ (৫ অং, ৩অ, ২৭—২৮ শ্লোক ও ৪ অ) ও শ্রীমদ্ভাগবত (১০ স্ক, ৪ অ, ৭, ৮, ২২ শ্লোক) বলেন, হস্তনির্ম্মুক্ত যশোদাতনয়ার মুখে, তাহার হন্তা শিশু স্থানান্তরে স্থিতি করিতেছে, এই কথা শুনিয়া, শিশুহনন এবং দেবদ্বিজাদির হিংসায় কংস প্রবৃত্ত হয়। পূতনা প্রভৃতি বালঘাতক গ্রহগণকে কংসের অনুচর বলা, এই জন্য যে, যাহারাই কৃষ্ণের হিংসা করিয়াছে, তাহারা সকলেই অসুরভাবাপন্ন। কংস স্বয়ং অসুরাধিপতি, সুতরাং এ সকল তাহার অনুযায়িবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শকটভঞ্জন

কৃষ্ণের জীবনের প্রথম ঘটনা শকটভঞ্জন *। একদা গৃহকর্ম্মব্যস্তা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে শকটের নিম্নে শয়ন করাইয়া, স্নানার্থ যমুনাতীরে গমন করেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, শকটের চক্রাদি এবং তদুপরিস্থ দধিভাণ্ডাদি যাহা কিছু ছিল, সমুদায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া, সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায়, তিনি প্রথমতঃ হাহতোঽস্মি রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পরে সন্তানকে সুস্থশরীর দেখিয়া আশ্বস্তা হইলেন; কিন্তু স্বামী গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি বলিবেন, এই ভয়ে ভীত হইলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত নন্দ শকট তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মধ্যে মধ্যে বৃষভসকল পরস্পর সংগ্রাম করিয়া শকট ভগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ ঘটনা হয় নাই, অথচ শকট কি প্রকারে ভাঙ্গিল, ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ ছিল। যশোদা এবং নন্দ এই ঘটনার মূল কি, বিচার করিতেছেন, ইত্যবসরে ক্রীড়ানিরত বালকগণ বলিল, এই শিশু পদ দ্বারা শকট বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ভাগবতে (১০ স্ক, ৭ অ, ৮—১০ শ্লোক) লিখিত আছে, গোপগণ অবোধ বালকগণের কথায়

---

* হরিবংশে এটী প্রথম। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে এটি দ্বিতীয়। শকটভঞ্জন তিন মাস বয়সের সময় ঘটিয়াছিল। "ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।" (ভাগবত, ২ স্ক, ৭ অ, ২৭ শ্লোক) "তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অং, ৬অ, ২ শ্লোক) ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের মতানুসরণ করিলে, তিন মাস বয়সের পূর্ব্বে পূতনা বধ হইয়াছিল, বলিতে হয়।

বিশ্বাস করিল না। যশোদা বালগ্রহের উৎপাতাশঙ্কা করিয়া, ভগ্নভাণ্ডাদি এবং শকটের পূজা করিলেন।

পূতনাবধ

দ্বিতীয় ঘটনা পূতনাবধ। শিশুপাল যখন ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের নিন্দা করে, তখন বৃন্দাবনের ঘটনার মধ্যে পূতনাবধাদির উল্লেখ করে; কিন্তু ইহার অলৌকিকত্ব এই বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয় যে, একটা পাখী, বৃষ বা অশ্বকে বধ করা আর আশ্চর্য্য কি, তাহারাতো আর যুদ্ধবিশারদ নহে *। হরিবংশেও পূতনাকে একটি পাখী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রির সময়ে দুই পাখায় ঝাপটা মারিতে মারিতে এবং ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে, শকুনীরূপা কংসধাত্রী পূতনা আসিয়া উপস্থিত। সে কৃষ্ণকে যাই স্তন্য দিতে † প্রবৃত্ত হইল, অমনি তিনি স্তন্যসহকারে তাহার প্রাণ টানিয়া বাহির করিয়া লইলেন। সে ছিন্নস্তন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; তাহার চিৎকারধ্বনিতে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ‡ বালঘাতিনী পূতনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সময়ে রজনীযোগে ব্রজে যে যে শিশুকে সে স্তন্যদান

---

* "যদ্যনেন হতা বাল্যে শকুনী চিত্রমত্র কিম্।
তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম যৌ ন যুদ্ধবিশারদৌ॥"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৪১ অ, ৭ শ্লোক।

† গ্রহাবিষ্ট শিশুগণ স্তন্যত্যাগ করিলে বাঁচে না; তাই হয় তো পূতনাদির বিষাক্ত স্তন্যদান প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

‡ "কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য শকুনী বেশধারিণী।
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পূতনেতি পরিশ্রুতা॥
পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী।
আজগামার্দ্ধরাত্রে তু পক্ষৌ ক্রোধাদ্বিধুন্বতী॥
ততোঽর্দ্ধরাত্রসময়ে পূতনা প্রত্যদৃশ্যত।
ব্যাঘ্রগম্ভীরনির্ঘোষং ব্যাহরন্তী পুনঃ পুনঃ॥
নিলিল্যে শকটস্যাক্ষে প্রস্রবোৎপীড়বর্ষিণী।
দদৌ স্তনঞ্চ কৃষ্ণায় তস্মিন্ সুপ্তে জনে নিশি॥
তস্যাঃ স্তনং পপৌ কৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ বিনদ্য চ।
ছিন্নস্তনী সা সহসা পপাত শকুনী ভুবি॥

করিয়াছে, তাহাদিগের সন্ত মৃত্যু হইয়াছে *, ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাগবত পূতনাকে একটী মূর্ত্তিমূতী স্ত্রীরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ইহাকে যেরূপ মূর্ত্তিমতী করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়। প্রথমতঃ পূতনাকে বালগ্রহরূপে স্পষ্ট নির্দ্দেশ † করিয়া, পরে তাহার মায়াজনিত মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যবর্ণন কবিত্বভিন্ন আর কিছুই নহে। এক দিকে যেমন তাহাকে অতি সুন্দরীরূপে (১০ স্ক, ৬ অ, ৪—৫ শ্লোক), অন্য দিকে তেমনি মৃত্যুসময়ে অতীব ভয়ঙ্করীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এরূপ বর্ণন এক ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে সেরূপ বর্ণন নাই। যখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া বাহির করেন, তখন তাহার বিকট শব্দ কি ভয়ঙ্করভাবে বর্ণিত হইয়াছে! "তাহার অতি গভীর বেগবান্ শব্দে সপর্ব্বত মেদিনী এবং সগ্রহ আকাশ বিচলিত হইল এবং রসাতল ও দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইল। বুঝি, বজ্রপাত হইতেছে, এই আশঙ্কায় লোকসকল ভূতলে নিপতিত হইল ‡।" তাহার পতনকালে ছয়ক্রোশমধ্যে যে সকল

তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্ততো বুবুধিরে ভয়াৎ।
স নন্দগোপো গোপা বৈ যশোদা চ সুবিক্লবা॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬অ, ২২—২৭ শ্লোক।

* "যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সংপ্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ, ৫ অ, ৮ শ্লোক।

† "কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু॥"

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৬ অ, ১ শ্লোক।

"সা খেচর্য্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥" ঐ ৩ শ্লোক।

এ স্থলে মায়াতে স্ত্রীবেশধারণ লিখিত থাকিলেও, খেচরী ও উৎপতন শব্দে পূতনা যে একটি পাখী, তাহাও বুঝাইতেছে

‡ "তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া॥"

ভাগবত, ১০ স্ক, ৬ অ, ১১ শ্লোক।

বৃক্ষ ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া সে ভূতলে পতিত হইল। তাহার দংষ্ট্রা সকল লাঙ্গলদণ্ডপ্রমাণ, নাসিকা গিরিকন্দরতুল্য, স্তন গণ্ডশৈলসদৃশ, অরুণবর্ণ কেশনিচয় প্রকীর্ণ, গভীর চক্ষু অন্ধকূপসদৃশ, জঘনদ্বয় নদীতটতুল্য ভীষণ, ভুজ, উরু ও পদদ্বয় বদ্ধসেতুপম, উদর শূন্যতোয়হ্রদসম ছিল (১০ স্ক, ৬ অ, ১৩—১৫ শ্লোক)। পাঠকগণ এরূপ বর্ণন দেখিয়া, রূপক ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? এই পূতনা যে কংসের আজ্ঞায় বালকগণকে বিনাশ করিতেছিল, তাহাও ভাগবতে উল্লিখিত আছে (১০ স্ক, ৬ অ, ১ শ্লোক)। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, ভাগবতের এই একটি সুমহান্ গুণ আছে যে, এক স্থলে যাহা কবিত্বে মূর্ত্তিমদ্রূপে বর্ণিত থাকে, আবার অন্যত্র তাহা যথাযথ আকারে বিন্যস্ত হয়। এই নিয়মানুসারে আমরা দেখিতে পাই, পূতনাকে অন্য অন্য স্থলে পেচক ও বক * জাতীয় পক্ষী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একটা পাখী মারিয়াছে বলিয়া শিশুপালের যে অবজ্ঞা, তৎসহ হরিবংশ ও ভাগবত উভয়েরই মিল আছে। সে সময়ে ঈগল প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় শিশুহননকারী পক্ষী যে ব্রজের বন্যভূমিতে অনেক ছিল, তাহা বসুদেব নন্দকে যখন সাবধান করিয়া দেন, তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেন, সর্প, কীট, পক্ষী, গোষ্ঠে দুষ্ট বৃষভাদি হইতে বালকগণের সর্ব্বদা ভয় আছে, † অতএব এই দুই বালককে সাবধানে রক্ষা করিবে।

---

* "তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াঃ" (২ স্ক, ৭ অ, ২৭ শ্লোক), "অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী" (৩ স্ক, ২ অ, ২৩ শ্লোক)। ভাগবতের এই দুই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রতীত হয়, পেচক ও বকজাতীয় এক প্রকার হিংস্র পক্ষী সে কালে বৃন্দাবনে ছিল। বর্ত্তমান কালে যে প্রকার "ঈগল" শিশুসন্তান বিনষ্ট করে, সে কালেও বৃন্দাবনের বন্যভূমিতে তাদৃশ কোন পক্ষীর বাস অসম্ভব নহে) কালে সেই হিংস্রজাতীয় পক্ষী লোকের বসতি হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছে। স্তন্যপান লিখিত হওয়াতে প্রতীত হয়, সেই জাতীয় পক্ষীর গলদেশে স্তনাকার থলী ছিল।

† "ন চ বৃন্দাবনে কার্য্যো গবাং ঘোষঃ কথঞ্চন।
ভেতব্যং তত্র বসতঃ কেশিনঃ পাপদর্শিনঃ ॥
সরীসৃপেভ্যঃ কীটেভ্যঃ শকুনিভ্যস্তথৈব চ ॥
গোষ্ঠেষু গোভ্যো বৎসেভ্যো রক্ষ্যৌ তৌ দ্বাবিমৌ শিশূ ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫ অ, ১১—১২ শ্লোক

এখন জিজ্ঞাসা এই, যদি পাখীই হইল, তাহা হইলে সেই পাখীর নাম পূতনা হইল কেন এবং পূতনানামক বালগ্রহের সঙ্গে তাহাকে এক করিয়াই বা কেন গ্রহণ করা হইল? আমরা বিষ্ণুপুরাণের লেখানুসারে জানিতে পাইতেছি, সে সময়ে ব্রজে অনেক শিশু হঠাৎ মরিতেছিল। এ দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে স্তন্যপায়ী শিশুগণের ভিন্ন ভিন্ন রোগের লক্ষণ সমুদায় লেখা আছে বটে, কিন্তু কারণ অবধারণ করিতে না পারাতে, ঐ সকল বালগ্রহাবিষ্টের ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বালগ্রহগণমধ্যে স্কন্দগ্রহ সকলের প্রধান। শকুনী, পূতনা, অন্ধপূতনা প্রভৃতি ইহারই দলবল। গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতকগুলি স্ত্রী। শকুনী পূতনা প্রভৃতি স্ত্রীজাতিমধ্যে গণ্য। এ মত অস্থকার নহে, কৃষ্ণের জন্মের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে ধন্বন্তরি হইতে সমাগত। ধন্বন্তরি কেন, এ মত অতি আদিম বৈদিক সময় হইতে প্রচলিত। এখন জিজ্ঞাসা এই, দুগ্ধপোষ্য শিশুকৃষ্ণ যদি কোন একটি হিংস্র জাতীয় পক্ষী বধ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে বালগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য সেই চিকিৎসাশাস্ত্রেই আছে। সুশ্রুত বলেন, এই সকল গ্রহ যখন দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন লোকেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু ইহারা "বিশ্বরূপ" অর্থাৎ নানা বেশ ধারণ করিয়া নানা সময়ে দুগ্ধপায়ী শিশুর অকল্যাণ সাধন করিতে আসে *। কোন হিংস্র পক্ষী হউক, সর্প হউক, আর যাই হোক, সে সমুদায় সেই স্কন্দগ্রহের পরিবার, তত্তদ্বেশধারণ করিয়া বালকগণকে হিংসা করিতে আইসে মাত্র। হিংসা-করিতে আইসে কেন? পূজা পাইবার জন্য। স্বয়ং রুদ্র তাহাদিগের এইরূপ বৃত্তিনির্দ্দেশ করিয়া

---

* "স্কন্দগ্রহস্তু প্রথমঃ স্কন্দাপস্মার এব চ।
শকুনী রেবতী চৈব পূতনা চান্ধপূতনা॥
পূতনা শীতনামা চ তথৈব মুখমণ্ডিকা।
নবমো নৈগমেয়শ্চ যঃ পিতৃগ্রহসংজ্ঞিতঃ॥
ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্‌প্রদিষ্টাপচারাৎ শৌচভ্রষ্টান্মঙ্গলাচারহীনান্।
ত্রস্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জ্জিতান্ ক্রন্দিতান্ বা পূজাহেতোর্হিংস্যুরেতে কুমারান্॥
ঐশ্বর্য্যাত্তে ন শক্যা বিশন্তো দেহং দ্রষ্টুং মানুষৈর্বিশ্বরূপাঃ।
আপ্তং বাক্যং তৎ সমীক্ষ্যাভিধাস্যে লিঙ্গান্যেষাং যানি দেহে ভবন্তি॥"

সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র ২৭ অ।

দিয়াছেন *। শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, অথচ যশোদা বাল-গ্রহাশঙ্কায় পূজা দিলেন. পক্ষিরূপিণী পূতনার মৃত্যুর পর রক্ষাবন্ধন করিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৫ অং, ৫ অ, ১২—২২ শ্লোক), এটি তৎকালীন জনসাধারণের কুসংস্কার ; যশোদা একা ইহার জন্য নিন্দনীয়া নহেন।

যমলার্জ্জুনভঙ্গ

ভাগবত (১০ স্ক, ৭ অ, ২৩—২৬ শ্লোক) বলেন, কৃষ্ণ চক্রবাত কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হইয়া পরিশেষে ভূতলে রক্ষিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে আমরা ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। এই চক্রবাতকে তৃণাবর্ত্তনামা অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণকর্ত্তৃক যমলার্জ্জুননামক বৃক্ষদ্বয়ভঙ্গ একটি অলৌকিক ব্যাপার। কথিত আছে, নামকরণের পর কৃষ্ণ যখন হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি এত দূর চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, যশোদা তাঁহার সঙ্গে কোনরূপেই পারিয়া উঠিতেন না। একদা তিনি বিরক্ত হইয়া উদূখলের মধ্যে দড়ী দিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিলেন। চঞ্চল বালক তাহাতেও অবরুদ্ধ রহিল না, চলিতে চলিতে যমলার্জ্জুন † নামক দুইটি বৃক্ষ মধ্যে গিয়া উপস্থিত। এ দিকে উদূখলটি তির্য্যগ্ ভাবে বৃক্ষদুইটির মধ্যে বাধিয়া গেল। চঞ্চল বালক বাধা না মানিয়া সবলে টানিবামাত্র বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, অথচ কোন ভয় নাই। সকলে দেখিল, মাঝখানে দাঁড়াইয়া কেবলই তিনি খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন। এই ব্যাপারে নন্দের মনে ভয় হইল। তিনি মনে

---

* "ভাগধেয়ং বিভজ্যঞ্চ শেষং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
তদযুষ্মাকং শুভা বুদ্ধির্বালেষেব ভবিষ্যতি॥"

সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৩৭ অ।

† যমলার্জ্জুন কুবেরের শাপভ্রষ্ট পুত্রদ্বয়, তাহারা কৃষ্ণস্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া স্তব করিল (ভা, ১০ স্ক, ১০ অ, ২৪—৩৩ শ্লোক) ইত্যাদি অলৌকিক কথা হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে নাই। আমরা যে সকল অলৌকিক কথার কোন উল্লেখ করিব না, বুঝিতে হইবে যে, ভাগবত ভিন্ন অপর দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। যথা, ব্রহ্মার গোবৎস-ও-গোপবালকগণ-হরণ অথচ গো-বৎস ও গোপবালকগণের তদ্রূপে স্থিতি, দাবানলপান, যজ্ঞগৃহে প্রভৃত অন্নভোজন, আসুরীবেলায় স্নান করাতে নন্দের বরুণলোকে কারাবরোধ এবং তাহা হইতে বিমোচন, গোপগণের হৃদয় জানিয়া, তাহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদে নিমগ্ন করিয়া বৈকুণ্ঠধামপ্রদর্শন, এবং তথা হইতে উদ্ধার।

করিলেন, এ স্থানে বাস করা আর শ্রেয়স্কর নহে। বহু উৎপাত যখন উপস্থিত, তখন এ বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গমন করা একান্ত প্রয়োজন। যখন ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বসতি নির্ম্মাণ হয়, তখন কৃষ্ণের বয়স সপ্তম বর্ষ।

কালিয়দমন

ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পের পর, সেখানে ভয়ানক ব্যাঘ্রভীতি উপস্থিত হয়। হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮অ, ৩০—৩৮ শ্লোক) বলেন, এটি একটি অলৌকিক ব্যাপার, কেন না কৃষ্ণের বৃন্দাবনগমনের অভিলাষ হইতে এই উৎপাত সমুপস্থিত হয়। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। সে যাহা হউক, এই সময়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলদেব বৎসচারণে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বলরামকে সঙ্গে না লইয়া, যমুনাতটে বিচরণ করিতে করিতে, একটি সুবিস্তীর্ণ হ্রদ অবলোকন করেন। এই হ্রদে কালিয়নামা বিষধর বাস করিত বলিয়া, কোন জীবজন্তু ইহার নিকটবর্ত্তীও হইত না। জলবাসী বৃহৎকায় সর্পসকল প্রাণিহিংসা দ্বারা জীবন যাপন করে, বোধ হয়, তজ্জন্য ভয়বশতঃ পক্ষী আদি জীব সেখানে বিচরণ করিত না। কৃষ্ণের অসমসাহসিকতা এই সর্পের প্রতি ধাবিত হইল। তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষের শিখরোপরি আরোহণ করিলেন, এবং সেখান হইতে ঝম্পদানপূর্ব্বক হ্রদমধ্যে পড়িয়া গেলেন। সেই শব্দে উরগরাজ ফণাবিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। কথিত আছে যে, সর্পপরিবার তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, এমন কি তাঁহাকে ভোগবন্ধনে আবদ্ধ করিল। এতদ্দর্শনে গোপ সকল ভীত হইয়া, ব্রজে গিয়া এই বিষম শঙ্কটজনক ঘটনা জ্ঞাপন করিল। নন্দ যশোদা বলদেব প্রভৃতি সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে হ্রদকূলে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কাহারও কোন সামর্থ্য নাই যে, কিছু উপায় করে। ইত্যবসরে বলদেব গোপগোপীগণের কাতরতায় কাতর হইয়া, কৃষ্ণকে বীরোচিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া ভোগবন্ধন-মুক্ত হইতে বলিলেন। কৃষ্ণ সবলে ভোগি-বেষ্টনোন্মোচন করত, অসম সাহসে সর্পশরীর অবলম্বন করিয়া, একেবারে তাহার মস্তকোপরি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয় মুখে রুধির উদ্বমন করিতে লাগিল এবং একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কথিত আছে, সে

সর্ব্বসমক্ষে সপরিবারে হ্রদ-পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১২অ) *।

ধেনুকবধ

কালিয়সর্পদমনের পর গর্দ্দভাকৃতি বন্য অশ্বতরবধের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্দ্দভজাতীয় অশ্বতর একান্ত দুরন্ত, ইহারা মাংসাশী। বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনের উত্তর যমুনাতটে একটি সুবৃহৎ তালবন ছিল, সেইখানে ইহারা বাস করিত। এই হিংস্র পশুর ভয়ে সেখানে কেহ যাইত না। একদা রাম ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত। সুপক্ক তালফলের গন্ধে আমোদিত হইয়া কৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন, এই তালফল ভূতলে নিপাতিত করা যাউক। ইহা শ্রবণ করিয়া, রোহিণীনন্দন তালবৃক্ষে নাড়া দিয়া, ভূতলে তাল পাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তালপতনশব্দে বন্যাশ্বতরযূথপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলদেবকে পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় দ্বারা বক্ষে আঘাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে সেই দু'পা ধরিয়া তুলিয়া ঘুরাইয়া তালগাছে আছাড় মারিলেন, তাহাতে উহার প্রাণবিয়োগ হইল। এই যূথপতির নাম ধেনুক, তাহার বিনাশে দলের বিনাশ সহজ হইল। যে তালবনে কখন কেহ ভয়ে আসিত না, এখন তাহা নির্ভয়ে বিচরণের স্থান হইল। রৌহিণেয় ধেনুকব্যতীত প্রলম্বনামা অসুরকে বধ করেন। প্রলম্ব মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত বালকগণের সঙ্গে যোগ দিয়া, বলরামকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে দূরে লইয়া যায়। বলরাম প্রথমে ভীত হন, পশ্চাৎ কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাতে মস্তক ভিন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন।

গোবর্দ্ধনধারণ

এই ঘটনার পর গোবর্দ্ধনধারণ। এতক্ষণ আমরা যতগুলি ঘটনা লিখিলাম, সেগুলির মধ্যে কৃষ্ণের জীবনে ধর্ম্মসংস্থাপন যে একটি ভাবী গুরুতর ব্যাপার নিহিত আছে, তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। গোবর্দ্ধনধারণ যত কেন

* কালিয়সর্পের স্ত্রীগণের স্তুতিবাক্য হরিবংশে নাই, কালিয় তাঁহার শরণাপন্ন হইল, এইমাত্র আছে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ১২ অ)। কবি কালিয়মুখে মানবীয় কথাও তুলিতে পারেন, সপরিবারে স্তব করিল, ইহা লিখিতেও স্বাধীন। স্তুতিবাক্য ভাগবতে (১০ স্ক, ১৬অ, ২৯—৫২ শ্লোকে) এবং বিষ্ণুপুরাণে (৫ অং, ৭ অ, ৪৭—৭৩ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়।

অদ্ভুত ঘটনা হউক না, আমাদিগের নিকট এই লক্ষণ-প্রকাশের জন্য উহা মূল্যবান্। যখন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মের কথা বলা হইবে, তখন এই ঘটনাটী তৎসহ কি প্রকারে সংযুক্ত, লেখা যাইবে; এখন কেবল সংক্ষেপে তদ্‌বৃত্তান্ত নিবদ্ধ করা যাইতেছে। কৃষ্ণ দেখিলেন, নন্দাদি গোপগণ বড় একটি যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বড় আয়োজন কিসের জন্য? একজন বৃদ্ধগোপ তাঁহাকে বলিলেন, ইন্দ্র জলবর্ষণ দ্বারা লোকের আজীব শস্য উৎপাদন করেন, তাই তাঁহার উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলিলেন, আমরা বনবাসী গোপজাতি গোধনজীবী, গোসকলই আমাদিগের দেবতা। যদ্দ্বারা যাহার বিত্তলাভ হয়, তাহাই তাহার পূজনীয়। সুতরাং বন ও গোবর্দ্ধনগিরি এবং গো ও ব্রাহ্মণ আমাদিগের পূজ্য; অতএব আমার মতে গিরিযজ্ঞ আমাদিগের অনুষ্ঠেয়। যাহা হইতে বৃত্তিলাভ হয়, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া, অপরের অর্চ্চন ইহ-পরলোকে কাহারও মঙ্গলের জন্য হয় না *। গোপগণ তাঁহার কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া, শক্রযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া, সেই আয়োজনে গিরিগোবর্দ্ধনাদির অর্চ্চনা করে। কথিত আছে, এই ঘটনায় ইন্দ্র একান্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং সাত দিন সাত রাত্রি ঘোরতর জলবর্ষণ করেন। ইহাতে গোপগণ অনাহারে বর্ষোৎপীড়নে মৃতপ্রায় হয়। প্রবাদ এই, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি উৎপাটন-করিয়া ছত্রাকারে ধারণ করেন, গিরিগর্ভে গো গোপ গোপাল ও গোপীগণ প্রবিষ্ট হইয়া, অতিবর্ষণের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। গোবর্দ্ধনধারণ এত বড় একটী প্রসিদ্ধ কথা হইয়া গিয়াছিল যে, শিশুপাল এটী আর কিছু বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে নাই, এই বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে যে,

---

* "বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধনজীবিনঃ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ॥
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্।
গাবোঽস্মাকং পরা বৃত্তিরেতত্ত্রৈবিদ্যমুচ্যতে॥
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং পরম্।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিণী॥
যোঽন্যস্য ফলমশ্নানঃ করোত্যন্যস্য সৎক্রিয়াম্।
দ্বাবনর্থৌ স লভতে প্রেত্য চেহ চ মানবঃ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১৬ অ, ২—৫ শ্লোক।

বল্মীকসদৃশ একটি সামান্য পর্ব্বত সপ্তাহকাল ধরিয়া থাকা আর একটা বিচিত্র ব্যাপার কি *? গোবর্দ্ধনগিরি যাঁহারা এখন দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, উহার কতক অংশ নীচে নামিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, পূর্ব্বে ঐ স্থলে একটি বৃহৎ গহ্বর ছিল †।

কৈশোর

কৃষ্ণের কৈশোর বয়সের ঘটনা ধর্ম্মরাজ্যে অতি অসামান্য ব্যাপার। বৈষ্ণবগণ এই বয়সের ঘটনাগুলিকে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বপ্রতিপাদনজন্য, তাঁহারা কৈশোর বয়সের প্রারম্ভভাগকেও পূর্ণ কৈশোর বয়স করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষের অধিককাল বৃন্দাবনে ছিলেন না, এ স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, সেই একাদশ বর্ষের পূর্ব্বে, তাঁহারা কৈশোরের পূর্ণতা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু অন্যের এরূপ স্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। স্বীকারে কোন লাভও নাই, কারণ যে কালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কৈশোর বয়স বাল্যকালের মধ্যে গণ্য ছিল এবং সে সময়ে বালচাপল্য ভিন্ন অন্য কোন যৌবনোচিত প্রবৃত্তি সামাজিককুলপ্রথাবশতঃ উদ্দীপ্ত হইত না। তাৎকালিক শারীরবিদ্যামতে একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর; ষোড়শ হইতে সোত্তর বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যম বয়স। বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত শারীরিক উপাদান সকল বর্দ্ধনশীল থাকে অর্থাৎ তখনও শরীরের গঠন পূর্ণতালাভ করে না, পঞ্চবিংশে উহার পূর্ণতা হয়।

---

* "বল্মীকমাত্রঃ সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ।
তথা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম॥"

(মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৪১ অ, ৯ শ্লোক)

† গোবর্দ্ধনধারণের পূর্ব্বে বস্ত্রহরণ কেবলমাত্র ভাগবতে (১০ স্ক, ২২ অ) দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হইল। গোস্বামিগণ এ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম বর্ষ বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে বালচাপল্য ভিন্ন অবিশুদ্ধ ভাব কাহারও মনে উদিত হইতে পারে না।

বিংশতির পর ত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন, ত্রিংশৎ হইতে চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতু ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের বলবীর্য্যের পূর্ণতা। ইহার পর হইতে সোত্তর বর্ষ পর্য্যন্ত ঈষৎ ক্ষয় লক্ষিত হয়। সোত্তর বর্ষের পর বার্দ্ধক্য।

প্রাচীন আচার

কৃষ্ণের সমসমকালে কৈশোর কেন, তদতিরিক্ত সময়ও যে বিশুদ্ধ ভাবে অতিবাহিত হইত, তৎকালের আচার ব্যবহার দ্বারা তাহা সহজে সপ্রমাণ হয়। সে কালে দ্বিজজাতিমাত্রে প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যে অনেক সময়ে ছত্রিশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতে হইত। যখন ইহার ন্যূন বয়সে কাহারও সমাবর্ত্তন হইত, তখন চতুর্ব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষ না হইলে পরিণয় হইত না। কিন্তু এই পরিণয়ের পরও পত্নীর পূর্ণ-বয়সপ্রতীক্ষায় প্রায় চারি বৎসর কাল সংযতমনাঃ থাকিতে হইত। ফলে এই দাঁড়াইত যে, উভয়ের শরীরাবয়ব ও ধাতুনিচয়ের পূর্ণতা উপস্থিত না হইলে, কেহ স্বামিস্ত্রীরূপে একত্র বাস করিতে পারিত না। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ, সেখানে এতৎসদৃশ আচার আজও কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে।

যাহা লিখিত হইল, তাহার প্রাচীন একটি দৃষ্টান্ত না দেখাইলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন না যে, সে কালের আর্য্যগণ কি প্রকার বিশুদ্ধভাবে যৌবনের পূর্ব্বকাল অতিবাহিত করিতেন। শুক্রকন্যা দেবযানীকে যযাতিনৃপতি বিবাহ করেন। এই দেবযানী বৃহস্পতিপুত্র কচের প্রতি অনুরাগিণী হন। কচ শুক্রের শিষ্যত্বস্বীকার করিয়া আচার্য্যসেবায় নিরত হন। দেবযানী একমাত্র শুক্রের প্রিয়তমা যুবতী কন্যা ছিলেন। শিষ্য কচকে শুক্র দেবযানীর সেবায় নিযুক্ত করেন। কচ দেবযানীকে পরিতুষ্ট রাখিবার জন্য, পুষ্পাদি তুলিয়া আনিয়া উপহার দিতেন, নৃত্যগীতাদি সকলই করিতেন। দেবযানাও তাঁহার সঙ্গে নৃত্যগীতাদি করিতেন। দেবযানী ভিতরে ভিতরে তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অখণ্ডবিধানবশতঃ এক দিনও কচের নিকটে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। পরিশেষে কচের যখন সমাবর্ত্তন হইল, তখন দেবযানী বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কচ তাঁহার প্রার্থনা এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি তাঁহার আচার্য্যকন্যা, সহোদরাসদৃশা; তিনি সে দৃষ্টি ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে কখন তাঁহাকে

দেখেন নাই। সুতরাং তিনি এরূপ অনুচিত প্রার্থনায় কখন অনুমোদন করিতে পারেন না।

বয়স নির্ণয়

গোস্বামিগণ নবমবর্ষে পূর্ণ-কৈশোর স্থাপন করুন, আর যাই করুন, তৎকালের সামাজিক অবস্থা কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুচিত অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে দিতেছে না। কৈশোরবয়সে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। এই রাসসম্বন্ধে লোকের মনে যে প্রকার অনুচিত সংস্কার আছে, তাহা অপনয়ন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ * এবং গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কুকাব্য এই রাস হইতে আরম্ভ করিয়া, তৎপরের ব্যবহারগুলি সাধারণ লোকের নিকটে যে প্রকার অশ্লীলভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ করিয়াছে। কৃষ্ণ যদি কৈশোরধর্ম্মাতিক্রম করিয়া যথেচ্ছাচরণ করিয়া থাকেন, ইহা সপ্রমাণ হয়, তবে তিনি আমাদের হৃদয়ে যে আসনলাভ করিয়াছেন, সে আসন তাঁহাকে দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। তিনি এক জন অসাধারণ উপদেষ্টা হইতে পারেন, কিন্তু আত্মজীবনে যোগের নবীন অভিনয় দেখাইবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, এ কথায় আর বিশ্বাস তিষ্ঠিতে পারে না। পৌরাণিকগণমধ্যে যাঁহার যত কদর্য্য রুচি ছিল, নির্দোষ শ্রীকৃষ্ণের উপরে তাহা চাপাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! একটি নবম বা দশমবর্ষবয়স্ক-বালকের উপরে ভয়ানক ব্যভিচারীর ব্যবহারারোপ, ইহা অপেক্ষা নির্দ্দোষীকে দোষী করিবার পক্ষে আর কি অধিক উৎপীড়ন হইতে পারে! মহাভারত-হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিয়া, ঈদৃশ দাবারোপ কেন হইল, কিছুই বোঝা যায় না।

হাত্মা শ্রীচৈতন্যের অনুগামী গোস্বামিপাদগণ বিধানালোকে যে সকল তত্ত্ব-নিরূপণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি সহজে সকলের আস্থা সমুপস্থিত হইবে। কৃষ্ণের বয়স সম্বন্ধে তাঁহারা কি লিখিয়াছেন, একবার দেখা যাউক। অপ্রকট এবং প্রকট লীলাবিষয়ে কৃষ্ণসন্দর্ভ তত্ত্বনির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন, ব্রজে পূর্ণ কৈশোর-ব্যাপী লীলা জানিবে †। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত

---

* অনুচিতবর্ণনবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আদর্শ। সুতরাং তদ্বিষয়ে উহা প্রধানরূপে এ স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে।

† "অত্র পূর্ণকৈশোরব্যাপিন্যেব ব্রজে প্রকটলীলা জ্ঞেয়া।"

হইয়াছে ঃ—"ইঁহারা এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হন নাই, কিশোরবয়স্ক, অতিকুমারাঙ্গ, ইঁহারা বা কোথায়।" "আমরা তোমাদের পুত্র, আমাদের জন্য তোমরা নিত্যোৎকণ্ঠিত, আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর তোমাদের [সুখের কারণ] হইল না, আমাদের হইতে তোমাদের কিছু হইল না।" "অরবিন্দলোচন গজেন্দ্র-গমন শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্ভলীলা এবং হসিতাবলোকন দ্বারা লক্ষ্মীপতিত্বে নয়নের উৎসব-দানপূর্ব্বক সেই নারীগণের মনোহরণ করিলেন *।" এই সকল প্রমাণে পূর্ণ কৈশোরকাল ব্রজে অবস্থিতি-স্থাপন করিয়া, একাদশ বর্ষই যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পূর্ণ কৈশোর ছিল, ইহা সন্দর্ভকারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জন্যই তিনি লিখিয়াছেন "[পিতা কংসের ভয়ে, নন্দের ব্রজে লইয়া গিয়াছিলেন] সেখানে গূঢ়প্রভাব হইয়া একাদশ বর্ষ বলরাম সহ বাস করিয়াছিলেন", এই প্রমাণে একাদশ বর্ষেই পূর্ণ কৈশোর জানিতে হইবে †। ইহার প্রমাণস্বরূপ এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, "হে রাজর্ষি, অল্প কালের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ জানু মাটীতে ঘর্ষণ না করিয়া, পায়েতেই তেজের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ‡।" 'গূঢ়ার্চ্চি' শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে, 'কোথাও অগ্নি গূঢ়দীপ্তি হইয়া থাকিলে, যেমন যে কাষ্ঠ তাহার নিকটে উপস্থিত হয় তাহাকে দহন করে, সেইরূপ গোপলীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব নিগূঢ় ছিল, কিন্তু যে অসুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে দহন করিয়াছেন §।" "একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গূঢ় প্রভাব, তৎপর পঞ্চদশ পর্য্যন্ত প্রকট প্রভাব, এরূপ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা ঘটে না, কেন না সেই একাদশবর্ষ মধ্যেই সেই সেই প্রভাব মধ্যে মধ্যে প্রস্থত

---

* "ক চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ। (১০স্ক, ৪৪অ. ৭ শ্লোক)" "নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি। বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ॥ (১০ স্ক, ৪৫ অ, ৩ শ্লোক)" "মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ। জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্॥ (১০স্ক, ৪১অ, ২৪ শ্লোক)"

† "একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ। (৩ স্ক, ২ অ, ২৬ শ্লোক)" "ইত্যনেনৈকাদশাভরেব সমাপ্তিস্তস্য পূর্ণকিশোরত্বং জ্ঞেয়ম্।"

‡ "কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা॥" (১০ স্ক, ৮ অ, ১৯ শ্লোক)

§ "যথা গূঢ়ার্চ্চিঃ কুত্রাপ্যগ্নিঃ প্রাপ্তং প্রাপ্তমিন্ধনং দহতি, তথা গোপলীলয়া গূঢ়প্রভাব এব সন্ প্রাপ্তং প্রাপ্তমসুরবৃন্দং দহন্নিত্যর্থঃ।" (৩ স্ক, ২অ. ২৬ শ্লোক—ক্রমসন্দভ)

হইয়াছে *।" কৃষ্ণসন্দর্ভের এই লেখা দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের একাদশ বর্ষ কাল ব্রজে স্থিতি গোস্বামিগণকর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

"আমরা তোমাদের পুত্র, আমাদের জন্য তোমরা নিত্যোৎকণ্ঠিত †" এই শ্লোকটির ব্যাখ্যানস্থলে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী—"কোথায় সপ্তমবর্ষের বালক, আর কোথায় মহাপর্ব্বত-ধারণ" "একাদশ বর্ষ পর্যন্ত গূঢ়প্রভাব হইয়া তথায় বলরাম সহকারে বাস করিয়াছিলেন ‡"—এই দুইটি শ্লোককে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া এইরূপ বর্ষ গণনা করিয়াছেন:—প্রথম বর্ষ পূর্ণ § হইলে তৃণাবর্ত্তবধ, তৃতীয়বর্ষারম্ভে কার্ত্তিকমাসে দামোদরলীলা, তাহার কয়েক দিন পরে বৃন্দাবন-প্রবেশ, বৃন্দাবনপ্রবেশের দুই তিন মাস পরে বৎসচারণ এবং বৎস, বক ও ব্যোমাসুরের বধ, চতুর্থ বর্ষের আরম্ভে শরৎকালে বালবৎস-হরণ, পঞ্চম বর্ষে গোচারণারম্ভ, পঞ্চমবর্ষের গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন, সপ্তম বর্ষে ধেনুকবধ, সপ্তমের গ্রীষ্মকালে প্রলম্ববধ, অষ্টমের আশ্বিনে বেণুগীত, কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধন-ধারণ ||, অষ্টম বর্ষের আরম্ভে কার্ত্তিক শুক্ল একাদশীতে (ইন্দ্র কর্ত্তৃক) অভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণলোকগমন, পূর্ণিমায় ব্রহ্মহ্রদাবগাহন ¶, হেমন্তে বস্ত্রহরণ, গ্রীষ্মে

---

* "একাদশপর্যান্তং গূঢ়ার্চ্চিঃ ততঃপরং পঞ্চদশপর্যান্তং প্রকটার্চ্চিরিতি সাধ্যাহারং ব্যাখ্যানং ত্বঘটমানঞ্চ। একাদশাভ্যন্তরে তত্তৎপ্রভাবস্য মধ্যে মধ্যে প্রসৃতত্বাদিতি।"

(৩ স্ক, ২ অ, ২৭ শ্লোক—ক্রমসন্দর্ভ)

† "নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত" এই শ্লোক ৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

‡ "ক সপ্তহায়নো বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণম্। (১০ স্ক, ২৬ অ, ১১ শ্লোক)" "একাদশ-সমাস্তত্র" পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

§ "একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা। (১০ স্ক ২৬ অ, ৬ শ্লোক)" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে এই সকল বয়স নির্ণীত হইয়াছে। কোথাও কোথাও হরিবংশ সহ বর্ষনির্ণয়ে একটু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

|| গোবর্দ্ধনধারণ অষ্টম বর্ষে। "ক সপ্তহায়নো বালঃ (ভাগবত, ১০স্ক, ২৬অ, ১১ শ্লোক)" এস্থলে সপ্তমবর্ষ বলা স্নেহবশতঃ। "তদ্ধারণঞ্চ তৎপূজাসময়কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদানন্তরতৃতীয়ায়া-মেব গম্যতে। বর্ষপূরণসময়স্তু গৌণভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যামিতি মাসদ্বয়দিনদশকাধিক্যেঽপি বাৎসল্যাৎ সপ্তবর্ষমাত্রতাং তে শ্লোক্তবন্তঃ। (ভাগবত, ১০স্ক, ৪৫ অ, ৩ শ্লোক বৈষ্ণবতোষণী)"

¶ এই সকল অলৌকিক বৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে নাই বলিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই। ২৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে এ সকলের উল্লেখমাত্র হইয়াছে।

যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ, নবম বর্ষের শরৎকালে রাসলীলা, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশীতে অম্বিকাবনযাত্রা, ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে শঙ্খচূড়বধ, দশম বর্ষে স্বেচ্ছানুরূপ লীলা, একাদশ বর্ষের চৈত্র পূর্ণিমাতে অরিষ্টবধ, দ্বাদশ বর্ষের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশিবধ, ফাল্গুনের চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। গোস্বামিপাদ অসময়ে পৌগণ্ডকৈশোরাদি শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বর্ষে পৌগণ্ড উপস্থিত হয়। সপ্তমের আরম্ভে কৈশোরে প্রবেশ এবং নবম বর্ষের অন্তে পূর্ণ কৈশোর হয়। (১০স্ক, ৪৫অ, ৩ শ্লোকের টীকা—বৈষ্ণবতোষণী) প্রীতিসন্দর্ভে কৈশোর কালের উপস্থিতি আরও একটু অগ্রসর করিয়া লওয়া হইয়াছে। "বাল্যকালেও ভগবান্ কৃষ্ণ কৈশোররূপ আশ্রয় করিয়াছেন *" এই প্রমাণাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে, গোপীগণের ভাবাবির্ভাবসময়ে বাল্যকালেও শ্রীকৃষ্ণেতে কৈশোরাবির্ভাব হইত। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণেতে অবিচ্ছেদে কৈশোরাবির্ভাব সন্দর্ভে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ তাঁহার মহাতেজস্বিতা †।

রাস

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে স্ত্রীপুরুষে একত্র হইয়া নৃত্যগীতাদিতে আমোদ প্রমোদ করা প্রচলিত ছিল। এখন আর সেরূপ এ দেশে দেখা যায় না। তবে অনেক গুলি স্ত্রী বা স্ত্রীপুরুষে হাত ধরাধরি করিয়া, গান করিতে করিতে, মণ্ডলাকারে নৃত্য আজও বন্যজাতিমধ্যে আছে। রাস তাদৃশ নৃত্য গীত ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণানুষ্ঠিত রাসের ঘটনা এই, একদা শারদায় শশীর শোভা দেখিয়া, তাঁহার আমোদে অভিলাষ হইল। তিনি ব্রজের পথে বৃষসকলকে পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন; বলবান্ গোপবালকদিগকে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন; দুর্দ্দান্ত গোসকলকে অসমসাহসপ্রদর্শনপূর্ব্বক রোধ করিতে লাগিলেন ‡।

---

* "বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোররূপমাশ্রিতঃ।"

† "অথ মহাতেজস্বিতয়া ষষ্ঠং বর্ষমেবারভ্য কৈশোরাবির্ভাবাবিচ্ছেদে সতি তাসামপি পুনঃ পূর্ব্বরাগো জায়তে।"

‡ "কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চান্দ্রমসো নবম্।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥

এখানেই আমোদের শেষ হইল না। তিনি গোপকন্যাসকলকে একত্র সমবেত করিলেন। গোপকন্যাগণ পংক্তি বাঁধিয়া, দুই দুই জন একত্র হইয়া, তাঁহার চরিত্র গান এবং নৃত্য গীতের অনুকরণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে কি কৃষ্ণ একা ছিলেন, না, বলদেব সঙ্গে ছিলেন? বিষ্ণুপুরাণ বলেন, তন্ত্রীসমুত্থিত বিবিধ স্বরে গোপকন্যাগণকে আকৃষ্ট করিয়া যখন আনয়ন করা হয়, তখন সুললিততানলয়সমুত্থানে বলদেব তাঁহার সহচর ছিলেন *। সেই স্থলে নৃত্য-প্রণালী যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণ স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছিলেন, গোপকন্যাগণ তাঁহার গানের সঙ্গে গান করিয়া করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে এক বার দূরে যাইতেছিল, আর এক বার তাঁহার সম্মুখে আসিতেছিল। ভাগবত (১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩ শ্লোক) বলেন, মণ্ডলাকারে নৃত্য-কালে দুই দুই জন গোপী মধ্যে কৃষ্ণ আপনি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এক কৃষ্ণ বহুগোপীমধ্যে এরূপে প্রবিষ্ট থাকা অসম্ভব বলিয়া, এখানে যোগপ্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে।

রাস যদি নির্দ্দোষ আমোদ হইবে, তবে তৎসম্বন্ধে নিন্দা ঘোষিত হইল কেন? নিন্দা হইবার অনেক কারণ আছে। এখানকার সভ্যসমাজের 'বল' যে প্রকার ধর্ম্মভীরু খ্রীষ্টানগণের চক্ষে হেয় ও নিন্দনীয়, সে কালে এ ব্যাপার তদপেক্ষা আরো নিন্দনীয় ছিল। যে দেশে পরস্ত্রীসম্ভাষণ, তৎসহ আমোদ 'পরদারাভিমর্ষণ' বলিয়া নিন্দিত, সে দেশে কৃষ্ণের রাসলীলা যে তদ্রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাতে

স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ।
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধযামাস বীর্য্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ॥
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ২১অ, ১৫—১৭ শ্লোক।

"সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রীকৃতব্রতম্॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ১৩অ, ১৬ শ্লোক।

আর সন্দেহ কি ? শুকদেব * আত্মজীবনে, সংসারিগণকে কি প্রকার প্রলোভনে পড়িতে হয়, জানিতেন ; তিনি সাধারণ লোককে এ স্থলে কৃষ্ণের অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত করিবেন (১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩০ শ্লোক), ইহা আর বিচিত্র কি ? ফলতঃ কৃষ্ণের অসাধারণত্ব, বাল্য বয়স এবং তাৎকালিক আচার ব্যবহার তাঁহাকে নির্দ্দোষ রাখিয়াছিল বলিয়া, সকলেই নির্দ্দোষ থাকিবে, ইহা কখন হইতে পারে না।

রাসে আলিঙ্গনগাত্রসংস্পর্শাদি অতি স্বাধীনভাবে হইয়া থাকে, ইহাতে এতৎ-সম্বন্ধে যে কুৎসিত কথা রটিবে, তাহা কিছুই অসম্ভব নয় ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এটি সে কালে অযুক্ত ভিন্ন কুৎসিত ভাবে গৃহীত হয় নাই। শিশুপাল কৃষ্ণকে আর আর অনেক কথা বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু গোপকন্যাঘটিত কোন কথা লইয়া তাঁহার নিন্দা করে নাই। ইংরাজীগ্রন্থে 'বস্ত্র' সম্বন্ধে নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাসসম্বন্ধে তেমন নিন্দা কোথাও নিবদ্ধ নাই। বরং ইহার মধ্যে যে কুৎসিত ইন্দ্রিয়বিকার কিছু ছিল না, তাহারই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাসে যে কিছুমাত্র কুৎসিত ভাব ছিল না, শাস্ত্রীয় লেখা দ্বারা ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

---

* শুকদেব চিরকৌমারব্রতাবলম্বী, এ বিশ্বাস ভ্রমসম্ভূত। তাঁহার চারি পুত্র, এক কন্যা ছিল। কন্যা রাজমাহিষী।

"পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকো নাম মহাতপাঃ।
ভবিষ্যতি যুগে তস্মিন্ মহাযোগী দ্বিজর্ষভঃ॥
ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমাগ্নিরিবোজ্জ্বলঃ।
স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্য্যাং জনয়িষ্যতি॥
কন্যাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্।
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং কীর্ত্তিং কন্যাং তথৈব চ॥
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীং ত্বনুহস্য চ॥"

হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ১৮ অ, ৫০—৫৩ শ্লোক।

স্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায়, হরিবংশের এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে "কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্। কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনাং যোগমাতরম্॥" এইরূপ থাকাতে পুত্রসংখ্যা বাড়িতেছে। পুরুবংশীয় রাজা অনুহের সহিত শুকের কন্যার বিবাহ হয়। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত।

শাস্ত্রপ্রমাণ

কৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় কোন অপবিত্র ভাব ছিল না, ইহা কেবল আধুনিক কথা নয়, হরিবংশ ভাগবতাদি সকলেতেই ইহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ উভয়ে একবাক্য হইয়া বলেন, কৃষ্ণ কিশোরাবস্থার সম্মান করিয়া, গোপকন্যাগণ সহকারে নৃত্যগীতাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। কিশোরাবস্থার সম্মাননার অর্থ কি? টীকাকার স্বামী কিশোরবয়স্থোচিত চাপল্যের অনুকরণ 'কিশোরাবস্থাসম্মাননার' অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে যদি এ চাপল্যের মধ্যে তদ্বয়স্থোচিত ব্যবহারের বিপরীত কিছু থাকে, তাহা হইলে এ অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। 'কিশোরাবস্থাসম্মাননার' অর্থ—তৎকালোচিত ধর্ম্মরক্ষা করিয়া বালচাপল্যপ্রকাশ। তবে সংশয়ের বিষয় এই, যদি এপ্রকারই হয়, তবে বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত (১০ স্ক, ৩২ অ, ১৩ শ্লোক) উভয়কেই কৃষ্ণের নির্দ্দোষত্ব রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরত্বারোপ করিতে কেন বাধ্য হইতে হইয়াছে? তিনি গোপীগণ এবং তাহাদিগের ভর্তৃসমূহের আত্মা হইয়া বিরাজ করিতেছেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫অং, ১৩অ, ৬০ শ্লোক), অতএব গোপীগণ-সহকারে স্বেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তিতে তাঁহাকে কোন দোষ পড়িতেছে না, এরূপ যুক্তি আনাতেই, ভিতরে কিছু গোল ছিল, বুঝা যায়। ভাগবতশ্রোতা রাজা পরিক্ষিত স্পষ্টই 'পরদারাভিমর্ষণের' দোষারোপ করিয়াছেন (১০ স্ক, ৩৩ অ, ২৭ শ্লোক) এবং এই দোষক্ষালনের জন্য শুকদেবকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক কথা বলিতে হইয়াছিল। এস্থলে অপবিত্র ভাব ছিল না, এ কথা কোনরূপে সপ্রমাণ হয় না। আপাততঃ দেখিতে এ সকল কথা অতীব সংশয়কর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত এরূপ লিখিতে কেন বাধ্য হইয়াছেন। আমরা এখানে কৃষ্ণের বয়সের বিষয় বিচারে না আনিয়া, মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরাণকর্ত্তৃগণ কৃষ্ণের অসাধারণত্ব ও ঈশ্বরত্ব

---

* হরিবংশের শ্লোক পূর্ব্বেই ৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক এই—

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৫অং, ১৩ অ, ৫৯ শ্লোক।

টীকা—"কৈশোরকং কৌমারং মানয়ন্ তদ্বয়স্থোচিতং চাপল্যমনুকুর্ব্বন্ রেমে।"

স্বীকার করিয়া, নবম বা দশম বর্ষীয় বালকের উপরে যখন পূর্ণ কৈশোরবয়স্কের ব্যবহারারোপ করিয়াছেন, এবং বৈষ্ণবেরা সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া লইয়া, নানা অনুচিত ব্যবহার তাঁহাতে আরোপ করেন, তখন এক বার তাঁহাদিগের ভাবের অনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণের নির্দ্দোষিত্ব সপ্রমাণ করা প্রয়োজন। যদি কেহ মনে করেন, এ চেষ্টায় কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কেন না, কৃষ্ণের এক বয়সই তাঁহাকে বর্ত্তমান জনসমাজের নিকটে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিবে।

হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ২০ অ) রাসের যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ একা বহুগোপকন্যা লইয়া এই আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কখন কাহারও সঙ্গে একাকী সঙ্গত হয়েন নাই। যদি এই পর্য্যন্ত শেষ হইত, সহজে কৃষ্ণের নির্দ্দোষ ভাব সপ্রমাণ হইত। বিষ্ণুপুরাণে (৫ অং, ১৩ অ, ৩২ শ্লোক) ও ভাগবতে (১০ স্ক, ৩০ অ, ২৩—২৪ শ্লোক) এক জন গোপী সহকারে একাকী বনপরিভ্রমণও বর্ণিত আছে। ইহা কে না জানেন, পাশ্চাত্যগণের 'বলেও' এ প্রকার ব্যবহারের অসদ্ভাব নাই। যিনি যাঁহার সহিত নৃত্য করেন, তাঁহাকে লইয়া রজনীভ্রমণে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে কাহারও মনে কিছু ভাবান্তর উদিত হয় না। তবে এতৎসম্বন্ধে নিন্দা যে কোথাও নিবদ্ধ নাই, তাহা নহে। আধুনিক ব্যবহারের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, এখানে কৃষ্ণকে লইয়া বিষয়। কৃষ্ণকে এ স্থলে আমরা নির্দ্দোষ মনে করি, কি প্রকারে? যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত এই বৃত্তান্ত লিখিয়া বিপদে ফেলিয়াছেন, সেই বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতই বিপৎ হইতে উদ্ধার করিবেন। বনভ্রমণের মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া অর্পণ, কেশপ্রসাধন (১০স্ক, ৩০অ, ২৯ শ্লোক), হস্তাবলম্বন করিয়া গমন ইত্যাদি ব্যবহার ব্যতীত, অবিশুদ্ধ ভাবের যে লেশমাত্র ছিল না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে গোপী সহ তিনি বনবিহারে প্রবৃত্ত হন, কৃষ্ণের এই সকল সৌহার্দ্দপ্রকাশে তাহার সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হয়; তাই তিনি 'তাহাকেও' পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হন (১০ স্ক, ৩০ অ, ৩২ শ্লোক)। আমরা 'তাহাকেও' বলিতেছি, এই জন্য যে, অন্যান্য গোপীগণের নিকট হইতেও, এই কারণেই তিনি অন্তর্হিত হইয়া, একাকী বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হন (১০স্ক, ২৯অ, ৪৩ শ্লোক)। তিনি যখন চলিয়া যান, তখন এই গোপী অন্যান্য গোপীগণের মধ্যে ছিল না; থাকিলে এক জনকে লইয়া তিনি গেলেন,

ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। বোধ হয়, যাইবার বেলা পথে ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাই ইহাকে লইয়া একাকী আমোদে প্রবৃত্ত হন।

একাকী একটী নারীসহ বনভ্রমণ যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কৃষ্ণের স্বাধীন ভাব। যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি পবিত্র ভাব পোষণ করিতে পারে না, সে তাহার অনুব্রত হয়; কখন সৌভাগ্যগর্ব্ব দেখিয়া, শিক্ষা দেওয়ার জন্য, একাকী বনে ফেলিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না। এই গোপীর নাম ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণে কোথাও উল্লিখিত নাই। ইহাতে অন্যান্য গোপী হইতে ইহার যে কোন প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা প্রতীত হয় না। বোধ হয়, আধুনিক গ্রন্থসমূহে যাঁহাকে রাধা বলে, তিনিই এই গোপী হইবেন। অন্যান্য গোপীগণ এই গোপীসম্বন্ধে বলিয়াছে, এ অবশ্য ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছে *, অন্যথা ইহার এ প্রকার সৌভাগ্য কি প্রকারে হইবে? হইতে পারে, ভাগবতের এই কথা হইতে পরসময়ে এই গোপীর নাম রাধা হইয়া পড়িয়াছে। এই রাধাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিপুরাণের ব্যভিচারবর্ণনের প্রধানা নায়িকা।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা পবিত্রভাবসম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ নহে, বৃত্তান্তঘটিত প্রমাণমাত্র। ইহাতে সকলের চিত্ত পরিতুষ্ট হইবে, আশা করা যাইতে পারে না। এখন সাক্ষাৎপ্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। স্বামী রাসের পঞ্চ অধ্যায়ে (১০ স্ক, ২৯—৩৩ অ) ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, "এ অতি বিপরীত। পরস্ত্রীসহকারে আমোদে প্রবৃত্ত হইয়া [কৃষ্ণ] কন্দর্পবিজয়ী হইলেন, কি প্রকারে? না, [বিপরীত নহে,] 'যোগমায়া আশ্রয়-করিয়া' 'আত্মারাম হইয়াও [তাহাদিগকে] আমোদিত করিতে লাগিলেন'। 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ' 'আপনাতে সৌরত অবরুদ্ধ রাখিয়া' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার স্বাধীন ভাব বলা হইয়াছে। এ জন্যই রাসক্রীড়ানুকরণ কামবিজয় প্রচার করিবার জন্য, ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। অপিচ আত্মরসচ্ছলে বিশেষতঃ নিবৃত্তিসাধনের জন্য এই পঞ্চাধ্যায়ী †।" স্বামী যে কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী

---

* "অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।"
ভাগবত, ১০ স্ক, ৩০ অ, ২৪ শ্লোক।

"রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণম্।" বৈষ্ণবতোষণী।

† "ননু বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ। মৈবং 'যোগমায়া-

কৃষ্ণের অসাধারণত্বপ্রদর্শন করিতেছে, দ্বিতীয়টী নিজের কোন অভিলাষ নাই, কেবল গোপীগণকে আমোদিত করিবার জন্য তিনি রাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই দেখাইতেছে; তৃতীয়টী তাঁহার কামবিজয়িত্ব এবং চতুর্থটীতে একেবারে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়বিকারের গন্ধমাত্র ছিল না, ইহা প্রকাশ করিতেছে। স্বামীর এ প্রকার সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত নহে, কেন না রাসপঞ্চাধ্যায় এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণের ব্রজবধুগণের সঙ্গে এই বিহার শ্রবণ ও বর্ণন করিলে ভক্তি হয়, হৃদ্রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয় *। গোপীগণ সহ রাসে প্রবৃত্ত হইয়া,

---

মুপাশ্রিতঃ' 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী।"—স্বামী (১০ স্ক. ২৯ অ. প্রারম্ভে)।

* "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

ভাগবত, ১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩৯ শ্লোক।

এখানকার "বিক্রীড়িত" শব্দ, গোপীগণ সহ বিশুদ্ধ আমোদ ভিন্ন আর কিছু ছিল না, স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে রম্ ধাতুর প্রয়োগ সমধিক। এই রম্ ধাতুর অর্থ যদিও ক্রীড়া, তথাপি লোকে ইহার অতি কুৎসিত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপে গ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই। বিশুদ্ধ আমোদে রম্ধাতুর প্রয়োগ সুবহু আছে। যথা,—

"তেষান্তু ক্রীড়তাং তত্র দ্বিজভূপবিশাং সুতাঃ।
সমানবয়সঃ প্রীত্যা রন্তুমায়ান্ত্যনেকশঃ॥"

মার্কণ্ডেয়, ২০ অ, ৭ শ্লোক।

হরিবংশের রাসবিষয়ক যে বচন উদ্ধৃত (৩২পৃঃ) হইয়াছে, তন্মধ্যে "মনশ্চক্রে রতিং প্রতি" এই কথা বলিয়া, বৃষে বৃষে যুদ্ধ, বলবান্ বালকে বালকে যুদ্ধ, গোপকন্যাগণের সঙ্গে মণ্ডলাকারে নৃত্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, এবং "সহ তাভির্মুমোদ হ" (৩৩পৃঃ) এইরূপ বলাতে, কেবল আমোদমাত্র বুঝাইতেছে। হরিবংশে সর্ব্বত্র রম্ধাতু অতিবিশুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১ অ, ২৫ শ্লোক।

এখানে অণিজন্তের প্রয়োগ দেখিয়া, ণিজন্তপ্রয়োগে অনুচিত ব্যবহারার্থ হয়, মনে হইতে পারে, তাহাও নহে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যদি অবিকারী ভাব, পবিত্র ভাব না থাকিত, তবে "কাম আশু বিনষ্ট হয়" ভাগবতের এ উপসংহার প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারিত না।

"আপনাতে সৌরত আবদ্ধ রাখিয়া" * এইটি অবিকারিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ,

---

"তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১ অ, ২৫ শ্লোক।

এখানে ণিজন্ত রম্ ধাতুর অর্থ আমোদিত করা। মনে হইতে পারে, রাসে রম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন রতিশব্দ যখন ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন অনুচিতব্যবহারার্থ কেন হইবে না?

"অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়াঃ॥"

ঐ ২৬ শ্লোক।

এমন কি, 'রিরংসু'শব্দেরও বিশুদ্ধ আমোদার্থে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্তবানক্ষেবু কুশলো বয়স্যাপি রিরংসবঃ।"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬১ অ, ২১ শ্লোক।

সুতরাং সমুদায় রাসপঞ্চাধ্যায়ে (১০স্ক, ২৯—৩৩অ) যে রম্ ধাতুর অর্থ (রমু ক্রীড়ায়াম্) ক্রীড়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অর্থে কালিদাস প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়াছেন।

* "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যসঙ্কল্পোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥"

ভাগবত ১০ স্ক, ৩৩ অ, ২৬ শ্লোক।

"অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ"—স্বামী।

"আত্মন্যন্তর্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ।"—বৈষ্ণবতোষণী।

"আত্মনি চিত্তেঽবরুদ্ধং সমন্তান্নিগৃহ্য স্থাপিতং সৌরতং সুরতসম্বন্ধিভাবহাবাদিকং যেন তথাভূতঃ সন্, অতএব সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিতপ্রেমবিশেষঃ সন্ শরৎসম্বন্ধিন্যো যাবত্যো রসাশ্রয়াঃ কাব্যকথাঃ সম্ভবন্তি তাঃ সর্ব্বা এব সিষেবে।"—প্রীতিসন্দর্ভ—৩০০।

স্বামী সৌরতশব্দের অর্থ চরম ধাতুর নির্দ্ধারণ করিয়া, লোক ও আগম উভয়বিরুদ্ধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নবম বা দশম বর্ষীয় বালকের চরম ধাতু অবরোধ, ইহা অতি কৌতূহলের ব্যাপার। তবে এ সময়ে কুসঙ্গবশতঃ মানসবিকার উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং "সৌরত" শব্দে সুরতসম্পর্কীয় মানসবিকার, এ অর্থ কদাপি অযুক্ত নহে। গোস্বামিগণ

স্বামী "সৌরত" শব্দের অর্থ সুরতোৎপন্ন চরম ধাতু করিয়াছেন। চরম ধাতুর স্খলন হয় নাই বলাতে, কামজয় উক্ত হইয়াছে, এই তাঁহার মত। জীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে, এইটীকে বিশুদ্ধ প্রেমের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "সৌরত" শব্দে সুরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি, "অবরুদ্ধ" শব্দে বাহির হইতে আত্মচিত্তে সে সমুদায় আনিয়া স্থাপন, এই অর্থকরত, ব্যভিচারবিরহিত প্রেমবিশেষ প্রকাশ, ইহার অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আমরা ব্যভিচারবিরহিত প্রেমবিশেষই চাই, আর কিছুই চাই না। যদি গোস্বামিগণও এ বিষয়ে সাহায্য করেন, অবশ্য কৃতার্থতা মানিতে হইবে। ভাগবতের একটি শ্লোকে গোপীগণ সহকারে অত্যন্ত স্বাধীনতাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভে এক স্থলে ভাবপ্রকাশ * ইহার অভিপ্রায় বলিয়া, আমাদের মনকে নিঃসঙ্কোচ করিয়াছেন। শ্লোকের অর্থবিচার করিলে, ভাববিকাশ ভিন্ন কোন দূষিত ব্যবহার ইহার মধ্যে ছিল না, সহজে প্রতীত হয় +। আধুনিক কবিগণলিখিত গীতগোবিন্দাদি যতই কেন কুৎসিত ভাবের পরিচয় দিক্ না, রাসে যে কেবল বিশুদ্ধ প্রেমের ব্যবহার, কোন অপবিত্র ভাব ছিল না, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল কৃষ্ণেরই যে বিশুদ্ধ ভাব ছিল, তাহা নহে, গোপীগণেরও ভাব বিশুদ্ধ ছিল, অনেকে মনে

এই অর্থ যুক্ত জানিয়া, তাহাই নিষ্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়; অন্যথা বালকে যে প্রকার পূর্ণ যৌবনের ক্রিয়া আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে স্বামিকৃত অর্থ তাঁহারাও অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই অনুচিত অর্থের ফল আজ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিলক্ষণ ভোগ করিতেছে। বাউল সম্প্রদায় এই অর্থের ঘোরে পড়িয়া কি অসদাচরণেই না প্রবৃত্ত!

* "বাহুপ্রসারেত্যাদিকক্ষাভিব্যক্তভাবত্বোদাহরণম্"—প্রীতিসন্দর্ভ—২৯৫।

\+ ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক। এই শ্লোকের অন্ত্যপাদ "উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার"। স্বামী "উত্তম্ভয়ন্" শব্দের অর্থ "উদ্দীপয়ন্" করিয়াছেন। উৎপূর্ব্বক স্তম্ভ ধাতুর অর্থ উদ্দীপন তিনি কোথায় পাইলেন, তিনিই বলিতে পারেন। যদি "উত্তম্ভয়ন" শব্দের অর্থ "উদ্দীপয়ন্" হইবে, তবে গ্রন্থকার সোজাসুজি "উদ্দীপয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার" এইরূপ লিখিতেন, ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হইত না, অর্থবোধও সহজে হইত। বাস্তবিক কথা এই, গ্রন্থকার "উত্তম্ভয়ন্" শব্দ বিশেষ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন, অপ্রসিদ্ধার্থে শব্দপ্রয়োগ করিয়া রচনাকে দোষদুষ্ট করেন নাই। উত্তম্ভ শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনিষ্টকর বিষয়কে অবরোধপূর্ব্বক নিবৃত্তি। কামকে উত্তম্ভন, অর্থাৎ ঊর্দ্ধে স্তম্ভনপূর্ব্বক গোপীগণকে সংস্পর্শাদিযোগে আমোদিত করিলেন, ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তা "উত্তম্ভয়ন্" শব্দ প্রয়োগ

করেন। বৈষ্ণবগণের সম্মানিত গৌতমীতন্ত্র বলিয়াছেন, "গোপীগণের প্রেমই লোকতঃ কাম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে *।"

আর এক সাক্ষাৎপ্রমাণ গোপালতাপনী। গোপালতাপনীর লক্ষ্য কৃষ্ণের উপাসনাপ্রচার। বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই গ্রন্থকে শ্রুতি বলিয়া মান্য করেন। ইহার মধ্যেও কৃষ্ণ সহ গোপীগণ সপ্রেম রজনীযাপন করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে। রাসানন্তর গোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, কৃষ্ণের পর আর কাহাকে ভক্ষ্য-ভোজ্য দান করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ বলিলেন, দুর্ব্বাসা ঋষিকে। গোপীগণ বলিল, আমরা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া যাইব কি প্রকারে? তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী" এই কথা বলিলেই, যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যথেচ্ছ আমোদ করিয়া, কি প্রকারে ব্রহ্মচারী হইলেন, দুর্ব্বাভোজনকারী দুর্ব্বাসাই বা কি প্রকারে মুনি হইলেন, এই বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, প্রধানা গোপী গান্ধর্ব্বী দুর্ব্বাসা ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন। ঋষি দুর্ব্বাসা উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি অকাম হইয়া কামনার বিষয় সকল ভোগ করে, সে অকামী †।" এ কথায় কৃষ্ণের বিশুদ্ধ ভাব প্রকাশ পাইতেছে, এবং তিনি যে গোপীগণসহকারে আমোদ-প্রমোদে অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য ছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে। "রসপূর্ব্বক স্ত্রী-সংস্পর্শ" ব্রহ্মচর্য্যে নিষিদ্ধ। কৃষ্ণ অকাম হইয়া, কেবল বালচাপল্যানুকরণপূর্ব্বক, রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।

করিয়াছেন। এই অর্থে অগ্র পশ্চাৎ সমুদায়ের ঐক্য হয়, কামবিজয় সহজে প্রকাশ পায়। এই সহজ অর্থ কেন অনুসৃত হইল না, ইহার কারণ কেবল অনুচিত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সহার্থক তৃতীয়া করিলে হাবভাবাদির অবরোধও অর্থ হয়।

* "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।"

† "একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণং হি ঊচিরে কৃষ্ণমগু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভৈক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি? দুর্ব্বাসস ইতি। কথং যাস্যামস্তীর্ত্বা জলং যমুনায়া যতঃ শ্রেয়ো ভবতি?"

"কৃষ্ণেতি ব্রহ্মচারীত্যুক্ত্বা মার্গং বো দাস্যতীতি।"

* * * * *

তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ * * * কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী? কথং দুর্ব্বাসসো মুনিঃ?

[দুর্ব্বাসা আহ] "* * * যো হি বৈ হ্যকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি।"

তিনি যে ব্রহ্মচর্য্য অখণ্ডিত রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যতর প্রমাণ এই, সৈরিন্ধ্রী কুব্জা প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার প্রতি ভাবপ্রকাশ করে (ভাগবত, ১০ স্ক, ৪২ অ, ৮ শ্লোক)। যদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তাঁহার আদর না থাকিত, তিনি তদ্‌গৃহে গমনে কালবিলম্ব করিতেন না *। ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সমাবর্ত্তনানন্তর (১০ স্ক, ৪৫ অ, ৩৭ শ্লোক) গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, তিনি কুব্জার সহিত সঙ্গত হন নাই (১০স্ক, ৪৮অ, ৩—৬ শ্লোক)। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে এটি সামান্য প্রমাণ নহে। পর সময়ে বহুবিবাহ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের ক্ষতিস্বীকার করাতে, ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে কৃষ্ণের যে অশিথিলবুদ্ধি ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকগণের ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সেকালে যে স্ত্রী-পুরুষে একত্র নৃত্য হইত, তাহাতে কেহ অপরের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না †। যাঁহারা কন্যকা ছিলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও বিকার উপস্থিত হইলে, আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন ‡। এমতাবস্থায় রাসে ‘পরদারাভিমর্ষণের’ দোষসংস্পর্শ হইয়াছে, রাজা পরিক্ষিতের মনে ঈদৃশ ভাব উত্থিত হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি ?

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সমাদর নাই, সুতরাং অবিলম্বে রজনীযোগে লুক্কায়িত ভাবে তদ্‌গৃহে গমন বর্ণিত আছে (৭২ অ, ৫৬—৬৩ শ্লোক)। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে অগ্র পশ্চাৎ কোন সময়ে কুব্জাগৃহে পদার্পণের কথা নাই।

† প্রাচীন কালে স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে নৃত্যগীতাদি ছিল, অথচ কৃষ্ণের উপরে ‘পরদারাভিমর্ষণের’ দোষ দেওয়া হইল কেন ? সেকালে এখনকার ‘বলের’ মত পত্নীবিনিময় ছিল না। সকলে স্ব-স্ব-পত্নীসহকারে নৃত্যাদি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সাগরক্রীড়ায় বলরাম তাঁহার পত্নী রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নী সত্যা, অর্জ্জুন স্বপত্নী সুভদ্রাসহ নৃত্য করিয়াছিলেন, এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।

> “কাদম্বরীপানমদোৎকটস্তু বলঃ পৃথুশ্রীঃ স চুকূর্দ্দ রামঃ।
> সহস্ততালং মধুরং সমঞ্জস ভার্য্যয়া রেবতরাজপুত্র্যা॥
> তং কূর্দ্দমানং মধুসূদনশ্চ দৃষ্ট্বা মহাত্মা চ মুদান্বিতাত্মা।
> চুকূর্দ্দ সত্যাসহিতো মহাত্মা হর্ষাগমার্থং বলস্য ধীমান্॥
> সমুদ্রযাত্রার্থমথাগতশ্চ চুকূর্দ্দ পার্থো নরলোকবীরঃ।
> কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মুদিতশ্চ কূর্দ্দী সুভদ্রয়া চৈব বরাঙ্গযষ্ট্যা॥”

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৯ অ, ১৬—১৮ শ্লোক।

‡ সে কালে নারীগণও কন্যকাবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মপ্রতিপালন করিতেন।

অনেকে মনে করিবেন, কৃষ্ণের নির্দ্দোষিত্বপ্রমাণসম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র অনুকূল, এখানে তাহাই গ্রহণ করা হইল ; যে সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া কিছুতেই নির্দ্দোষিত্ব সপ্রমাণ হয় না, সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণ দুর্ব্বল করা হইল। অনুচিত-বর্ণনসম্পর্কীয় শাস্ত্রগুলি কেন উপেক্ষিত হইল, একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অতি প্রথম হইতেই, যে গোপী পরিশেষে রাধিকা নামে আখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কুৎসিত ভাবে ব্যভিচার বর্ণিত হইয়াছে। রাসের প্রথমাংশে ব্যভিচারব্যাপার একমাসব্যাপী, অথচ তাহাতেও তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না *। কি ঘৃণিত কথা! কি লজ্জার কথা!! কেবল এই

বাণকন্যা উষার স্বপ্নে শারীর বিকার উপস্থিত হয়। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হইল, তিনি আর সাধ্বীগণমধ্যে পরিগণিত রহিলেন না বলিয়া, কতই না তিনি রোদন করিয়াছিলেন।

"নিশায়াং জাগ্রতীনাহং নীতা কেন দশামিমাম্।
কথমেবং কৃতা নাম কন্যা জীবিতুমুৎসহে॥
কুলোপক্রোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয়া।
জীবিতুং ন স্পৃহেয়ারী সাধ্বীনামগ্রতঃ স্থিতা॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১১৮ অ, ১৪—১৫ শ্লোক।

মন বিশুদ্ধ থাকিলে স্বপ্নকৃত বিকারে ব্রহ্মচর্য্যের ক্ষতি হয় না, এই বলিয়া উষার সখী তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিয়াছেন। মন, বাক্য ও কার্য্যে দূষিতা হইলে, সে পাপাচারিণী হয় বলিয়া তিনি কহিয়াছেন :—

"ন চ তে দৃশ্যতে ভীরু মনঃ প্রচলিতং সদা।
কথং ত্বং দোষসংদুষ্টা নিংতা ব্রহ্মচারিণী॥
যদি সুপ্তা সতী সাধ্বী শুদ্ধভাবা মনস্বিনী।
ইমামবস্থাং নীতা ত্বং নৈব ধর্ম্মো বিলুপ্যতে॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১৮ অ, ২২—২৩ শ্লোক।

* "এবং রেমে কৌতুকেন কামাৎ ত্রিংশদ্দিবানিশম্।
তথাপি মানসং পূর্ণং ন চ কিঞ্চিদ্বভূব হ॥
ন কামিনীনাং কামশ্চ * * * নিবর্ত্ততে।
অধিকং বর্দ্ধতে শশ্বৎ যথাগ্নিঘৃতধারয়া॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ২৮ অ, ১৭১—১৭২ শ্লোক।

পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ হয় নাই। সেই গোপী সহ অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, ক্রমান্বয়ে অনুচিত ক্রীড়ায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। শুধু এই পর্য্যন্ত নয়, "প্রিয়তমা সহ মাধব কখন মাধ্বীকপান করিলেন, কখন তাম্বুলভোজন করিলেন, কখন সুখে নিদ্রা গেলেন *।" এখানে 'মাধ্বীক' নিঃসন্দেহ মধুক-পুষ্পজাত মদ্য। কি কুৎসিত দোষারোপ! ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এ সব কুৎসিত বর্ণন যে একান্ত অবিশ্বাস্য, তাহা সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক জন দুগ্ধপায়ী শিশুতে যদি কুৎসিত আচরণ কেহ আরোপ করে, তবে কি তাহা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হয়? ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ইহাই করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্তন্যপান করেন, তখন এক দিন নন্দ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া গোচারণে লইয়া গিয়াছিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে, সমুপস্থিত রাধিকার হস্তে নন্দ শিশুকে অর্পণ করেন। পথে কৃষ্ণ পূর্ণ-কিশোররূপধারণ করেন †, ব্রহ্মা আসিয়া উভয়কে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করেন। উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইবামাত্র, উভয়ের যথেচ্ছাচরণ বর্ণিত হইয়াছে। এখানেই এই স্থির হইয়া যায় যে, নিত্য উভয়ের এইরূপ বিহার হইবে; রাধা স্বামিগৃহে ছায়ামাত্রে অবস্থিতি করিবেন ‡, রাসমণ্ডলে তাঁহার যথার্থ অধিষ্ঠান থাকিবে। ইহাতে রাধা আশ্বস্তা হইলেন এবং শিশুরূপী কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া, স্তন্যপানজন্য যশোদার হস্তে অর্পণ করিলেন §। জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তের লেখা অনুসরণ করিয়া, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি বর্ণন-

---

* "ক্ষণং পপৌ চ মাধ্বীকং প্রিয়য়া সহ মাধবঃ।
ক্ষণং চখাদ তাম্বুলং ক্ষণং নিদ্রাং যযৌ মুদা॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৩ অ, ৪৯ শ্লোক।

† "ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনম্।
সর্ব্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥"

ঐ ১৫ অ, ৫২ শ্লোক।

‡ করিষ্যসি রতিং নিত্যং হরিণা সার্দ্ধমীপ্সিতম্।
ছায়াং বিধায় স্বগৃহে স্বয়মাগত্য মা রুদ॥"

ঐ ১৫ অ, ১৭২ শ্লোক।

§ "গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।"

ঐ ১৫ অ, ১৭৯ শ্লোক।

কৃষ্ণের বয়সগণনা ধরিলে, এক বৎসরের পর তিন বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেরও কুৎসিত বর্ণনের অন্ত নাই, জয়দেবেরও কুৎসিত বর্ণনের শেষ নাই। দুগ্ধপায়ী শিশুর প্রতি যাহারা অনুচিত ব্যবহার আরোপ করিতে পারে, তাহাদের কুরুচি কখন জনসমাজে প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থনিচয়কে প্রমাণস্থলে স্পর্শ করিতে আমরা কোনরূপে প্রস্তুত নহি। ধর্ম্মগ্রন্থের নামে, এই সকল গ্রন্থ রাজদণ্ডমুক্ত হইয়া, কি কুৎসিত ভাবই না প্রচার করিতেছে!

রাসসম্বন্ধে মতভেদ কেন?

এতক্ষণ যাহা বিচারিত হইল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রাসসম্পর্কে লোকের মনে যে প্রকার সংস্কার আধুনিক পুরাণাদি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, বাস্তবিক সেরূপ সংস্কারের কোন মূল নাই। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের বয়সবিচার করিয়া দেখা যায়, সে সময়ে তাঁহার যে বয়স ছিল, তাহাতে কোন প্রকার ব্যভিচার ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার শত্রুগণও কখন তাঁহাকে বৃন্দাবনের অনুচিতাচরণ লইয়া আক্রমণ করে নাই; ইহাতে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সে কালে এরূপ কোন লোকাপবাদও ছিল না। তৃতীয়তঃ সে সময়ের আচারব্যবহারের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাল্যকাল হইতে যৌবনপ্রাপ্তির সময়পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অতি সাধারণ ছিল। এ নিয়ম স্ত্রীপুরুষ উভয়ে বিশেষরূপে মান্য করিতেন। তবে যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপগণসঙ্গে বাস করিতেন, তখন তাহাদিগের বন্য আচারব্যবহারমধ্যে ব্যভিচারের অসদ্ভাব না থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ স্থলেও বিবেচনা করিতে হইবে, নন্দ যদুবংশসম্ভূত, যদুবংশের পুরোহিত গর্গ তাঁহাদিগের পৌরোহিত্যের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ক্ষত্রিয়োচিত ছিল। তিনি গোপগণের অধিপতি ছিলেন, বৈশ্যকন্যা-সম্ভূত বলিয়া বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহাকে গোপ বলা কেবল ব্যবসায়ানু-সরণে। মাতৃপক্ষ ধরিলেও নন্দ বৈশ্যমধ্যে পরিগণিত। বৈশ্যগণও দ্বিজজাতি মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মরক্ষা করিতে হইত। *যে কোন দিক্

দেড় বৎসর বা দুই বৎসরের শিশুতে যে গ্রন্থ ব্যভিচারবর্ণন করিতে পারে, সে গ্রন্থ অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য।

দিয়া বিচার করা যাউক না কেন, গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের অনুচিতব্যবহারের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না।

এখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, যদি অনুচিতব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল না, ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ কথা উঠিল কেন? অন্ততঃ কতকগুলি পুরাণে সেরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ কেনই বা নিবদ্ধ হইল? প্রথমতঃ ভাগবতের সম্বন্ধে বিচার করিলে, সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভক্তগণের ভক্তিরস পরিপুষ্ট করিবার জন্য ভাগবত এমন অনেকগুলি কথা নিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগবতের রাসের পাঁচটি অধ্যায় (১০স্ক, ২৯—৩৩অ) বৈষ্ণবগণের অতীব আদরের সামগ্রী। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলে কি প্রকার অনুভাব হয়, ইহা যেমন এই কয়েকটি অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, এমন আর কোথাও নাই। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ উপস্থিত হইলে, লোকলজ্জা, বন্ধুস্বজনের প্রতি মমতাবন্ধন, লৌকিকধর্ম্মাদি কিছুরই প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবস্থা, ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ হইলে কি হয়, তাহা প্রদর্শন করে। হরিবংশ গোপীগণের অনুরাগের অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই, তাহা নহে, তবে পরিমাণে অল্প; বিষ্ণুপুরাণে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে, শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

গোপীগণের ভাবাবেশ শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় বর্ণিত না হইলে, সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণ করিয়া গোপীগণ নিতান্ত আকুল হইল। "কোন গোপাঙ্গনা সে সময়ে গোদোহনে প্রবৃত্ত ছিল, অমনি দোহনত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। কোন কোন গোপী অন্নপাক করিয়া, চুল্লীর উপরে রাখিয়া স্থালীতে জলনিঃসারণ করিতেছিল, মণ্ডনিঃসারণের কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, তদবস্থ রাখিয়া চলিয়া গেল। কোন কোন গোপী গোধূমকণায় প্রস্তুত করিতেছিল, পক্ক অন্ন অবতারণ না করিয়াই প্রস্থান করিল। কোন কোন গোপী অন্নপরিবেশন করিতেছিল, পরিবেশনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই গমন করিল। কেহ কেহ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছিল, কেহ কেহ পতির শুশ্রূষা করিতেছিল, কেহ কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ কেহ লেপন করিতেছিল, কেহ কেহ দেহ পরিষ্কার করিতেছিল, কেহ কেহ চক্ষুতে অঞ্জন দিতে

প্রবৃত্ত ছিল, সে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ ব্যস্ততাবশতঃ বস্ত্র ও আভরণ বিপর্য্যয়ভাবে পরিধান করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইল। পিতা, পতি, ভ্রাতা, বন্ধুগণ তাহাদিগকে বারণ করিল, কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, মুগ্ধতাবশতঃ তাহারা তাহাতে নিবৃত্ত হইল না (১০ স্ক, ২৯ অ, ৫—৭ শ্লোক)।" কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, যাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া দেহপরিত্যাগ করিল (১০ স্ক, ২৯ অ, ৮—১০ শ্লোক)।

গোপীগণের এই সকল অনুভাবমধ্যে ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—গোদোহনাদি স্ত্রীগণের প্রধান গৃহকৃত্য, এ সকল পরিত্যাগেতে কর্ম্মত্যাগ, পরিবেশনাদি পরিত্যাগে লোকধর্ম্মপরিত্যাগ, শিশুদিগের দুগ্ধপানকরান পরিত্যাগে স্নেহাস্পদত্যাগ, পতিশুশ্রূষাপরিত্যাগে ধর্ম্মপরিত্যাগ, ভোজনত্যাগে দেহাপেক্ষাত্যাগ, হস্ত-প্রক্ষালনাদি না করিয়া গমনে শুদ্ধাশুদ্ধিবিচারত্যাগ, অতিমাত্র উৎকণ্ঠাবশতঃ অঙ্গমার্জ্জনাদিত্যাগে প্রিয় ব্যক্তির চিত্তহরণে চেষ্টাত্যাগ। এ সকল অনুরাগের প্রমত্ত ভাব স্পষ্ট প্রদর্শন করিতেছে। সর্ব্বোপরি যাইতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ, ইহা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা। এতো গেল রাসের আরম্ভের কথা। ক্রমে ভাবোচ্ছ্বাসের যত প্রকার আধিক্য হইতে পারে, সকলই প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুরাগে কি প্রকার একত্ব হয়, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, আমিই সেই, এই প্রকার পরিগ্রহ উপস্থিত হয়, রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহকালে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে *। এই সকল কারণেই বৈষ্ণবগণ ব্রজ-গোপাঙ্গনাগণের ভাবের একান্ত পক্ষপাতী।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাপ্রণালী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা, গ্রন্থকর্ত্তার এরূপ বর্ণনে যে ভক্তির চরম অনুভাব সকল দেখাইবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার বিশেষ ভিন্নতা এই যে, এ গ্রন্থে রসের পরিপুষ্টিসাধনজন্য যে সকল কথা সংযোগ করা প্রয়োজন, তাহা নৈপুণ্যসহকারে করা হইয়াছে। হরিবংশে কৃষ্ণের বাল্যভাব পরিত্যক্ত হয় নাই। তন্মধ্যে যে সকল ভাবপ্রকাশ আছে, তাহা গোপীগণের পক্ষ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে নহে। বিষ্ণুপুরাণ রসপরিপুষ্টিবিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াছেন ; কিন্তু ভাগবত

* ভাগবত ১০ স্ক, ৩০ অ, ৩ শ্লোক। বিষ্ণুপুরাণ ৫অং, ১৩অ, ২৫—২৬ শ্লোক।

যত দূর গিয়াছেন, তত দূর যান নাই। ভাগবত এরূপ করিতে গিয়া, কৃষ্ণের বাল্যভাব এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। মানসবিকার না থাকুক, যে প্রকার ভাববিকাশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ বাহ্যতঃ নবযৌবনাক্রান্ত ব্যক্তির আচরণ অনুকৃত হইয়াছে। কি জানি বা বাল্যভাবরক্ষা করিতে গিয়া রসাভাস হইয়া পড়ে, এ জন্য ভাগবতরচয়িতার অতিমাত্র যত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। গোস্বামিগণও এ বিষয়ে এত দূর সতর্ক ছিলেন যে, তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে যে, গোপীগণের ভাববিকাশের অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণের অতি বাল্যকালেও পূর্ণ কৈশোরাবির্ভাব হইয়াছিল।

ভাগবত রসের পরিপুষ্টিসাধন করিয়াও, একটি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কলঙ্কস্পর্শবর্জ্জিত রাখিয়াছেন, সেটি ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা। সত্য বটে, সে কালে, বিশুদ্ধ ভাব বা অবিশুদ্ধ ভাব, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পণ্ডিতেরা পরবনিতাস্পর্শমাত্রকেই পরদারাভিমর্ষণ বলিয়া অভিহিত করিতেন; কিন্তু মুখ্যতঃ বিকারজনিত অনুচিত চাঞ্চল্য ব্রহ্মচর্য্যের ক্ষতিকর ছিল। এই ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার জন্য সে কালে অবলাগণের দর্শনস্পর্শাদি পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইত। এমন কি, গুরুপত্নীগণ যদি যুবতী হইতেন, এবং শিষ্য বিংশতিবর্ষবয়স্ক হইত, তাহা হইলে পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিত না। গুরুপত্নীগণ বয়স্থা হইলেও, তাঁহাদিগের কেশপ্রসাধনাদি কার্য্য শিষ্য করিতে পারিত না। নির্জ্জনে স্ত্রীসম্ভাষণ তো সর্ব্বথা পরিহার্য্য ছিল। গন্ধমাল্যাদি ভোগ্যসামগ্রী ব্রহ্মচারিগণ কখন উপভোগ করিত না। নৃত্য গীত বাদ্যাদি সকলই নিষিদ্ধ ছিল। বালক শ্রীকৃষ্ণকে রসপুষ্টির অনুরোধে ভাগবত যখন নবযৌবনসম্পন্নের ন্যায় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন স্পষ্ট কথায় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মরক্ষার কথাও (৭ স্ক, ১২ অ) বলিতে হইয়াছে। অন্যথা বালকের যখন চিত্তবিকার নাই, তখন ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভাগবত পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদির অনুসরণ করিলে, আর এক রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে সর্ব্বথা ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মোল্লঙ্ঘন করিয়া, স্তন্যপানের কাল হইতে কুৎসিত বর্ণন আরব্ধ হইয়াছে। এ কোন্ সময়ের লেখা? অবশ্য তান্ত্রিক ব্যভিচারের প্রাবল্যকালে * এ দেশে যখন

* ঈশ্বরাপেক্ষা শক্তির প্রাধান্য তান্ত্রিক মতের প্রধান লক্ষণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এই লক্ষণে

তান্ত্রিক ব্যভিচারের সমাগম হইয়াছে, সেই সময়ের উপযুক্ত বর্ণনা এই সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক ব্যভিচারের সময় কিছু অল্প দিনের নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য যখন ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে এ দেশে এ মত একেবারে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এমন কি, ছান্দোগ্য উপনিষৎপর্য্যন্তে এ মতের অনুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বামদেব্যসামোপাসনায় * এই ব্যভিচার অনুমোদিত হইয়াছে। দারুবনে কতকগুলি ঋষি মদ্যপান ও ব্যভিচারাদিতে নিরত হইয়া, একান্ত কলুষিত-চিত্ত হইলে, শিব সেই সকল ঋষির উদ্ধারের জন্য, তান্ত্রিক মতের উদ্ভাবন করেন, তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চয় যে, অতি পূর্ব্ব হইতে এক দল তান্ত্রিক ব্যভিচারের পক্ষপাতী লোক ছিল। সেই সকল লোক হরিবংশ প্রভৃতির বর্ণিত রাসকে কখন পবিত্রভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা নিজ নিজ কুৎসিত রুচির অনুবর্ত্তন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থিতির কালকে কুৎসিত ভাবের আধার করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যবয়সে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তাহারা আপনাদের রুচির অনুসারে স্থাপন করিয়াছে। আমরা এই সকল গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিতে অসমর্থ; কেন না, উহারা ধর্ম্ম, নীতি ও ভদ্রতার একান্ত বিরুদ্ধ।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়মধ্যে যাঁহারা অতিবিশুদ্ধচেতা, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের পথানুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের পবিত্রতা এবং গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান্। এই সকল লোকের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও ভক্তিমান্ লোকের সংখ্যা সমধিক। আর এক দল বৈষ্ণব

লক্ষণাক্রান্ত। কৃষ্ণের সর্ব্বথা রাধিকাপারতন্ত্র্য, তৎসন্তোষৈকপরায়ণতা নিঃসংশয় দেখাইয়া দিতেছে, এ পুরাণখানি তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণের মতপ্রচারজন্য নিবদ্ধ। যে সকল পুরাণ শক্তির প্রাধান্য বর্ণন করিয়া, ঈশ্বরকে তৎপরতন্ত্ররূপে উপস্থিত করে, সে সকল পুরাণ তান্ত্রিক, এ সিদ্ধান্ত সকলের স্মরণে রাখা সমুচিত।

"বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন।
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫ অ, ৫৯—৬০ শ্লোক।

* "ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি ব্রতম্॥" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২।১৩।২)

তান্ত্রিক পথের অনুসারী। তাহাদিগের জীবন তান্ত্রিক ব্যভিচারে পরিপূর্ণ। যাহাদিগের মন বিশুদ্ধ হয় নাই, ইন্দ্রিয়বিকার আছে, তাহাদিগের প্রতি গোস্বামিগণ বৃন্দাবনলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিষেধ করিয়াছেন। এই তান্ত্রিক পথে অদ্বৈতবাদের একান্ত প্রাধান্য। এজন্য স্ত্রীপুরুষে রাধা কৃষ্ণ ও গোপী হইয়া, কত প্রকার অনুচিত ব্যবহারে তাহারা প্রবৃত্ত হয়। বৈষ্ণবগণের সুরাস্পর্শ নিষিদ্ধ, এই সকল তান্ত্রিক-পথাশ্রয়ী বৈষ্ণব সে মর্য্যাদাও উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যখন শ্রীকৃষ্ণের মদ্যপানের কথা অনুচিত ব্যবহারের সঙ্গে বর্ণিত আছে, তখন এ সকল বিপথগামী বৈষ্ণবগণের এরূপ দুর্দ্দশা কেনই বা হইবে না? ইহারা যে সকল কুৎসিত মত পোষণ করে, তাহা লিখিবার একান্ত অযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণের রাস বিশুদ্ধ বাল্যামোদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে কি উচ্চ ভাব নিহিত আছে, পরে বিবেচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চলক্ষ্য-সাধনোদ্দেশে রাসকে পূর্ণরসের পরিপোষক করিয়া, জনসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সৎফল না হইয়া, অসৎফলের উদয় হইয়াছে। স্বভাবতঃ লোক-সকল ইন্দ্রিয়প্রবণ। তাহারা ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিয়া, তাহার বিশুদ্ধতা পরিগ্রহ করিবে, ইহার সম্ভাবনা অতি অল্প। যখন পূর্ব্বকালে লোকে বিশুদ্ধভাব রক্ষা করিতে পারে নাই, তান্ত্রিক ব্যভিচার ও মদ্যপান রাসের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, তখন এ কালের লোকদিগকে দোষ দেওয়া বৃথা। জীবন বিশুদ্ধ পবিত্র না হইলে, রাসাদির বৃত্তান্ত-শ্রবণ-কীর্ত্তন সমুচিত নয়, গোস্বামিগণ এরূপ বিধি, বুঝিয়াই করিয়াছেন। কোথায় ইন্দ্রিয়বিকার-বিবর্জ্জিত হইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় (১০ স্ক, ২৯—৩৩ অ), আর কোথায় ব্যভিচারের স্রোত তাহা হইতে প্রবাহিত হইল। লক্ষ্য ও ফলের ঈদৃশ বৈপরীত্য যখন আলোচনা করা যায়, তখন হৃদয় ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

ভাবোন্মেষ

শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিহার সর্ব্বোপরি কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। এখন দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে বৃন্দাবনের ঘটনা-

সমূহের কি গূঢ় যোগ ছিল, যাহার জন্য তিনি নিজেও পরজীবনে অতি আদরের সহিত বৃন্দাবনের বিষয় স্মরণ করিতেন। পৃথিবীতে বিশেষ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যে সকল মহাত্মা আগমন করেন, তাঁহাদিগের জীবনের কোন একটী ঘটনা ব্যর্থ হয় না। বৃন্দাবনের বাল্যজীবন যে তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের সহায় ছিল, ইহা সহজে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। অতি সাধারণ লোকের জীবনও যখন বাল্যজীবনের সঙ্গে অনুস্যূত, তখন ঈদৃশ মহাত্মাদিগের জীবনের প্রথমাংশের ঘটনা পরজীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। বৃন্দাবনের ঘটনানিচয় শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উপরে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, পরজীবনের সঙ্গে তাহাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এখন তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে শ্রীকৃষ্ণ আপনার জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অশিক্ষিত লোকদিগের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, একজন আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যাহার ভিতরে নিগূঢ় মহত্ত্ব নাই, সে ব্যক্তি নীচ মূর্খদিগের সঙ্গে পড়িয়া, তাহাদিগের মত অনেকটা হইয়া যায়। ভালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যদি একজন জন্মিবার পর হইতে নীচসঙ্গে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে জন্মজন্য তাহার বিশেষত্ব আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। বিশেষ মহত্ত্ব না থাকিলে, সংসর্গদোষ পরিহার করা অসম্ভব। শিশুতে এমন কি সামর্থ্য উদ্ভূত হইয়াছে যে, সে অবস্থাজয় করিয়া, তদুপরি কর্ত্তৃত্বস্থাপন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে তত্রত্য একজন প্রধান লোকের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যে গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সে গৃহের আচারব্যবহার কতক পরিমাণে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। গোপবালকগণের সঙ্গে মিলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণাদিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার বিশেষত্ব না থাকিলে, তিনি রাখালদলে মিশিয়া এক জন রাখালই হইতেন, আর কিছুই হইতেন না। কিন্তু প্রথম হইতে তিনি বিশেষত্বে, রাখালগণের মধ্যে কেন, পার্শ্ববর্ত্তী সকল লোকের মধ্যেই, সর্ব্বথা বিশেষ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের বন উপবন পর্ব্বত সকলই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ভাব প্রস্ফুটিত হইবার

পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি বাল্যকালে এমন এক জাতির সহিত বাস করিতেছিলেন, যাহারা, বলিতে গেলে, প্রকৃতির সন্তান। তাহাদিগের মধ্যে প্রাকৃতিক ভাব বিনা আর কিছু ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতি কৃষ্ণের যেমন একটি বিশেষ ভাব, তেমনি সে ভাব প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে সকলই অনুকূল হইয়াছিল। তিনি যদি কৈশোর হইতে মথুরায় রাজপরিবারমধ্যে লালিত পালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতিপ্রবণ হৃদয়ের, নাগরিক প্রলোভনের অবস্থামধ্যে পড়িয়া, আর এক প্রকারের গঠন হইত, তাঁহার ভিতরে প্রকৃতির সঙ্গে যে সহানুভূতি ছিল, তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিত না। তিনি বৃন্দাবনে প্রকৃতির সঙ্গে কি প্রকার প্রগাঢ় যোগে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা গোপগণের অনুষ্ঠেয় ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম বয়সে প্রকৃতি তাঁহাকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রকৃতিকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে অনেকে বৈদিক ভাবের প্রাধান্য দেখিয়া থাকেন। তিনি যে সেই ভাবের প্রেরণায় ইন্দ্রযজ্ঞনিবারণ করিয়া, গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত প্রকৃতির পক্ষপাতী ছিল বলিয়া, তিনি মানবসমাজের প্রচলিত আচারব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যাহা কিছু সমুদয় প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিতেন, সুতরাং গোপগণের সঙ্গে গোপগণের ন্যায় ব্যবহারে সহজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হিংস্র পক্ষী, বন্যাশ্ব, দুষ্ট বৃষভাদিবধে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার ক্ষাত্রভাব যে স্ফূর্ত্তি [illegible] করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সকল আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বৃন্দাবনে গোপবালক ও গোপবালিকাগণের সঙ্গ তাঁহার জীবনের উপরে বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। রাস এই ব্যবহারের পরিণতি। আর সকল অপেক্ষা রাস যে বৈষ্ণব সাধকগণের সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দুইটি ভাবের যুগপৎ উন্মেষ হয়, একটি বৈরাগ্য, আর একটি প্রেম। এই দুই ভাব তাঁহার সমুদায় জীবনে নিরন্তর অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিয়াছে। প্রগাঢ় আমোদের মধ্যে মন কি প্রকার নির্ব্বিকার থাকিতে পারে, এ শিক্ষা রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরাগ বৈরাগ্যাবরণে এমনই আচ্ছন্ন যে, গোপবালাগণ তাঁহার গভীর ভালবাসার উপরে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি আপনার প্রেম নষ্টধন নির্ধন ব্যক্তির

ধনানুরাগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন *। যে নির্দ্ধন ব্যক্তির লব্ধধন বিনষ্ট হইয়াছে, ধনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ, সে এমনই নিরন্তর তচ্চিন্তায় নিমগ্ন যে, একেবারে স্তম্ভিত থাকে, বাহিরে কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। এ ব্যক্তির অনুরাগের সঙ্গে কাহারও অনুরাগের তুলনা নাই। বাস্তবিক বৈরাগ্যাবরণে আবৃত প্রেম এইরূপই বটে। যেথানে বৈরাগ্য অর্থাৎ আত্মসুখের প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি নাই, সেথানেই প্রেম, সেথানেই যথার্থ প্রেম থাকিতে পারে। যেথানে বৈরাগ্য নাই, আত্মসুখকামনা আছে, সেথানে প্রেম নাই, প্রেমের আড়ম্বর আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপকন্যাগণের প্রতি বৈরাগ্যাবৃত প্রীতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপ-কন্যাগণের আত্মসুখবাঞ্ছাবিরহিত অনুরাগ, এ দুইই অতি বিশুদ্ধ ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে যে ভাবোন্মেষ হইয়াছিল, তাহা তৎপ্রচারিত নব ধর্ম্মের মূলে ছিল, ইহা যাঁহারা তাঁহার জীবনপর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়।

ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যবহার ভক্তিশাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতাবলম্বনপূর্ব্বক শাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসার জন্য একশত সূত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, গোপাঙ্গনাগণের জ্ঞান ছিল না †, অথচ এক অনুরাগেই তাঁহারা বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ করিয়াছিলেন. দেহ-গেহ-লোকলজ্জা-প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন নাই, নারদ স্বকৃত ভক্তিসূত্রে এইটি ভক্তির দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নারদ বলেন, ব্রজাঙ্গনাদের প্রীতি আত্মসুখেচ্ছাবিরহিত ছিল, সুতরাং তন্মধ্যে ব্যভিচারের লেশমাত্র ছিল না। গোপকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কখন বিস্মৃত হন নাই ‡, তাই তাঁহাদিগের প্রীতি অতি নির্দ্দোষ, নারদের এ অভিমত। ফলতঃ গোপাঙ্গনা-গণের নিঃস্বার্থ প্রীতি ভক্তিশাস্ত্রে সর্ব্বত্র একটি প্রধান দৃষ্টান্ত বলিয়া গৃহীত

* "নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥"

ভাগবত, ১০ স্ক, ৩২ অ, ১৯ শ্লোক।

† "তদভাবাদ্বল্লবীনাম্।" শাণ্ডিল্যসূত্র ১৪।

‡ "যথা ব্রজগোপিকানাম্।" ভক্তিসূত্র, ৩ অ, ৭ সূ।
"ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ।" ভক্তিসূত্র, ৩ অ, ৮ সূ।

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চরম সময়ে গোপীগণের ব্যবহার দৃষ্টান্তরূপে শিষ্যবর্গের নিকটে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ ভাব ছিল, অথচ গোপাঙ্গনাগণের তাহা ছিল না, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নই। গোপাঙ্গনাগণ স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, এবং কোন বারণ না মানিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন, ইহাতে তাঁহাদিগের স্বামিগণের হৃদয়ে কোন প্রকার অসদ্ভাবের উদ্দীপন হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছু নহে, কেবল তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা। তাঁহাদিগের চরিত্রে আশঙ্কা করিবার কোন হেতু ছিল না। শুকদেব এই ব্যাপারটিকে যোগমায়ার (১০ স্ক, ২৯ অ, ১ শ্লোক) প্রভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যখন যোগমায়াপ্রভাবে রাসের বর্ণিত বিষয়গুলিকে রসপরিপুষ্টির উপযোগী করিয়া লইয়াছেন, তখন এখানে যে যোগমায়ার প্রভাব স্বীকার করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ফলকথা এই, ব্রজাঙ্গনাগণ এরূপভাবে স্ব স্ব স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতেন যে, গোপগণের মনে কোন প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইত না (১০ স্ক, ৩৩ অ, ৩৭ শ্লোক)। গোস্বামিগণ এখানে রাবণাপহৃত মায়াময়ী সীতার * দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মায়াময়ী গোপীরা গোপগণের সঙ্গে থাকিতেন; বস্তুতঃ যাঁহারা গোপাঙ্গনা, তাঁহারা কৃষ্ণসহ নিয়ত ক্রীড়ায় মগ্ন থাকিতেন। এই কল্পিত মতের অনুসরণ করিয়াই, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। এ কালে আর এ সকল কথা লোকের চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না, ইহাই সুখের বিষয়।

বৈরাগ্য ও প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে যুগপৎ উদিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাতে এ দুই এমনই মূল উপাদানরূপে নিহিত ছিল যে, ইহাদিগের বাহ্য বিকাশ অতি

* "অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।
আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব দহন্নিব॥
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্সয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত॥
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্॥"

কূর্ম্মপুরাণ, উত্তর বিভাগ, ৩৩ অ, ১২৮—৩০ শ্লোক।

অল্পই লোকে দেখিতে পাইত। ব্রজে গোপগোপীগণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে অতি প্রগাঢ় ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অনুরাগ বৈরাগ্য-ভূমির উপরে প্রোথিত ছিল বলিয়া, অনেক সময়ে অনুরাগের বৈপরীত্যে ঔদাসীন্য তাঁহাতে আরোপিত হইত। তিনি যখন ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিলেন, মথুরার নূতনাবস্থায় নূতন কার্য্যে আহূত হইলেন, সে সময়ে ব্রজের প্রতি তিনি উদাসীন ও অনুরাগশূন্য হইলেন, এইরূপ মনে হয়; কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে যে ব্রজের প্রতি অনুরাগ কোন কালে যায় নাই, তাঁহার পরজীবনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশুদ্ধ প্রীতির স্বভাব অতি গভীর; তাহা একান্ত তরঙ্গবর্জ্জিত। কি ব্রজ, কি মথুরা, সর্ব্বত্র তাঁহার এই গভীর বিশুদ্ধ প্রীতির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনে তরঙ্গবর্জ্জিত বিশুদ্ধ গভীর প্রেম তাঁহার অসাধারণতা প্রদর্শন করে। মহাত্মা চৈতন্য তাঁহার অনুসরণ করিয়া, জীবনে প্রেম ও বৈরাগ্য বাহে পর্য্যন্ত প্রস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অনুবর্ত্তী হইয়াও, তাঁহার জীবনের যিনি নিয়ামক (কৃষ্ণ), তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সহজে সকলের প্রতীতি হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জীবনের পার্থক্য যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, এক জন, ঈশ্বরেতে যে তরঙ্গ-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহা অভেদযোগে প্রদর্শন করিয়াছেন, আর এক জন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের কি প্রকার অনুরাগের বিচিত্র বিকাশ হয়, তাহা দেখাইয়াছেন; সুতরাং এ দুই জনের জীবনে পার্থক্য হইবেই। ফল কথা এই, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে প্রেম ও বৈরাগ্য যোগাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকাতে, উহা জনচক্ষুর অগোচর ছিল; শ্রীচৈতন্য সেই প্রেম ও বৈরাগ্য প্রস্ফুটরূপে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন। এ সম্বন্ধের কথা পরে বলিতে হইবে, এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট যে, একজন ঈশ্বরত্বপ্রদর্শনার্থ, আর একজন ভক্তত্বপ্রদর্শনার্থ নিযুক্ত।

মথুরাগমন

বৃষভ ও কেশীবধ

এক দিন অর্দ্ধ রাত্রিতে কৃষ্ণ আমোদে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে একটি দুষ্ট বৃষভ গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, গোসকলের উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল *। অনেক গর্ভিণী গোর গর্ভপাত হইল, অনেক বৃষ ও বৎস বিনষ্ট হইল। যে সকল গো কৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী ছিল, সেই দুষ্ট বৃষ তাহাদিগের দিকে ধাবিত হইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল। তখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া, তাঁহারই কুক্ষি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেমন আসিয়া তাঁহাকে শৃঙ্গাঘাত করিবে, অমনি উহাকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গমধ্যভাগ পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া রাখিয়া, শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া লইলেন, এবং সেই শৃঙ্গদ্বারা তাহার মুখে আঘাত করত তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।

কৃষ্ণ যে সকল অদ্ভুত বিক্রম প্রদর্শন করিলেন, তাহার সংবাদে কংস নিতান্ত চিন্তাকুল হইল। এই সময়ে নারদ † গিয়া তাঁহাকে সমুদয় গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভের বিনিময়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া,

---

* দশমস্কন্ধে (৩৪ অধ্যায়ে) ইহার পূর্ব্বে অজগর সর্পকে স্পর্শ করিয়া মুক্তিদান ও শঙ্খচূড়বধ এই দুইটী ঘটনা আছে ; হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে এ দুইয়ের কোন উল্লেখ নাই।

† যেখানেই কোন একটী বিরোধকর ঘটনা বর্ণিত আছে, সেখানেই পুরাণকর্ত্তৃগণ নারদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে এই প্রতীত হয় যে, যে কোন ব্যক্তি বিরোধকর বিষয়ে আমোদিত হইত, সেই নারদভাবাপন্ন বলিয়া নারদনামে আখ্যাত হইত। ভক্তিপথপ্রদর্শক নারদ বিবাদে আমোদিত হইতেন, এ অতি বিপরীত কথা। তিনি আপনি বাণযুদ্ধদর্শনাভিলাষী হইয়া বলিয়াছিলেন,—

> "মমৈষ পরমঃ কামো যুদ্ধং দ্রষ্টুং মনোরমে।
> যদ্দৃষ্ট্বা চ মহাপ্রীতিঃ প্রবৃত্তিশ্চ দৃঢ়া ভবেৎ॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১১৯অ, ১৮ শ্লোক।

যুদ্ধ দেখিবার অভিলাষ কেন? তাহাতে আহ্লাদ কেন? প্রবৃত্তি দৃঢ় হইবে, এই জন্য। প্রবৃত্তি দৃঢ় হওয়ার অর্থ, ধর্ম্মের জয়ে, সত্যের জয়ে, ভগবানের জয়ে বিশ্বাসবৃদ্ধি। ক্ষাত্রোচিত কালের ভক্তসম্বন্ধে এটি ভক্তিবিরোধী ভাব নহে।

তাহার ভয় আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। সে মনে করিল, এখনও রামকৃষ্ণ বালক আছে *, এই সময়েই ইহাদিগের বধের উপায় করা শ্রেয়ঃ। এই দুরভিসন্ধিতে, ধনুর্যজ্ঞোপলক্ষে মল্লযুদ্ধার্থ সে তাঁহাদিগকে মথুরায় আনয়ন করিবার জন্য, অক্রূরকে ব্রজে প্রেরণ করিল। ইতিমধ্যে কেশিনামা একটি দুষ্টাশ্ব ব্রজভূমিতে মহান্ উৎপাত সমুপস্থিত করিল। কথিত আছে, এই দুরন্ত অশ্ব নরমাংস ভোজন করিত, গোসকলকে বিনষ্ট করিত। কেশী এই শব্দে অত্যন্ত লোমশ বুঝায়, সুতরাং এ এক প্রকার বন্যজাতীয় হিংস্র ঘোটক হইবে। এই ঘোটককে বধ করিতে কৃষ্ণ উদ্যত হইলেন। কেশী তাঁহার বাহুর অগ্রভাগ দংশন করিলে, তিনি সেই আভুগ্ন বাহু তাহার মুখের ভিতরে ক্রমে এমনই বিস্তৃত করিলেন যে, তাহাতে তাহার মুখ বিদীর্ণ হইয়া গেল, সে রক্ত উদ্বমন করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। এই সময়ে নারদ আসিয়া কংসের সমুদায় দুশ্চেষ্টা তাঁহাকে অবগত করিলেন।

কংসবধ

অক্রূর কৃষ্ণভক্ত। তিনি গোকুলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং ভক্তিভরে অবনত হইয়া কৃষ্ণকে তাঁহার আগমনকারণ অবগত করিলেন। ব্রজবাসী সকলেই মথুরাগমনের উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপনারীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত আকুল হইল। অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া, পথে স্নানান্তে † মথুরার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নন্দাদি গোপগণ দুগ্ধপূর্ণ কলস উপহারস্বরূপ লইয়া, রথের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছিলেন ; কিন্তু অক্রূরের স্নানাদিব্যাপারে পথে কালাতিপাত হওয়ায়, তাঁহারা অগ্রেই মথুরায় পঁহুছিয়া, পুরসমীপবর্ত্তী উদ্যানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

অক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে রথ হইতে সেইখানে অবতারণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্রোহাচারী দুরাচার

---

* "যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রামকৃষ্ণৌ সুবালকৌ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যাবূঢ়যৌবনৌ ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ১৫অ, ৬ শ্লোক।

† এস্থলের অদ্ভুত ঘটনা আমরা পূর্ব্বে (১৬ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি (ভাগবত ১০ স্ক, ৩৯ অ, ৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কংসকে সংহারপূর্ব্বক, সুহৃদ্‌গণের প্রিয়কার্য্যসাধন না করিয়া, কৃষ্ণ তাঁহার গৃহে যাইতে পারেন না, এইরূপ বলাতে, অগত্যা ক্ষুণ্ণচিত্তে একাকী তিনি রথ লইয়া মথুরায় প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি কার্য্যসাধন করিয়া আসিয়াছেন, কংসের নিকটে ইহা গিয়া অবগত করিলেন। রামকৃষ্ণ উভয়ে গোপবেশধারী ছিলেন। রাজসদনে সে বেশে প্রবিষ্ট হইতে, তাঁহাদিগের রুচি হইল না। কংসের রজক রাজবর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছিল, তাঁহারা তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট বস্ত্র চাহিলেন। রজক গর্ব্বিতভাবে তাঁহাদিগকে উপহাস করিল। ইহাতে চপেটাঘাতে রজককে গতাসু করিয়া, উভয়ে যথেচ্ছ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, একজন তন্তুবায় তাঁহাদিগকে বস্ত্র পরাইয়া দেয়। বসনপরিধানানন্তর তাঁহারা সুদামনামক মালাকারের বিপণিতে গমন করিলেন। মালাকার তাঁহাদিগের অভ্যর্থনায় হৃষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে পুষ্পে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। রাজপথে তাঁহারা কংসের অনুলেপনদানে নিযুক্তা সৈরিন্ধ্রী কুব্জাকে অনুলেপনহস্তে গমন করিতে দেখিলেন। তাঁহারা তাহার নিকটে অনুলেপন চাহিলে, সে তাঁহাদিগকে অনুলেপন দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিল। লিখিত আছে, কৃষ্ণ কুব্জার পৃষ্ঠের কুব্জভার চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে উৎপাটিত করিয়া অপসারিত করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পর ধনুঃশালায় প্রবেশপূর্ব্বক, যে ধনুর যাগ হইবে, সেই বৃহদ্ধনু অবহেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া, ভীত কংস কুবলয়াপীড়নামা মত্তহস্তী এবং চাণূর মুষ্টিকনামা মল্লদ্বয়কে কৃষ্ণবধে নিযুক্ত করিল। কৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুবলয়াপীড় তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য শুণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া অগ্রসর হইল। কৃষ্ণ সহসা ভূমি হইতে উল্লম্ফন দ্বারা উঠিয়া, সেই শুণ্ড বক্ষে ধারণপূর্ব্বক, দুই দন্তের মধ্যগত হইয়া, দুই পা হস্তীর দু'পার মধ্যে দিয়া অবরোধ করিলেন। পরিশেষে তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়া, তাহাকে তদ্দ্বারা বধ করিলেন, এবং দুই ভ্রাতা হস্তিদন্তরূপ শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রঙ্গস্থলিতে একদিকে মঞ্চোপরি নৃপতিগণ, প্রজাগণ, নন্দাদি-গোপগণ এবং বসুদেব প্রভৃতি এবং অপর দিকে দেবকী প্রভৃতি নারীগণ উপস্থিত ছিলেন। বালকদ্বয়ের সঙ্গে দুই প্রকাণ্ড মল্ল মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাতে সকলেই অন্যায় বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগের

কথায় প্রতিবাদ করিয়া চাণূর সহ এবং বলভদ্র মুষ্টিক সহ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণের মল্লযুদ্ধে কৌশলদর্শন করিয়া, সমাগত জনগণ সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে কংস ক্রোধান্বিত হইয়া মৃদঙ্গাদিতূর্য্যনিনাদ বারণ করাইয়া দিল। বারণ করিলে কি হইবে? কৃষ্ণ চাণূরকে হস্তযোগে অবনত করিয়া, মস্তকে মুষ্টি এবং বক্ষে জানু দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহাতে সে রুধির বমন করিতে লাগিল এবং চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইয়া পড়িল। বলরাম মুষ্টিককে বধ করিলে, তোসলক নামা মল্ল কৃষ্ণ সহকারে এবং অন্ধ্র, বলরাম সহ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তোসলক ও অন্ধ্র হত হইলে, অন্যান্য মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিল। কংস এই সকল দর্শন করিয়া ক্রোধে আজ্ঞা দিল, গোপসকলকে রঙ্গভূমি হইতে বাহির করিয়া দেও, ইহাদের গোধনাদি সমুদায় অপহরণ কর, আমার রাজ্যে ইহারা বাস করিতে পারিবে না। বসুদেব, পিতা উগ্রসেনও শত্রুপক্ষ *, অতএব তাহাদিগকে বধ কর। এতচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ হাসিয়া, একেবারে লম্ফদানপূর্ব্বক, কংসের মঞ্চে আরোহণ করিলেন, এবং তাহার কেশাকর্ষণ করত, তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। নিপাতিত কংসোপরি নিপতিত হইয়া, তাহার প্রাণহরণ করিলেন। ভূতলে পতিত কংসকে রঙ্গমধ্যে এমনি করিয়া টানিতে লাগিলেন যে, একেবারে ভূমি নিখাত হইয়া গেল।

মথুরায় স্থিতি

উগ্রসেনাভিষেক

কংসবধানন্তর তাহার ভ্রাতা সুনামা + ক্রোধে অগ্রসর হইলে, বলভদ্র তাহাকে হত করেন। শত্রুবধের পর তাঁহারা দুই ভ্রাতা বসুদেব ও দেবকীর পদবন্দনা করিলেন, এবং এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাদিগের বাল্যকাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে, কেন না তাঁহারা পিতা মাতার সেবা দ্বারা জীবন সার্থক

---

* উগ্রসেন প্রভৃতি সকলে কংসের বিরোধী হইয়া একটি ষড়্যন্ত্র করিয়াছিলেন। ভাগবতোক্ত কংসবাক্যেও স্পষ্ট বুঝা যায় (১০ স্ক, ৪৪ অ, ২৪ শ্লোক)।

\+ বিষ্ণুপুরাণমতে (৫অং, ২০অ, ৭৭ শ্লোক) সুমালী, ভাগবতমতে (১০ স্ক, ৪৪অ, ২৮—২৯ শ্লোক) কঙ্ক-ন্যগ্রোধ-প্রভৃতি আট ভ্রাতাই অগ্রসর হইয়া, বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হয়।

করিতে পারেন নাই (১০ স্ক, ৪৫ অ, ৩ শ্লোক)। কংসবধে কংসপত্নীগণ তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক, আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে কৃষ্ণের হৃদয় নিতান্ত অনুতপ্ত হইল। তিনি স্বয়ং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন। কংস নিজ পিতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত রাখিয়া স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ করে। এ সময়ে পুত্রমমতাকৃষ্ট সেই উগ্রসেনই কংসের সৎকারপ্রার্থনায়, পত্নী-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, কৃষ্ণের নিকটে আগমন করেন। কৃষ্ণ তৎকালে যদুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং কংসপরিবার এবং পৌরজনের সান্ত্বনা করিবার উপায় করিতেছিলেন। উগ্রসেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃষ্ণকে সমুদায় রাজ্যধনাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করত, কংসের সৎকার প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসের রাজোচিত সৎক্রিয়ার অনুমতিদান করিলেন, এবং পুত্রশোকার্ত্ত উগ্রসেনকে যথোচিত সান্ত্বনাদান করিয়া বলিলেন, "আমি যাহা বলি, তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি রাজ্য চাই না, রাজ্যও আমায় চায় না। আমি রাজ্য-লোভে লোভী হইয়া, আপনার পুত্রকে বধ করি নাই; কিন্তু লোকের হিতসাধন এবং তজ্জনিত কীর্ত্তিই আমার উদ্দেশ্য। আপনার পুত্র এই কুলের নিন্দার কারণ হইয়াছিল, তাই তাহাকে অনুবর্ত্তিগণ সহ বধ করিলাম। আমি বনচর হইয়া, গোপগণ সহ গোষ্ঠে প্রীতচিত্তে যথেচ্ছভ্রমণশীল গজের ন্যায় বিচরণ করিব। আমি শত বার সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার নৃপত্বে প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলিতেছি, আপনি তাহা করুন। আপনি রাজা, আমার সম্মানভাজন, আপনি যদুগণের অগ্রণী ও প্রভু। বিচারার্থ আপনি স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। যদি আপনি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে চান, যদি আপনার মনে ব্যথা না হয়, আমি এই রাজ্য আপনায় ছাড়িয়া দিলাম, আপনি চিরকালের জন্য ইহা গ্রহণ করুন (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩২ অ, ৪৭—৫৩ শ্লোক)।" রাজা উগ্রসেন তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর রাত্রি শেষ হইয়া সূর্য্যোদয় হইলে, কংস এবং ভ্রাতা সুনামা যথোচিত অগ্নিসৎকারলাভ করিল। কংসভয়ে যে সকল আত্মীয় স্বজন স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ, কুকুর বংশীয়গণ বিদেশস্থ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়া, ধনধান্য দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (ভাগবত, ১০স্ক, ৪৫ অ, ১৩ শ্লোক)।

পিতা নন্দের নিকট রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে গমন করিয়া, তাঁহাকে পিতৃসম্বোধনে সন্তুষ্ট করত, বহু উপহার দিয়া ব্রজে প্রেরণ করিলেন (১০স্ক, ৪৫অ, ১৬—১৮ শ্লোক)।

শস্ত্রশিক্ষা

অনন্তর গর্গমুনি কর্তৃক রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইলেন। উপনয়নানন্তর শিক্ষার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহ সান্দীপনি মুনির নিকটে গমন করিলেন। ইনি অবন্তীপুরে বাস করিতেন, কাশীতে ইঁহার জন্ম। সেখানে উভয় ভ্রাতা অল্পদিনমধ্যে শস্ত্রবিদ্যা এবং বিবিধ শাস্ত্র অধিকারপূর্ব্বক, কি দক্ষিণা দিবেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু তাঁহাদিগকে অমিততেজা দর্শন করিয়া, তাঁহার অপহৃত পুত্রকে পুনরানয়ন করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। কথিত আছে, প্রভাসতীর্থে সান্দীপনিপুত্র তিমিকর্তৃক অপহৃত হয়। সেই হইতে তাঁহার মৃত্যু তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পঞ্চজননামা অসুর তিমিরূপ ধারণ করিয়া, সমুদ্রমধ্যে তাঁহাকে অপহরণ করে। এই ঘটনা এবং অন্যান্য ঈদৃশ ঘটনায় প্রতীতি হয় যে, সমুদ্রের দ্বীপবাসী অসভ্যজাতিগণ তৎকালে বালকদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইত। এই সকল অপহৃত বালককে দাস্যে নিয়োগ অথবা আর্য্যজাতির উপরে বৈরসাধনের জন্য তাহারা এইরূপ অত্যাচার করিত। সমুদ্রে স্নানার্থ অবতীর্ণ বালকগণকে জলমগ্ন অসভ্যগণ টানিয়া লইয়া যাইত, ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের এই দুশ্চেষ্টা জানিতেন, অন্যথা মৃত পুত্রের আনয়নপ্রার্থনা কিরূপে সম্ভবে *। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া, গুরুপুত্রকে যমপুরী হইতে উদ্ধার করেন এবং জয়চিহ্নস্বরূপ সেই অসুরের শঙ্খ আনয়ন করেন। কৃষ্ণ নিয়ত এই শঙ্খ ব্যবহার করিতেন। পঞ্চজনের এই শঙ্খ ছিল বলিয়া, ইহার নাম পাঞ্চজন্য হইয়াছে।

পাণ্ডুপুত্রগণের সংবাদগ্রহণ

শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন করিবার কিছুকাল পরে, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চভ্রাতার পিতা পাণ্ডুরাজা পরলোক গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার

* হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৩ অ, ১৫ শ্লোক) তিমি, বিষ্ণুপুরাণে (৫ অং, ২১ অ, ২৬ শ্লোক) শঙ্খ সান্দীপনিপুত্রকে লইয়া যায়, বর্ণিত থাকাতে, তিমি বা শঙ্খ বাস্তবিক নয়, অনার্য্য জাতির দুশ্চেষ্টাই সত্য, সহজে প্রতীত হয়।

করিতেছেন না। এই বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব কি, জানিবার জন্য, অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। সমুদায় অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য, অক্রূর কয়েক মাস হস্তিনায় অবস্থিতি করেন। তিনি বিদুর ও কুন্তীপ্রমুখাৎ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অসূয়ার কথা শ্রবণ করিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ শস্ত্রবিদ্যায় অতি কুশল হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদিগের মনে হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য বিষদান করা হইয়াছিল, অক্রূর সে সংবাদও শ্রবণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দুঃখাপনয়ন করুন, এই বলিয়া কুন্তীদেবী বহু বিলাপ করেন। অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রকে হিতকর বাক্য অনেক বলেন, তাহাতে কিছু ফল হয় না। তিনি মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সমুদায় বিষয় জ্ঞাপন করেন।

জরাসন্ধ সহ যুদ্ধ ও কালযবনবধ

জরাসন্ধ নৃপতির অস্তি ও প্রাপ্তি নামক দুই কন্যাকে কংস বিবাহ করে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, তাহারা পিতৃগৃহে গিয়া, কংসের মৃত্যুর আমূল বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করে। জরাসন্ধ তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তদশ বার মথুরা আক্রমণ করে; কিন্তু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, কয়েক বারেই ভগ্নমনোরথ হইয়া, তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। জরাসন্ধ সহ অষ্টাদশ বার যুদ্ধ হইবে, ইতোমধ্যে কালযবননামা ম্লেচ্ছ শক, তুখার, দরদ, পারদ, তঙ্গণ, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী ম্লেচ্ছ সৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা পরিবেষ্টন করে। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, কালযবনের ঈদৃশ দুশ্চেষ্টা উপস্থিত হয়। কাল-যবনের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের গুরু গার্গ্য অত্যন্ত তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যনিবন্ধন দারপরিগ্রহ করেন নাই। যদুসভায় শ্যালনামা এক ব্যক্তি তাঁহাকে ষণ্ড অর্থাৎ পুরুষত্ববিহীন বলিয়া উপহাস করে। ইহাতে সভাস্থ যাদবগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠে। গার্গ্য মনোদুঃখে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, এবং দ্বাদশ বর্ষ কঠোর তপস্যার পর, নিয়োগানুসারে অনপত্য যবনাধিপতির ভার্য্যায় এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্র এই কালযবন। কালযবন অত্যন্ত বলশালী ছিল, সে পূর্ব্বে নারদমুখে যাদবগণের বলশালিত্বের সংবাদ পায়; তাই তাঁহাদের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার স্পৃহা বলবতী হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ৫অং, ২৩অ, ১ - ৬ শ্লোক)।

কৃষ্ণ ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া, সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল, এখানে যোদ্ধবর্গ কেন, আবশ্যক হইলে, স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। কালযবনের আগমনের পূর্ব্বে, তিনি সমুদায় মথুরাবাসিগণকে দ্বারকায় রাখিয়া আসিয়া, স্বয়ং মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। যখন কালযবন মথুরা আবেষ্টন করে, তখন তিনি নিরস্ত্র হইয়া বাহির হন। কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, কালযবন তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কৃষ্ণ একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত-গুহায় গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন, কালযবনও সেখানে প্রবেশ করিল। কালযবন গিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। সে মনে করিল, কৃষ্ণ এখানে আসিয়া ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন, তাই কোপে শয়ান পুরুষকে পদাঘাত করিল। কথিত আছে, সেই পুরুষ নয়নোন্মীলন করিবামাত্র, তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। আখ্যায়িকা এই, ত্রেতাযুগোৎপন্ন মুচকুন্দ রাজা দেবগণের শত্রুবধ করিয়া, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, গিরিগুহায় শয়ন করেন। দেবগণ তাঁহাকে এই বলেন, যে কেহ তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সে তোমার দেহজাত অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যাইবে (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অং, ২৩ অ, ১৮—২২ শ্লোক)। ইহার অর্থ যাহাই হউক, মূল কথা এই, কৃষ্ণ স্বয়ং কালযবন সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার বিদিত গুহাশায়ী এক জন অমিতবলশালী পুরুষ দ্বারা তাহাকে বধ করান।

কালযবনকে এইরূপে কৌশলে বিনাশ করিয়া, কৃষ্ণ অনায়াসে সমুদায় ম্লেচ্ছ-সৈন্যপরাজয় এবং হস্ত্যশ্বধনাদিহরণ করিলেন। অপহৃত সৈন্য লইয়া তিনি গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে জরাসন্ধ সসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এতদ্দর্শনে রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে পলায়নপূর্ব্বক, সমীপবর্ত্তী প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ সেই গিরিতে অনলসংযোগ করিয়া দিয়া মনে করিল, তাঁহারা উভয়েই প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছেন। এদিকে রাম ও কৃষ্ণ দহ্যমান গিরিতট হইতে উল্লম্ফনদানপূর্ব্বক, ভূমিতে নিপতিত হইয়া, গোপনে স্বপুরী দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন *।

---

* এই বিষয়টি কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ স্ক, ৫২ অ, ৯—১১ শ্লোকে) প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে নাই। হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্ব ৪২ অ, ৫৬ শ্লোক) গোমন্তপর্ব্বতদাহের কথা উল্লিখিত আছে। এটি তদনুরূপ বলিয়া আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভাগবতে প্রবর্ষণ

দ্বারকায় স্থিতি

রুক্মিণীপরিণয়

আজ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরিণীত হন নাই। তিনি বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজার তনয়া রুক্মিণীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ভীষ্মকতনয় রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষনিবন্ধন ভগিনীকে তাঁহার করস্থা করিতে সম্মত হইল না। জরাসন্ধের নিয়োগানুসারে, শিশুপাল সহ রুক্মিণীর বিবাহের উদ্যোগ হইল। বলরামাদি যদুকুল সহ কৃষ্ণ পরিণয়স্থলে উপস্থিত হইলেন *। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পূজার্থ বহির্গত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহ মন্ত্রণা করিয়া, তাঁহাকে হরণ করিলেন। তিনি রুক্মিণীকে রথারূঢ় করিলেন, এদিকে বলদেব যদুসৈন্য সহ রাজগণের দুশ্চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। রুক্মী এতদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া, কৃষ্ণকে বধ করত ভগিনীকে আনয়ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সে সসৈন্যে নর্ম্মদাকূলে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রুক্মী প্রথমতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, পরিশেষে সমবেত রাজগণ তাহার পরাজয় দর্শন করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। অমিততেজা কৃষ্ণ কিছুতেই ভীত হইলেন না, তিনি সকলকে পরাভূত করিলেন। রুক্মী ক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং বিরথ হইয়া অসিচর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইল। কৃষ্ণ তাহার অসিচর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক, তাহাকে বাণাঘাতে ভূতলে পাতিত করিলেন। রুক্মিণীর প্রার্থনায় তিনি তাহাকে বধ করিলেন না, কিন্তু শ্মশ্রু-ও-কেশকর্ত্তনপূর্ব্বক অবমানিত করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দিলেন। অবমানিত রুক্মী আর কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করে নাই, ভোজকটনামক প্রসিদ্ধ স্থানে আবাসনির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। কালে রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের দশ পুত্র এবং এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রগণ মধ্যে প্রদ্যুম্ন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কথিত আছে, প্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুর

পর্ব্বত হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইয়া দ্বারকায় গমন বর্ণিত আছে। হরিবংশে গোমন্ত পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক জরাসন্ধ সহ যুদ্ধ এবং দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বলরামের জরাসন্ধবধে ক্ষান্তি, পরে তথা হইতে করবীরপুরে গমনপূর্ব্বক (বিষ্ণুপর্ব্ব ৪৩ অ) শৃগালনিপতিকে বধ করিয়া, তৎপুত্রের রাজ্যাভিষেক (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪৪ অ), অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

* পরিণয়প্রার্থিনী হইয়া রুক্মিণী একজন ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন (ভাগবত ১০ স্ক, ৫২ অ, ১৯ শ্লোক), এ কথা হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে নাই।

সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায় * ; কিন্তু তিনি কালে সেই অসুরকে বধ করিয়া, তৎপত্নী মায়াবতীকে বিবাহপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন।

স্যমন্তকবৃত্তান্ত

রাজা সত্রাজিৎ নিজ কন্যা সত্যভামাকে স্যমন্তক-মণি সহকারে কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। এই মণিসম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে। রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যারাধনা করিয়া স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ এই মণির প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাঁহার প্রার্থনা ভঙ্গ করেন। কতক দিন পরে, সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্যমন্তকমণি ধারণ করিয়া, মৃগয়ার্থ বহির্গত হন। প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক হত হইলে, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়া, মণি নিজ গৃহে আনয়ন করেন। প্রসেনের মৃত্যু বনের অলক্ষিত প্রদেশে হয়, সুতরাং সকলের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য প্রসেনের প্রাণহনন করিয়াছেন। তিনি এই অপবাদের নিরসন জন্য সসৈন্য বনে প্রবেশ করেন। তিনি অশ্ব সহ প্রসেনকে বনে হত দেখিতে পাইলেন। অগ্রে সিংহের, তৎপর ঋক্ষরাজের পদচিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক, তিনি পর্ব্বতগহ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমুদায় যদুসৈন্য রাখিয়া, তিনি একাকী তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ঋক্ষরাজের ধাত্রী ক্রন্দনপরায়ণ সন্তানকে স্যমন্তক মণির নামোল্লেখ-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেছে, ইহা শ্রবণ করিয়া, তিনি অগ্রসর হইলেন। ধাত্রী তাঁহাকে দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। জাম্ববান্ আসিয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে এক বিংশতি দিন অতিবাহিত হয়। যদু সৈন্যগণ পঞ্চদশ † দিন প্রতীক্ষা করিয়া, তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করে, এবং গৃহে আসিয়া তাঁহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করে। পিতা মাতা বন্ধুবান্ধব সকলে বহু বিলাপানন্তর, তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাধা করেন।

---

* শম্বর প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে, এবং বৃহৎকায় এক মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জালজীবিগণ সেই মৎস্য ধরিয়া শম্বরকে উপহার দান করে। শম্বরপত্নী মায়াবতী মৎস্যগর্ভে অদ্ভুত সেই বালককে পাইয়া প্রতিপালন করেন, এ সকল কথা হরিবংশে নাই।

† ভাগবতে দ্বাদশ দিন (১০ স্ক, ৫৬ অ, ২৪ শ্লোক)।

জাম্ববান্ রণে পরাভূত হইয়া, তাঁহার কন্যা জাম্ববতী সহ স্যমন্তকমণি কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণি অর্পণ করিলে, তিনি ভয়প্রযুক্ত সত্যভামার তৎসহ বিবাহ দেন। এই ব্যাপারে একটি বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সত্যভামাকে প্রার্থনা করে। এই ব্যাপারে তাহারা নিরাশ হইয়া, সত্রাজিৎকে বধ করিবার জন্য ষড়্যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। অক্রূর প্রভৃতি অবকাশ অন্বেষণ করিতেছিল, ইতোমধ্যে জতুগৃহদাহে পাণ্ডবগণের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ তচ্ছ্রবণে বলভদ্র সহ বারণাবতে গমন করেন। এই অবসরে শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া, মণি অপহরণ করে। পিতৃবধে শোকাতুরা সত্যভামা বারণাবতে চলিয়া যান। পত্নীর নিকটে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণ বলভদ্র সহ পরামর্শ করেন এবং শতধন্বাকে বধ করিয়া উভয়ে মণিগ্রহণ করিবেন, স্থির হয়।

শতধন্বা ভীত হইয়া, তৎসহকারী কৃতবর্ম্মার নিকটে সহায়তা প্রার্থনা করে। কৃতবর্ম্মা কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া, সাহায্যদানে অস্বীকৃত হয়। শতধন্বা আর কি করে, মণি অক্রূরের হস্তে অর্পণ করে এবং এ কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। শতধন্বা এক দ্রুতগামী বড়বাপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করে। কৃষ্ণ ও বলরাম তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। পথে মিথিলার নিকটবর্ত্তী বনে বড়বা প্রাণত্যাগ করে। শতধন্বা পদব্রজে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ বলভদ্রকে বলেন, আপনি এখানে রথে অবস্থিতি করুন, আমি উহার পশ্চাৎ অনুসরণ করি। বলভদ্র তাহাতে সম্মত হন; কিন্তু যখন শতধন্বাকে বধ করিয়া কৃষ্ণ মণি পাইলেন না এবং সেই সংবাদ আসিয়া তাঁহাকে দিলেন, তিনি কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া, আর দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না. মিথিলায় জনকগৃহে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাপরিচালন শিক্ষা করেন। তিন বৎসর পরে অনেক সাধ্যসাধনায় তাঁহাকে দ্বারকায় প্রত্যানয়ন করা হয়।

অক্রূর মণি রাখিবার সময় হইতে ক্রমান্বয়ে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। যজ্ঞে প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা হয়, এজন্য অক্রূর যজ্ঞকে আপনার

জীবনরক্ষার উপায় করিয়া লইয়াছিলেন। অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ কলহ করিয়া দ্বারকা পরিত্যাগ করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্রূরও চলিয়া যান। তাঁহার গমনের পর দ্বারকায় দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয়। অক্রূরের পিতা শফল্ক অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। লোকের বিশ্বাস, তিনি যেখানে থাকিতেন, সেখানে দুর্ভিক্ষাদি হইত না। সকলে বলিতে লাগিল, অক্রূর তাঁহার পুত্র, তাই তাঁহার অদর্শনে দ্বারকায় উৎপাত উপস্থিত। কৃষ্ণ এ কথায় বিশ্বাস করিলেন না, মণিতিরোধানে এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে, তিনি স্থির করিলেন। তিনি অক্রূরের যজ্ঞানুষ্ঠানেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অক্রূরের নিকটেই মণি আছে। সে যাহা হউক, এক দিন কৃষ্ণ সকল স্থান হইতে যাদবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, স্বগৃহে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে অক্রূরও ছিলেন। কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া অক্রূরকে বলিলেন, "তোমার নিকট মণি আছে। আর্য্য বলভদ্রের আশঙ্কা যে, আমি শতধন্বাকে বধ করিয়া মণিগ্রহণ করিয়াছি। তুমি সেই মণি সকলকে দেখাইয়া, সেই আশঙ্কা দূর করিয়া দাও, ভয় নাই, মণি তোমারই থাকিবে (বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১৩ অ, ৬০ শ্লোক)।" মণি অক্রূরের কণ্ঠে ছিল, তিনি ভাবিলেন, এখনই বস্ত্রোন্মোচন করিলে মণি বাহির হইয়া পড়িবে। কি করেন, সকলকে মণি বাহির করিয়া দেখাইলেন। মণি দেখিয়া বলভদ্রের লোভ হইল, সত্যভামাও 'আমার পিতার ধন' বলিয়া সস্পৃহ হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, এই মণি ব্রহ্মচর্য্যবান্ ভিন্ন অন্যে ধারণ করিলে রাজ্যের মহৎ অনিষ্ট হয়। আর্য্য বলভদ্র মদিরাপানাসক্ত; আমি বহু-স্ত্রী-পরিগ্রহ করিয়াছি, আমার ব্রহ্মচর্য্য কোথায়? সত্যভামাই বা কি প্রকারে মণিধারণ করিবেন? অক্রূরই এ মণিধারণের উপযুক্ত, এ মণি তাঁহারই নিকট থাকুক *।

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা এই আট জন প্রধানা মহিষী। এতদ্ব্যতীত কথিত আছে যে, তিনি ষোড়শ সহস্র একশত স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এটি যদুবংশের এক প্রকার

---

* এতচ্চ সর্ব্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যগুণবতা ধ্রিয়মাণমশেষরাষ্ট্রস্যোপকারকম্, অশুচিনা ধ্রিয়মাণমাধারমেব হন্তি। ৬৮। অতোহহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে। ৬৯। কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু। আর্য্যেণ বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ কথং কার্য্যঃ। তদয়ং যদুলোকোহয়ং বলভদ্রোহহং সত্যা চ ত্বাং দানপতে প্রার্থয়ামঃ, এতত্ত্বানেব ধারয়িতুং সমর্থঃ। ৭০। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ, ১৩ অ।

কৌলিক প্রথা বলিলে ক্ষতি হয় না। পুরাণলেখকগণ যে সংখ্যা লেখেন, যদি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে যদুপুত্র ক্রোষ্টের বংশোৎপন্ন শশবিন্দু ভূপতির এক লক্ষ পত্নী এবং দশ লক্ষ পুত্র ছিল *, বিশ্বাস করিতে হয়। ইহার তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত আট স্ত্রী এবং এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র কিছুই নয়, বলিতে হয়। এ সকল বর্ণনার সত্যাসত্যনির্ণয় নিষ্প্রয়োজন; এ সম্বন্ধে যিনি যাহা মনে করেন করুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ষোল হাজার একশত স্ত্রীপরিগ্রহের মূল বৃত্তান্ত এই—প্রাগ্‌জ্যোতিষে নরকনামক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, দেবগণ তাঁহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত। ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করাতে ইন্দ্র আসিয়া অভিযোগ করেন, তাই তদুদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। নরকবধান্তে তাঁহার গৃহে অবরুদ্ধ ষোল হাজার এক শত কন্যা অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ আনীত হন। এই সকল কন্যা এক দিনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন। নরকরাজার বধকালে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী ছিলেন। কথিত আছে, ইন্দ্রভবনে পারিজাতদর্শনে ইঁহার তৎপ্রতি লালসা হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনানুসারে পারিজাতবৃক্ষানয়নজন্য নিজ বাহনোপরি উহাকে স্থাপন করেন, ইহাতে ইন্দ্র সহ যুদ্ধ হয়। ইন্দ্র সমরে পরাজিত হইয়া, উপহারস্বরূপ পারিজাতবৃক্ষ দান করেন। এই দেবতরু দ্বারকায় আনীত হইয়া তথায় স্থাপিত হয়।

এ সকল অবান্তর কথা, কথার উদ্ঘাতে কথিত হইল। ইহার পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হয়, তাহা লিখিবার যোগ্য। রুক্মী নিজ কন্যা শুভাঙ্গীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠান করে। এই স্বয়ংবরে রুক্মিকন্যা কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে বরণ করিয়াছিল। শুভাঙ্গীগর্ভে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। রুক্মী যদিও কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিল, তথাপি ভগিনীর প্রতি মমতাবশতঃ নিজ পৌত্রী রুক্মবতীকে † অনিরুদ্ধের অভিলাষমত তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র প্রভৃতি গমন করেন। বিবাহান্তে কলিঙ্গরাজ এবং অন্যান্য ভূপতিগণ রুক্মী নৃপতিকে বলিলেন, বলদেব অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, আপনি ইহার সহিত

---

* "রুষদ্রোশ্চিত্ররথঃ, তত্তনয়ঃ শশবিন্দুশ্চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যভবৎ। ১। তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ। দশলক্ষসংখ্যাশ্চ পুত্রাঃ। ২।" বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১২ অ।

† ভাগবতে ইহার নাম রোচনা (১০ স্ক, ৬১ অ, ১৯ শ্লোক)।

ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন। রুক্মী প্রথম দুই বার বলদেবকে পরাজয় করে। অন্য দুই বার সে পরাজিত হয়, অথচ ছলপূর্ব্বক আমি জিতিয়াছি বলে এবং কলিঙ্গ দন্তবিকাশ করিয়া বলদেবকে উপহাস করে। কথিত আছে, বলদেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। অশরীরী বাণী তাঁহার জয় গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করাতে, বলদেব আর অধর্ম্ম সহ্য করিতে পারিলেন না, সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষফলক * দ্বারা আঘাত করিয়া রুক্মীর প্রাণহনন করিলেন এবং কলিঙ্গনৃপতির দন্তপাটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ এই ব্যাপারে বলভদ্র ও রুক্মিণীর প্রীতিভঙ্গভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কৃষ্ণের চরিত্রের মহত্ত্বপ্রদর্শনজন্য এই বিষয়টি বিস্তৃতরূপে এখানে নিবদ্ধ হইল। এক দিকে ভ্রাতার প্রতি কৃষ্ণের অটল ভাব, আর এক দিকে পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, এ দুই কেমন সমঞ্জস ভাবে অবস্থিত ছিল, এই ঘটনায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপত্নী রুক্মিণীর কি প্রকার উচ্চভাব ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর এক দিনের কথোপকথন সংক্ষেপে নিবদ্ধ করা যাইতেছে।

অপূর্ব্ব দাম্পত্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে একদা শ্রীকৃষ্ণ শয়ান আছেন, রুক্মিণী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্রি, অনেক ভূপালেরা তোমার পাণিগ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তোমার ভ্রাতা ও পিতা শিশুপালের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমায় স্বীকার করা তোমার ভাল হয় নাই। দেখ, আমি ভয়বশতঃ সমুদ্রমধ্যে পুরীনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি, আমার রাজ্যাসন কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমাদিগের ন্যায় লোকের ব্যবহার সৃষ্টি ছাড়া, আমাদিগের আচার ব্যবহার কিছু বুঝিবার যো নাই। লোকে যে প্রকার স্ত্রীপুত্রাদির অধীন হয়, আমরা সেরূপ নহি; আমরা যে পথ ধরিয়াছি, তাহাতে স্ত্রীগণের কেবল পদে পদে অবসাদ উপস্থিত হয়। দেখ, আমরা গরীব দুঃখীকে ভালবাসি, তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে আমাদের সুখ, এ জন্য পৃথিবীর বড় লোকেরা প্রায়

* ভাগবতে পরিষ্যাস্ত্র (১০ স্ক, ৬১ অ, ২৫ শ্লোক)।

আমাদিগের সঙ্গ করে না। যাহাদের ধনজনাদি সমান, তাহাদিগের দুই জনের মধ্যে বিবাহ হইলে তবে ভালবাসা জন্মায়, উত্তম ও অধম এ দুইয়ে পরিণীত হইলে, কখন প্রণয়ের সম্ভাবনা নাই। বৈদর্ভি, তুমি অকার্য্যদর্শিত্বজন্য আমায় বিবাহ করিলে, আমায় পরিত্যাগ করিয়া বড় বড় ক্ষত্রিয়গণকে বরণ করাই তোমার শ্রেয়ঃ ছিল। শিশুপালাদির অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য আমি তোমায় বরণ করিয়া আনিয়াছি বটে, কিন্তু জানিও, আমরা দেহ গেহ উভয় সম্বন্ধে উদাসীন, স্ত্রী পুত্র অর্থাদিতে আমাদের কোন অভিলাষ নাই। আমরা নিয়ত আপনাতেই আপনি পরিতুষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, রুক্মিণী অশ্রুমোচন এবং অতীব অধৈর্য্যপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে, তিনি আপনার উচ্চতম বিশ্বাসের কথা বলিয়া, তাঁহার কথাগুলির একটি একটি করিয়া উত্তর দিলেন। তাঁহার কথাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইল যে, তিনি তাঁহাকে ভিন্ন এ সংসারে আর কিছুই চাহেন না, তাঁহাকে লাভ করিয়াই তিনি পরিতুষ্ট, আর কিছুতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। যাহারা তাঁহার প্রভাব জানে না, তাহারাই কেবল অন্য বিষয়ের অভিলাষী, তিনি সে সকল ব্যক্তির মত নহেন। শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার নিকট পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যাদি কিছুই নহে। তিনি বলিলেন, "যে সকল স্ত্রী তোমার পাদপদ্মের মধুর আঘ্রাণ পায় নাই, তাহারা ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল, বাত পিত্ত কফ, এই সকলে আবৃত জীবিত শবকে মূঢ়তাবশতঃ পতিজ্ঞানে ভজনা করে *।" এ কথা অতি উচ্চ কথা. কেন না এতদ্দ্বারা দেখা হইতেছে, রুক্মিণী কৃষ্ণের সহিত দেহসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁহার সহিত পূর্ণ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে মিলিতা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে রুক্মিণীর নিঃস্বার্থ প্রেমে তিনি যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর ভ্রাতার অবমাননা করিয়াছিলেন, বিবাহসভায় বলদেব তাহাকে বধ করেন, ইত্যাদি সমুদায় দুঃখ যে কৃষ্ণপ্রতি

---

* "ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

ভাগবত ১০ স্ক, ৬০ অ, ৪৩ শ্লোক।

প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধন তিনি বহন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

উষাহরণ

প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ প্রথমে রুক্মিপৌত্রী রুক্মবতীর, তৎপর বাণকন্যা উষার পাণিগ্রহণ করেন। এই পরিণয়কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয় নাই। এ সম্বন্ধে বৃত্তান্ত এই, শোণিতপুরে বাণনামা এক জন অমিততেজা রাজা ছিলেন। কথিত আছে, ইনি শিবের আরাধনায় অজেয় হইয়াছিলেন; এমন কি, স্বয়ং রুদ্র ইঁহার দ্বারে রক্ষক হইয়া অবস্থিত ছিলেন। আমরা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র হস্তের কথা পুরাণে পাঠ করিয়াছি। রঘুবংশে কালিদাস যুদ্ধকালে সহস্র বাহু অনুভূত হইত বলিয়া, এই সহস্র বাহু উড়াইয়া দিয়াছেন। বাণেরও আমরা সহস্রবাহুত্বের কথা শুনিতে পাই। এ সহস্রবাহুত্বসম্বন্ধেও আমরা সেই কথা বলিতে পারি। বাণ সমুদায় পৃথিবীতে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে না পাইয়া, রুদ্রের নিকট প্রতিযোদ্ধার প্রার্থী হন। তিনি বলেন, যে সময়ে তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

বাণ সহ যুদ্ধের কারণ এই। বাণকন্যা উষা স্বপ্নে একটি অতিসুন্দর পুরুষ দর্শন করিয়া, তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি অধীরা হইয়া ক্রন্দনে প্রবৃত্তা হইলেন। এতদ্দর্শনে বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডকন্যা চিত্রলেখা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া, চিত্রযোগে এক একটি সুন্দর পুরুষকে তাঁহার নয়নগোচর করেন। প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শনে, তিনিই তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছেন, উষা চিত্রলেখাকে বলেন। চিত্রলেখা দ্বারকায় গমন করিয়া, কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে গোপনে উষা-সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করেন। গান্ধর্ব্ব বিধিতে উভয়ের পরিণয় হয়। রক্ষিগণ এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজাকে জ্ঞাপন করে। ক্ষণিক যুদ্ধের পর বাণ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নতনয় বন্দী হন। শোকার্ত্ত যাদবগণ চারি বৎসর পর, অনিরুদ্ধ কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এ সংবাদ নারদমুখে শ্রবণ করেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমরোদ্যম হয়। কথিত আছে, প্রথমতঃ রুদ্র সহ কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়, ইহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছিল। হইতে পারে, এতৎপূর্ব্বে জ্বরের তত প্রাদুর্ভাব ছিল না, বহু সৈন্যের অস্বাস্থ্যকর স্থানে সমাগমজন্য উহার প্রবল আক্রমণ হয়। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ চক্রদ্বারা বাণের বাহুমণ্ডল ছেদন করিয়া ফেলেন। শিব আসিয়া

যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন, ইহাতেই বাণের প্রাণরক্ষা পায়। উষা ও প্রদ্যুম্নতনয়কে লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন।

পৌণ্ড্র বধ

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে যে একটী ঘটনা বর্ণিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনকালে ঘটিয়াছিল। করূষাধিপতি পৌণ্ড্র নৃপতি মদদর্পে অন্ধ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে এবং বাসুদেবনামে খ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয়পূর্ব্বক, আপনার খ্যাতি-স্থাপন করিবার অভিপ্রায় সে নারদের নিকট অভিব্যক্ত করে। দেবর্ষি নারদ তাহার প্রতিবাদ করেন। ইহাতে ক্রোধভরে নিশীথসময়ে সসৈন্য আসিয়া সে দ্বারকা পরিবেষ্টন করে। এ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন না। সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণের সহিত তাহার সংগ্রাম হয়। প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার সন্নিহিত ভূমিতে আগমন করিয়া সমরশব্দ শুনিতে পান, ইহাতে পৌণ্ড্রের দুশ্চেষ্টা বুঝিতে পারেন। সে যাহা হউক, তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, পৌণ্ড্র সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক, পরিশেষে কৃষ্ণের হস্তে সে প্রাণত্যাগ করে *।

কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ

পাণ্ডবগণের বিবাহ

জতুগৃহদাহের পর, পাণ্ডবগণের অন্ত্যেষ্টিসমাধানানন্তর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। কিছু দিন পর তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরোপলক্ষে বলরাম সহ পাঞ্চালে গমন করেন। অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে, দ্রৌপদী তাঁহার অনুগামিনী হয়েন। ইহা দর্শন করিয়া, সমাগত রাজগণ বলপ্রকাশে উদ্যত হয়। বৃকোদর একটি তরু ভগ্ন করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে

---

* পৌণ্ড্রনৃপতির সহিত সংগ্রাম (১০ স্ক, ৬৬ অ) সাম্ববধের (১০ স্ক, ৭৭ অ) পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজসূয়যজ্ঞকালে পৌণ্ড্রাধিপতি জীবিত ছিল। যুধিষ্ঠির যখন দ্যূতক্রীড়ায় নিরত হন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সাম্ববধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ইহাতে এই প্রতীতি হয়, পৌণ্ড্র ও সাম্ববধ অব্যবহিত কালে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ও বৃকোদরের সাহসিক কার্য্য দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন, যদি আমি বাসুদেব হই, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যিনি এই মহাধনু আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি অর্জ্জুন, যিনি বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, ইনি বৃকোদর, ঐ যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ বসিয়া আছেন, উনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, এই দুই কুমার অশ্বিনীপুত্র নকুল সহদেব। এখন প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডুপুত্রগণ এবং কুন্তী জতুগৃহে বিনষ্ট হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিবাদে প্রবৃত্ত রাজগণকে এই বলিয়া নিবারণ করিলেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বলপ্রকাশ করা কখন শ্রেয়স্কর নহে। এতচ্ছ্রবণে রাজন্যবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাণ্ডবগণ অনুযায়ী ব্রাহ্মণদিগের সহকারে কৃষ্ণাকে লইয়া ভার্গবগৃহে গমন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম সহ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা এখানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের বিষয় কি প্রকারে অবগত হইলে ? শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর দিলেন, অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, তাহা জানিতে পারা যায়। যে বিক্রম স্বয়ংবরস্থলে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পাণ্ডুপুত্রগণ ভিন্ন আর কাহাতেও সম্ভবে না। এ অতি সুখের বিষয় যে, আপনারা সকলে অগ্নি হইতে সংরক্ষিত হইয়াছেন। আপনারা প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাদের কল্যাণ হউক, এবং অনলের ন্যায় আপনারা পরিবৃদ্ধ হউন। উপস্থিত রাজগণ এই গুপ্ত সমাগম না জানিতে পারে, এ জন্য সেই রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ সম্পন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মণিরত্নবসনভূষণাদি উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ পাণ্ডবের আগমন ও বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য, বিদুরকে দ্রুপদরাজ-রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এ সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে গমন করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা হস্তিনাপুরে কিছু দিন বাস করিয়া, খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক, সেখানে বিচিত্র পুরী নির্ম্মাণ করেন। অল্প দিনের মধ্যে নগরী বণিগ্‌নিবাসাদিতে অতীব শোভমানা, ধনধান্যাদিতে পূর্ণা, এবং বিবিধ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে স্থাপন করিয়া, বলদেব সহ দ্বারকায় প্রতিগমন করেন।

সুভদ্রাহরণ

পাণ্ডবগণ সুখে খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্যসুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। একদা মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। সকলের একপত্নীজন্য তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ সমুপস্থিত না হয়, এ জন্য নিয়মস্থাপন করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা করেন, কোন এক ভ্রাতা যখন দ্রৌপদী সহ একত্র বাস করিবেন, তখন অন্য কোন ভ্রাতা যদি সেখানে উপস্থিত হন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিতে হইবে। একদা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সহ আসীন ছিলেন। যে গৃহে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, সেই গৃহে পাণ্ডবগণের শস্ত্র ছিল। এক জন ব্রাহ্মণের গোধন তস্করে অপহরণ করে, সে খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে অভয়দানপূর্ব্বক, তাহার গোধনোদ্ধারের জন্য, নিজের বনবাসের প্রতি চিন্তাশূন্য হইয়া, শস্ত্রানয়নজন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে অস্ত্র লইয়া, তিনি চৌরগণকে পরাভব করত, ব্রাহ্মণকে অপহৃত গোধন উদ্ধার করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে উপনীত হইয়া, দ্বাদশবর্ষবনগমনের প্রার্থনা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন পত্নীসহকারে একত্র আসীন থাকেন, সে স্থলে কনিষ্ঠের গমনে ধর্ম্মলোপ হয় না, অতএব তাঁহার বনে যাইবার প্রয়োজন নাই। অর্জ্জুন ইহার এই উত্তর দেন, "ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া ছলাবলম্বন করিবে না, ইহা আপনার নিকটেই শুনিয়াছি; আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, আমি সত্যের অনুসরণ করিয়াই অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি *।" রাজা যুধিষ্ঠির অগত্যা বনবাসে অনুমতি দিলেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনে বাসার্থ বহির্গত হইলেন।

নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া, প্রভাসে গমনপূর্ব্বক, অর্জ্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অর্জ্জুন কি জন্য তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে অবগত

---

* "ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্।
ন সত্যাদ্বিচলিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে॥"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৫ অ, ৩৪ শ্লোক।

হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই, অর্জ্জুনকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য, রৈবতক পর্ব্বতে সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে ভোজন, শয়ন, বিশ্রামানন্তর অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকায় কয়েক দিন বাস করিয়া, রৈবতক পর্ব্বতে উৎসবদর্শনের জন্য তিনি সমাগত হন। কৃষ্ণ ও পার্থ রৈবতকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সখীপরিবেষ্টিতা কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে পার্থ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অর্জ্জুনের তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাকে একান্তচিত্তে অবলোকন করিতেছেন, দেখিতে পাইয়া, কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি এখন বনচারী, তোমার এরূপ ভাব সমুপস্থিত কেন? ইনি আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা, ইঁহার নাম সুভদ্রা, ইনি পিতার অতি প্রিয়তমা কন্যা। যদি তোমার ইঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে পিতাকে এ বিষয় নিবেদন করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া, অর্জ্জুন বলিলেন, ইনি বসুদেবের কন্যা, বাসুদেবের ভগিনী, অতীবরূপসম্পন্না; ইনি কাহার চিত্ত না হরণ করেন? যদি ইনি আমার পত্নী হন, সকল বিষয়ে আমার কল্যাণ সাধিত হয়। কি উপায়ে পরিণয় হইতে পারে, আপনি বলিলে, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথার এই উত্তর দিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংবরে ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু স্বয়ংবরে কন্যালাভ হইবে কি না, ইহার কোন স্থিরতা নাই। স্বয়ংবরে কন্যাহরণ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অবিধিসিদ্ধ নহে। কেন না, এইরূপে বিবাহ বীরপুরুষোচিত। আমার পরামর্শ এই যে, তুমি স্বয়ংবরে সুভদ্রাকে হরণ কর। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, তাঁহার অনুমতি আনয়ন করিলেন।

স্বয়ংবরা সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বত এবং দেবগণের অর্চ্চনা করিবার জন্য গমন করিয়াছেন, জানিতে পাইয়া, ধনঞ্জয় মৃগয়াচ্ছলে কৃষ্ণের রথে আরোহণপূর্ব্বক, রৈবতকে গমন করিলেন। সুভদ্রা অর্চ্চনাসমাপন এবং পর্ব্বতপ্রদক্ষিণ করিয়া, দ্বারকাভিমুখে আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে অর্জ্জুন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। রক্ষিগণ এতদ্দর্শনে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দ্বারকায় আসিয়া, সুধর্ম্মা সভাপালকে সংবাদ দিল। সভাপাল এতচ্ছ্রবণে ভেরী-ধ্বনিযোগে সমুদায় বৃষ্ণিগণকে একত্র সমবেত করিল। তাঁহারা সকলেই এই

সংবাদে অত্যন্ত ক্রোধে অধীর হইয়া গেলেন, এবং পার্থকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া, কন্যাপ্রত্যানয়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সকলে এইরূপ রোষপ্রকাশ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, কৃষ্ণের অভিপ্রায় না জানিয়া, আমাদিগের কিছু অনুষ্ঠান করা সমুচিত নয়। বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমরা তোমারই জন্য পার্থের সমুচিত সৎকার করিয়া থাকি। সে যে পাত্রে ভোজন করিল, সেই পাত্র ভগ্ন করিল। তোমার এবং আমাদের সকলেরই অবমাননা করিয়া, সে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। সে যে আমার মাথায় পা দিয়াছে, বল, কিরূপে তাহাকে ক্ষমা করি। আমি একাই আজ পৃথিবী কৌরবশূন্য করিব, এ অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না।

বলরাম সহ বৃষ্ণিগণ একত্র হইয়া, সকলেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করে নাই, বরং সম্মান করিয়াছে। সে জানে, তোমরা অর্থলুব্ধ নও যে, অর্থ দিয়া কন্যাগ্রহণ করিবে, স্বয়ংবরও কখন অতিক্রম করা সমুচিত নয়। পশুর ন্যায় অপরকে কন্যাদান করা, ইহাও কখন অনুমোদনীয় নহে। এমন কে আছে যে, কন্যাবিক্রয় করিবে? এই সকল দোষ দেখিয়া, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসরণ করিয়া, পার্থ কন্যাহরণ করিয়াছে। সুভদ্রা সহ পার্থের সম্বন্ধ সমুচিত, ইহা জানিয়াই, তাহার ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। কীর্ত্তিমান্ ভরত ও শান্তনুর বংশে জন্ম, কুন্তিভোজাত্মজার আত্মজ, কন্যার্থ এমন সৎপাত্র কাহারই বা পাইতে ইচ্ছা হয় না। আমি মনে করি না যে, অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহ আছে। অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, অর্জ্জুনকে সৌহৃদ্যে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া আনা হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, সকলে তাঁহার কথানুসরণ করিলেন। অর্জ্জুন বিবাহানন্তর এক বৎসর কাল দ্বারকায় থাকিয়া, দ্বাদশবর্ষের অবশিষ্ট কাল প্রভাসে যাপনপূর্ব্বক, সময় পূর্ণ হইলে, খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কালিন্দীর পাণিগ্রহণ

অর্জ্জুন সুভদ্রা সহ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আত্মীয়-স্বজনসহকারে তথায় উপস্থিত হন এবং বিবাহের সমুচিত যৌতুক অর্পণ করেন। আত্মীয় স্বজনগণ কিছু কাল সেখানে আদরে বাস করিয়া, বলরাম সহ দ্বারকায় চলিয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ তথায় পার্থ সহ বাস করেন। এই সময়ে

খাণ্ডববনদাহ হয়। এই খাণ্ডবদাহ বিষয়ে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নির প্রার্থনানুসারে খাণ্ডবদাহে সাহায্য করেন। বৃহৎ খাণ্ডব বন বহু বন্যজন্তুর আবাসভূমি ছিল। এই বন দগ্ধ করিয়া আবাসের উপযোগী করা, এই ব্যাপারের মূল তাৎপর্য্য ছিল, ইহা সহজে সকলের মনে প্রতিভাত হয়। ভাগবত এই সময়ে কৃষ্ণপত্নী কালিন্দীর বিবাহবৃত্তান্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন, মহাভারতে এ বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিশ্রামার্থ যমুনাকূলে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা একটী অতিচারুদর্শনা রমণীকে দেখিতে পান। কৃষ্ণ সেই রমণীর পরিচয় লইবার জন্য, অর্জ্জুনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সেই নারী বলিলেন, কৃষ্ণের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার জন্য তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত। এই কথা শুনিয়া, পার্থ তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আনয়ন করেন। খাণ্ডবদাহান্তে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকূলে প্রাপ্ত সেই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন (১০ স্ক, ৫৮ অ, ১২—১৫, ২০ শ্লোক)।

মিত্রবিন্দা প্রভৃতির পরিণয়

কালিন্দীর পরিণয়ের পর, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃম্বসা রাজাধিদেবীর তনয়া মিত্রবিন্দাকে স্বয়ংবরস্থল হইতে হরণ করিয়া আনয়ন করেন। নগ্নজিৎ রাজার কন্যা সত্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ অযোধ্যা নগরে গমন করেন। অযোধ্যাপতির প্রতিজ্ঞা ছিল, তাঁহার প্রতিপালিত দুষ্ট বৃষভগুলিকে যিনি পরাভূত করিতে পারিবেন, তাঁহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সেই দুষ্ট বৃষভগুলিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, সত্যাকে গ্রহণ করিলেন। যে সকল দুষ্ট রাজগণ এ কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহারা অসূয়াবশতঃ সমরে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণের পক্ষ হইয়া, তাহাদিগকে সমরে নির্জ্জিত করেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতৃম্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন এবং মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর হইতে হরণ করিয়া আনয়ন করেন (ভাগবত ১০ স্ক, ৫৮ অ, ২১—৩৬ শ্লোক)।

বংশবিস্তার

শ্রীকৃষ্ণের আট মহিষীতে দশ দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রুক্মিণীর গর্ভে

প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু ; সত্যভামার গর্ভে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, বিভানু ও প্রতিভানু ; জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ ও ক্রতু ; নাগ্নজিতী সত্যার গর্ভে বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি ; কালিন্দীর গর্ভে শুক, কবি, বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক ; লক্ষ্মণার গর্ভে প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত ; মিত্রবিন্দার গর্ভে বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বহুবন্ন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি ; ভদ্রার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক * ।

জরাসন্ধ-বধ

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞার্থী হইয়া, সৎপরামর্শ জন্য দূতপ্রেরণ করত, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, জরাসন্ধকে জয় না করিলে, রাজসূয়-যজ্ঞ হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তর দান করেন। জরাসন্ধ নৃপতিগণকে আনিয়া, কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল নৃপতিকে কারাগৃহ হইতে বিমুক্ত না করিলে, তৎকালে রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অর্জ্জুন ও বৃকোদর সহকারে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধগৃহে গমন করেন। জরাসন্ধ নৃপতির রাজধানী রাজগৃহ চৈত্যক, বৃষভ, ঋষি, বরাহ ও বৈহার নামক পাঁচটি পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহারা নগরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, নাগরিক লোকেরা নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় ব্যস্তসমস্ত। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম দ্বারস্থ তিনটী বৃহৎ ভেরী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কথিত আছে, এই ভেরী আহত হইলে, তাহার শব্দ এক মাস ক্রমান্বয়ে চলিত। এটি অত্যুক্তি বলিয়া সহজে প্রতীত হয় ; কিন্তু এই তিনটী ভেরী যে সে সময়ে অতি অদ্ভুত বলিয়া পরিগৃহীত ছিল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন, ভীম ও কৃষ্ণ সেই নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধিষ্ঠানস্থানের চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং

---

* এই সকল নাম শ্রীমদ্ভাগবত (১০ স্ক, ৬১ অ, ৮—১১ শ্লোক) হইতে গৃহীত হইল। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে নামের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

সেই দিক্ দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ অমঙ্গলাশঙ্কাকরত জরাসন্ধকে করিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করাইলেন, এবং ব্রত নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেন। জরাসন্ধ নিয়মানুরোধে উপবাসী রহিলেন, এ দিকে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম বলপূর্ব্বক মালাকারগণের নিকট হইতে মাল্যগ্রহণকরত তাহা পরিধান করিলেন, এবং স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের নিকট উপনীত হইলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিল, এবং যজ্ঞগৃহে তাঁহাদিগের আবাস নির্দ্ধারণ করিয়া দিল। ভীম ও অর্জ্জুন মৌনী রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিলেন, ইঁহারা নিয়মে অবস্থিত আছেন, পূর্ব্ব রাত্র অতীত না হইলে ইঁহারা কথা কহিবেন না। জরাসন্ধ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় অর্দ্ধরাত্রে তাঁহাদিগের নিকট আসিল। ইঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণ, অথচ মাল্য পরিধান করিয়াছেন, ইহা নিয়মবিরুদ্ধ মনে করিয়া, তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সন্দিগ্ধচিত্তে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইল, তাঁহাদিগের ভুজে জ্যাচিহ্ন এবং দেহে সুস্পষ্ট ক্ষাত্রতেজ বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন নগরের দ্বার দিয়া প্রবেশ করেন নাই, বলপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাতে জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা স্নাতকবেশে নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছ। ব্রাহ্মণদিগের বল বাক্যে, কার্য্যে নহে। যদি তোমরা ব্রাহ্মণ হইতে, তাহা হইলে তো কখন দৈহিক বল প্রকাশ করিতে না। তোমাদিগের আগমনের প্রয়োজন কি, বল।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন মনে করিতেছ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এ তিন বর্ণই তো স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় স্নাতকব্রত গ্রহণ করিলে শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাই আমাদিগের স্নাতকবেশ, মাল্যপরিধানও সেই জন্য। ক্ষত্রিয়ের বাক্য বল নহে, বাহুবল; যদি সে বল দেখিতে চাও, অদ্য দেখিতে পাইবে। দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, অদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার কারণ এই যে, মিত্রের গৃহে প্রবেশ করিতে দ্বার দিয়া এবং শত্রুর গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে অদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, এই নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ বলিল, তোমাদিগের সঙ্গে আমি কবে শত্রুতা সাধন করিয়াছি? কৈ, আমার তো কিছুই মনে নাই। বিনা কারণে আমায় তোমরা কেন শত্রু মনে করিতেছ? অর্থ বা ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার ব্যাঘাত সমুপস্থিত করিলে, লোকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়া যায়।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া আমি প্রজাগণের প্রতি কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ করি নাই। আমাকে শত্রু বলা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি।

জরাসন্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দান করিলেন, এ সংসারে এক জন কুলকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আমরা সেই কুলধর্ম্মনিরত মহাব্যক্তির নিয়োগে এখানে আসিয়াছি। তুমি আপনাকে কি নিরপরাধ মনে করিতেছ? তুমি বলদর্পে অন্ধ হইয়া নিরপরাধ রাজগণকে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এই রাজগণকে তুমি রুদ্রসন্নিধানে বলিদান করিতে উদ্যত। তোমা ভিন্ন এমন দুর্ব্বুদ্ধি আর কে আছে, যে স্বজাতিকে পশু করিয়া দেবসন্নিধানে বলিদান করিবে। মনুষ্যকে বলি অর্পণ, এ তো আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; তুমি কি প্রকারে মনুষ্যবলি দিয়া শঙ্করের পূজা করিতে অভিলাষী *? তুমি রাজন্যকুলের ক্ষয়ের জন্য সমুদ্যত, আমরা তোমায় বধ করিয়া, সেই কুলক্ষয়নিবারণের জন্য আসিয়াছি। তুমি মনে কর, ক্ষত্রিয়কুলে তোমার সমকক্ষ আর কেহ নাই। এ তোমার মহাভ্রম। কাহার মধ্যে কি প্রকার বীর্য্য আছে, কে জানে? তুমি কাহাকেও অবমাননা করিও না। তুমি এই বলদর্প দূরে পরিহার কর, অন্যথা পুত্র অমাত্য সৈন্য সকলের সঙ্গে তোমায় শমননিকেতনে গমন করিতে হইবে। দম্ভ অতি ভয়ঙ্কর, এই দম্ভের জন্য রাজা কার্ত্তবীর্য্য ও বৃহদ্রথ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণ নহি, আমরা ক্ষত্রিয়। আমরা যুদ্ধে অভিলাষী হইয়া, এখানে আগমন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে মরিলে, অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। আমরা সেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত। তোমায় রণে আমরা আহ্বান করিতেছি। জানিও, আমি বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ইহারা দুই জন পাণ্ডুতনয়। হয় কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গকে মুক্ত করিয়া দাও, নয় যুদ্ধে শমনসদনে গমন কর।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, জরাসন্ধ বলিল, আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, সমরে নৃপালগণকে পরাজয়পূর্ব্বক, বন্দী করিয়া আনিয়াছি। যখন তাহারা সমরে পরাজিত, তখন তাহাদের উপরে আমার সর্ব্বতোমুখীন প্রভুতা। আমি যখন দেবযজনার্থ তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি,

* "মনুষ্যাণাং সমালম্ভো ন চ দৃষ্টঃ কদাচন।
স কথং মানুষৈর্দেবং যষ্টুমিচ্ছসি শঙ্করম্।

তখন ভয়প্রযুক্ত আমি কখনও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিব না। আমি একাকী ব্যূহমধ্যগত এক দুই বা তিন মহারথের সঙ্গে সমর করিতে পারি, আমি কেন ভয়প্রযুক্ত ঈদৃশ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? রাজা জরাসন্ধ এই বলিয়া আপনার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য আদেশ দিয়া, আপনি সমরের জন্য উদ্যত হইল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম, এ তিন জনের মধ্যে জরাসন্ধ ভীমসেনকে আপনার প্রতিযোদ্ধৃপদে বরণ করিল। জরাসন্ধ ও ভীমসেন উভয়ে বাহুযুদ্ধে * প্রবৃত্ত হইলেন। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যুদ্ধারম্ভ হয়, অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিন অনাহারে সমর চলিতে থাকে। অনন্তর জরাসন্ধ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে বলিলেন, ভীমসেন, সমরে প্রবৃত্ত হও। সমরে ক্লান্ত শত্রুকে নিপীড়ন করিলে, শীঘ্র তাহার মৃত্যুসম্ভাবনা। এস্থলে উচিত এই যে, অধিক নিপীড়ন না করিয়া, ইহার সঙ্গে সহজে বাহুযুদ্ধ কর।

ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মনে করিলেন, এই সময়ে শত্রু পরিশ্রান্ত,

---

সবর্ণো হি সবর্ণানাং পশুসংজ্ঞাং করিষ্যসি।
কোঽন্য এবং যথা হি ত্বং জরাসন্ধ বৃথামতিঃ॥"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২২ অ, ১১ - ১২ শ্লোক।

যজুর্ব্বেদে রুদ্রের উদ্দেশে নরবলিদান দৃষ্ট হয়। এখানকার লেখানুসারে প্রতীত হয়, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে এ ব্যবহার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। জরাসন্ধ সেই প্রাচীন ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া, রুদ্রের অর্চ্চনার জন্য রাজন্যবর্গকে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যজুর্ব্বেদে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নরবলিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবোদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রাক্রান্ত এক শত অশীতিসংখ্যক নরনারী ও তাহাদের অঙ্গবিশেষ পশুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবগণমধ্যে শঙ্করের উল্লেখ নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ "যষ্টুমিচ্ছসি শঙ্করং" এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন।

* "ততস্তৌ নরশার্দ্দূলৌ বাহুশস্ত্রৌ সমীয়তুঃ।"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৩অ, ১০ শ্লোক।

ভাগবতে লিখিত আছে জরাসন্ধ ভীমকে একখানি গদা দিয়া, স্বয়ং গদা লইয়া গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

"ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রদায় মহতীং গদাম্।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্বহিঃ॥"

• ভাগবত, ১০ স্ক, ৭২ অ, ২৭ শ্লোক।

ইহাকে বধ করিবার এই উপযুক্ত সময়; তাই তিনি অধিকরোষপূর্ব্বক জরাসন্ধ সহ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণ করিলেন, 'হে ভীমসেন, তোমার যে দৈববল আছে, তোমার যে বায়ুবল আছে, জরাসন্ধকে আজ সেই বল প্রদর্শন কর। (সভাপর্ব্ব, ২৪ অ, ৪ শ্লোক)' এই কথা শ্রবণমাত্র ভীমসেন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন, এক শত বার এই প্রকারে ঘুরাইয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক, জানু চাপিয়া তাহার পৃষ্ঠ ভাঙ্গিলেন। পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া খর্ব্ব করিয়া লইলেন, এবং নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন; তদনন্তর দুই পা ধরিয়া দুভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে জরাসন্ধকে বধ করত, সমুদায় রাজগণকে তাঁহারা মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজগণ প্রণতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কি আদেশ হয়? তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, আপনারা সকলে তাঁহার সাহায্য করুন। জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া, রথারোহণপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। সেখানে বিমুক্ত রাজগণ নৃপতি যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব দেশে এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

শিশুপালবধ

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মদ্রোণাদির প্রতি এক একটি ভার অর্পিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন *। যথাবিধি যজ্ঞসমাপন হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পিতামহ ভীষ্ম বলিলেন, সমবেত নরপালগণকে এখন অর্ঘ্যদান সমুচিত। আচার্য্য, ঋত্বিক্, বিবাহ্য, স্নাতক, প্রিয় এবং নৃপতি, এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ্যভাজন। ইঁহাদিগের জন্য এক একটি অর্ঘ্য আনীত হউক। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্যদান করা সমুচিত। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বাগ্রে কাহাকে দান করা কর্ত্তব্য? ভীষ্ম উত্তর দিলেন, বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত। ইনি তেজ বল পরাক্রম, এ সমুদায়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেখানে সূর্য্য নাই, সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পাইলে, যেমন সমুদায় আলোকিত হয়, যেখানে বায়ু নাই, সেখানে বায়ুসমাগমে যেমন আহ্লাদ উপস্থিত

* "চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩৫ অ, ১০ শ্লোক।

হয়, কৃষ্ণ এই সভায় উপস্থিত থাকাতে, আমাদিগের সেই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। অতএব তুমি ইঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্যদান কর। পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহদেব উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও যথাশাস্ত্র সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহণ করিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩৬অ, ২১—৩১ শ্লোক)।

সভাস্থ শিশুপাল এতদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, এত সকল মহাত্মা সভাস্থলে উপস্থিত, ইঁহারা থাকিতে বৃষ্ণিকুলসম্ভূত কৃষ্ণ কেন অর্চ্চনালাভ করিল। পাণ্ডবেরা অতি বালক, ইহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব কিছুই জানে না। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম স্মৃতিবিভ্রষ্ট, অল্পদর্শী। ইনি ধার্ম্মিক হইয়া, প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন বলিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে ইনি সজ্জনগণের নিকট অবমানিত হইবেন। যাহাকে অর্চ্চনা করা হইল, সে তো রাজা নহে। এত সকল নৃপাল বর্ত্তমান থাকিতে, ইহাকে কেন তোমরা অর্চ্চনা করিলে? যদি কৃষ্ণকে বয়োবৃদ্ধ মনে করিয়া অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে; তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহার পিতা বসুদেব এখানে বর্ত্তমান থাকিতে, এ কি প্রকারে অগ্রে অর্চ্চিত হইতে পারে? যদি হিতকামী বলিয়া অর্চ্চনা করা হয়, রাজা দ্রুপদ থাকিতে এ কি প্রকারে সে সম্বন্ধে অগ্রগণ্য হইতে পারে? যদি আচার্য্য মনে করা হয়, দ্রোণ থাকিতে এ আচার্য্য বলিয়া কিরূপে পরিগণিত হইবে? যদি কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করা হয়, বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন যখন উপস্থিত, তখন এ কিরূপে সে ভাবে অর্চ্চনা পাইবে? ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, দ্রুম, ভীষ্মক, রুক্মী, শল্য, কর্ণ ইঁহারা সকলেই গুণাঢ্য, কেহ কেহ নৃপশ্রেষ্ঠ, ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কি প্রকারে পূজার্হ? কৃষ্ণ না আচার্য্য, না ঋত্বিক্, না নৃপতি, বল, কি হেতুতে ইহাকে পূজা করা হইল? যদি তোমাদের ইহাকে পূজা করিবারই অভিপ্রায় ছিল, এই সকল নৃপতিগণকে অবমাননা করিবার জন্য এখানে কেন আনা হইল? আমরা ভয়-লোভ-বা-সান্ত্বনা-বাক্যে কর দি নাই, ইনি ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক বলিয়া করদান করিয়াছি। ইনি এখন আমাদিগকে সম্মান না করিয়া অপমান করিতেছেন। বল, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অবমাননা হইতে পারে? যে ব্যক্তি অর্চ্চনা পাইবার উপযুক্তলক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাকে রাজসভায় অর্চ্চনা করা হইল। ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মাত্মা এই খ্যাতি অকস্মাৎ হইয়া পড়িয়াছে, অন্যথা ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে কি প্রকারে ইনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া

অর্চ্চনা করিলেন? এই কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যায়পূর্ব্বক নৃপতি জরাসন্ধকে হত * করিয়াছে; ইহার অপেক্ষা আর দুরাত্মা কে আছে? আজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাত্মতা বিদূরিত হইল, কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার নীচতা প্রকাশ পাইল। আচ্ছা, কুন্তীপুত্রগণ যেন ভয়প্রযুক্ত অর্ঘ্য আনিয়া উপস্থিত করিল; কৃষ্ণ, তুমি কি বোঝ না, তুমি কি প্রকারে পূজা পাইবার যোগ্য? বল, তুমিই বা কি বলিয়া পূজা-গ্রহণ করিলে? অনুপযুক্ত হইয়া, তোমার এ পূজা-গ্রহণ, লুকাইয়া কুকুরের যজ্ঞের ঘৃতভোজনের মত কি নহে? তোমায় পূজা দেওয়াতে, তোমাকেই উপহাস করা হইয়াছে, রাজাদের কিছু অপমান হয় নাই। রাজা না হইয়া তোমার রাজপূজা-গ্রহণ কেমন, যেমন ক্লীবের দার-পরিগ্রহ, অন্ধের রূপদর্শন। আজ যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও কৃষ্ণ কে কেমন, সকলেই দেখিতে পাইলেন। শিশুপাল এইরূপ বলিয়া, ক্রোধে রাজগণসহকারে সভা হইতে বহির্গত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এতদ্দর্শনে আস্তব্যস্তে তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনি এরূপ কেন বলিলেন? আপনার এ সকল বলা তো যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ইহাতে কেবল অধর্ম্ম হইল। নিরর্থক বাক্পারুষ্যে প্রয়োজন কি? ভীষ্ম পরম ধর্ম্ম বোঝেন না, তা নয়, আপনি পরম ধর্ম্ম বোঝেন না। যদি বুঝিতেন, আপনি ভীষ্মকে কখন অবমাননা করিতেন না। দেখুন, আপনার অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ নৃপতি আছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। এ দেখিয়াও তো আপনার ক্ষমা করা উচিত। কৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষরূপে ভীষ্ম অবগত। ইনি যেমন ইঁহার তত্ত্ব জানেন, আপনি তেমন জানেন না।

পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, লোকবৃদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চ্চনা যখন এ

---

* জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক হত হইলেও, কৃষ্ণের কৌশলে তাহার বধ সাধিত হয় বলিয়া শিশুপাল কৃষ্ণকে অন্যায়পূর্ব্বক বধের অপরাধী করিয়াছে।

"ময়ি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবযোর্জয়ঃ।
মাগধং সাধয়িষ্যাম ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ॥"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২০ অ, ৩ শ্লোক।

এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জরাসন্ধবধকার্য্যে প্রধান সহায়তা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অনুমোদন করিতেছে না, তখন আর ইহাকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়োজন করে না। রণে জয় করিয়া পরাজিত যোদ্ধাকে যিনি মুক্ত করিয়া দেন, তিনি তাহার গুরু হন। বল, এ সভায় এমন কে আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরাভূত নহেন। কৃষ্ণ যে কেবল আমাদের অর্চ্চনীয়, তাহা নহে, ইনি ত্রিলোকের অর্চ্চনীয়। কৃষ্ণ যুদ্ধে বহু ক্ষত্রিয়প্রধানকে জয় করিয়াছেন, এমন কি, সমগ্র জগৎ ইঁহাতে স্থিতি করিতেছে। এরূপ স্থলে বহু বৃদ্ধ উপস্থিত থাকিলেও, কৃষ্ণেরই অর্চ্চনা করিব। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ অনেক লোকের সেবা করিয়াছি, তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণের অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি জন্ম হইতে কি প্রকার কার্য্য সকল করিয়াছেন, অনেক সমাগত সাধুমুখে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। আমরা জানিয়া শুনিয়াই সাধুজনের অর্চ্চনীয় কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছি। ইঁহার যশ, শৌর্য্য ও জয় অবগত হইয়াই আমরা ইঁহাকে পূজা দিয়াছি, অতি বালক বলিয়া যে আমরা ইঁহার পরীক্ষা করি নাই, তাহা নহে। গুণে যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহাদিগের সকলকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণই পূজার্হ। কেন না ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানে বৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়গণ বলে বৃদ্ধ, এক শ্রীকৃষ্ণে ও দুইই আছে। বল, ইঁহা অপেক্ষা বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানে ও বলে কে অধিক আছে? ইঁহাতে দান, দক্ষতা, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, সদ্বুদ্ধি, সুমতি, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, তুষ্টি, পুষ্টি সকলই আছে; ইনি লোকসম্পন্ন আচার্য্য পিতা গুরু। ইঁহাকে অর্চ্চনা করিব না, তো আর কাহার অর্চ্চনা করিব? ঋত্বিক্, গুরু, বিবাহ্য, স্নাতক, নৃপতি, প্রিয়, সকলই এক কৃষ্ণেতে বিদ্যমান; তাই তাঁহাকে অর্চ্চনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণেতে সমুদায় বিশ্ব অবস্থিত, কৃষ্ণ হইতে সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন, সমুদায় জগতের মধ্যে ইনি প্রধান। শিশুপাল নিতান্ত বালক, তাই ইঁহাকে বুঝিতে পারিতেছে না। যিনি প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম বোঝেন, তিনিই এ সকল বুঝিতে পারেন; চেদিরাজ ইহার কি বুঝিবে? বালক বৃদ্ধ নৃপতি কেই বা কৃষ্ণকে পূজার্হ মনে করে না, কেই বা ইঁহার পূজা করিবে না? শিশুপাল যদি এ পূজায় অনুমোদন না করে, তাহার নিকটে যাহা ভাল বোধ হয়, সে তাহাই করুক।

মহামতি ভীষ্ম এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, সহদেব বলিতে লাগিলেন, আমি অপ্রমেয়পরাক্রম কেশিহন্তা কেশবের অর্চ্চনা করিয়াছি, ইহা যাহাদিগের অসহ্য হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মস্তকে এই পদার্পণ করিতেছি। যদি এখানে

কেহ উত্তরদানে সমর্থ থাকেন, উত্তর দিন। যাঁহারা মতিমান্, তাঁহারা নিশ্চয় আচার্য্য পিতা গুরু অর্চ্চনীয় কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করিতে অনুমোদন করিবেন। সহদেব এই বলিয়া ক্রোধে পদোত্তোলন করিলে, মানী বুদ্ধিমান্ বলবান্ রাজগণের মধ্যে কেহ কিছু বলিলেন না। সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা নারদ সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, যে সকল ব্যক্তি কমলনয়ন কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে না, তাহারা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সম্ভাষণও অনুচিত। তাঁহার বাক্যাবসানে সহদেব পূজার্হ ব্যক্তিগণের অর্চ্চনা করিলেন। কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনৃপতি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিল, আমি আজ সেনাপতি হইয়া, বৃষ্ণি ও পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইব। চেদিরাজ সমবেত নৃপতিগণকে উৎসাহ দিয়া, যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। নৃপতি যুধিষ্ঠির নৃপালবর্গের বিচলিত ভাব দর্শন করিয়া, পিতামহ ভীষ্মকে বলিলেন, এখন কি কর্ত্তব্য? যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয়, প্রজাদিগের কল্যাণ হয়, এমন কি করিতে পারা যায়, বলুন। মহাত্মা ভীষ্ম উত্তর দিলেন, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। কুকুর কি কখন সিংহকে বিনাশ করিতে পারে? ইহার সমুচিত উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখন বৃষ্ণিসিংহ শ্রীকৃষ্ণ প্রসুপ্ত আছেন, তাই নৃপাল-কুক্কুরগণ মহাশব্দ করিতে প্রবৃত্ত। তিনি যত ক্ষণ জাগ্রৎ না হইতেছেন, তত ক্ষণ কুক্কুরসদৃশ এই নৃপতিবর্গকে শিশুপাল প্রোৎসাহিত করিয়া, সিংহের মত করিয়া তুলিতেছে. ইহাদিগের যখন ঈদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত, তখন নিশ্চয় বুঝিতেছি, ইহারা যমনিকেতনে গমন করিবে। কেন না ভগবান্ যাহাদিগকে বিনাশ করিতে চান, তাহাদিগের এই প্রকার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। চেদিপতি শিশুপালের দেখিতেছি, সেই দশা উপস্থিত। জানিও, তিন লোকমধ্যে যে চতুর্ব্বিধ জীব বাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নিধনের হেতু।

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের এইরূপ তেজস্বী বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিশুপাল নিতান্ত ক্রোধে অধীর হইল। রোষকষায়িতলোচনে বলিতে লাগিল, রে কুলাধম, বিভীষিকাবাক্যে রাজগণকে ভীত করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? এখন তোর বৃদ্ধবয়স সমুপস্থিত, এখন তুই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা কি প্রকারে বলিতেছিস্? নৌকার পশ্চাতে বদ্ধ নৌকা, অন্ধের পশ্চাতে অন্ধ যেমন গমন করিয়া থাকে,

কৌরবগণ তেমনি তোর অনুসরণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণের পূতনাবধাদি কার্য্যের উল্লেখ করিয়া, আমাদিগের মন কেবল ব্যথিত করিলি। রে অহঙ্কৃত মূর্খ, কৃষ্ণের স্তব করিতে গিয়া, তোর রসনা কেন শতধা বিদীর্ণ হইল না? বালকেরাও যে ব্যক্তির কুৎসা করিয়া থাকে, তুই জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া, সেই গোপের স্তব করিতে অভিলাষী হইয়াছিস্! এ বাল্যকালে একটা পাখী বা অশ্ব, বৃষভ, যাহারা যুদ্ধনিপুণ নয়, তাহাদিগকে বধ করিয়াছে; ইহা আর বিচিত্র কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত শকট পদাঘাতে নিপাতিত করিয়াছে; এ একটা কি অদ্ভুত ব্যাপার? একটি বল্মীকস্তূপসদৃশ গোবর্দ্ধননামা গিরি সপ্তাহকাল এ ধারণ করিয়াছে, ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না। পর্ব্বতোপরি খেলা করিতে করিতে, এ বহু অন্ন ভোজন করিয়াছে *, এ কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল; আমাদিগের নিকটে ইহা কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। যার অন্ন খাইয়া এ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেই কংসের যখন এ প্রাণবধ করিয়াছে, তখন ইহার সম্বন্ধে কি আর অকর্ত্তব্য আছে? সাধুগণ যে বলিয়াছেন, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ এবং যাহার অন্নভোজন করা যায়, যাহাকে আশ্বাস দান করা যায়, তৎপ্রতি শস্ত্রনিক্ষেপ করিবে না (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৪১অ, ১৩—১৪ শ্লোক); এ কথা কি তুই শুনিস্ নাই? আজ দেখিতেছি, সাধুগণের এই বাক্য তুই খণ্ডন

* শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে যখন গোপগণ শক্রযজ্ঞ পরিহার করিয়া গিরিযজ্ঞ করেন, তখন গোবর্দ্ধনের শিখরোপরি অধিষ্ঠান করিয়া, তিনি বহু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে হরিবংশ লিখিয়াছেন,—

"যজনান্তে তদন্নন্তু তৎ পয়ো দধি চোত্তমম্।
মাংসঞ্চ মায়য়া কৃষ্ণো গিরিভূত্বা সমশ্নুতে॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১৭অ, ২১ শ্লোক।

এখানে মায়ায় গিরি হইয়া ভোজন করিলেন, এরূপ লেখা থাকাতে, সকলে কৃষ্ণকে খাইতে দেখেন নাই, এইরূপ মনে হয়; বস্তুতঃ তাহা নহে। বালকের বহু অন্নভোজন মায়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই জন্য বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে,—

"গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহু তদা গোপবর্য্যাহৃতং দ্বিজ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ১০ অ, ৪৭ শ্লোক।

আমি মূর্ত্তিমান্ গিরি, এই বলিয়া, কৃষ্ণ বহু অন্ন ভোজন করিলেন, এই স্পষ্ট কথা।

করিতেছিস্। রে কৌরবাধম, কৃষ্ণকে যে তুই জ্ঞানবৃদ্ধ বলিলি, এ একান্ত অনভিজ্ঞতাজন্য। গোহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারীকে তুই জগতের প্রভু বলিয়া স্তব করিতেছিস্। আর তোর কথায় কৃষ্ণও আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেছে। চাটুকারের চাটূক্তি স্বভাব, তাহাকে শাসন করিয়া কি হইবে। তোর প্রকৃতি অতি জঘন্য, তোর চেয়ে পাণ্ডবগণের প্রকৃতি আরও জঘন্য। যাদের সর্ব্বাপেক্ষা অর্চ্চনীয় কৃষ্ণ, এবং তুই যাদের পথপ্রদর্শক, অধর্ম্মজ্ঞ হইয়া তুই যাদের নিকটে ধর্ম্মজ্ঞ, তাহারা কেনই বা ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইবে না? তুই যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলি, বল্ দেখি, কোন্ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ করিয়া থাকে? যে কন্যা অপরকে স্বামি-রূপে বরণ করিয়াছিল, তুই তাহাকে কেন হরণ করিয়া আনিলি? যদি বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মভয়ে সেই কন্যাকে পরিহার না করিত, তাহা হইলে তোর এ অধর্ম্ম নিবারণ হইবার কি সম্ভাবনা ছিল? আর তুই থাকিতে, তোর সম্মুখে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে অপরে পুত্রোৎপাদন করিল, ধিক্ তোর ব্রহ্মচর্য্যে! এ তোর ব্রহ্মচর্য্যধারণ হয় মোহে, নয় ক্লীবত্বে। তোর এ ধর্ম্মাচরণে কিছুই ফল নাই। তুই যখন অনপত্য, তখন তোর যজ্ঞদানাদি সকলি নিষ্ফল। তুই অনপত্য হইয়া মিথ্যাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছিস্, তোর সেই হংসের ন্যায় বিনাশ হইবে, যে হংস ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিয়া, পক্ষিগণের আনীত ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিত, অথচ তাহাদের অসমক্ষে তাহার নিকটে রক্ষিত ডিম্বসকল আহার করিত। তুই সেই হংস। পক্ষীদিগের স্থানীয় এই রাজগণ আজ তোকে বধ করিবে। এই কৃষ্ণ কপট ব্রাহ্মণবেশে ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া, অদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, যদি এ জগৎপতি হইবে, তবে জরাসন্ধ-আনীত পাদ্য কেন গ্রহণ করে নাই? আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতে কেন সঙ্কোচ করিয়াছে? তুই পাণ্ডবগণকে সৎপথ-পরিভ্রষ্ট করিয়াছিস্, অথচ তাহারা উহাই সৎপথ মনে করিতেছে, আশ্চর্য্য! অথবা পুরুষত্বহীন তুই যখন সর্ব্বকার্য্যের প্রদর্শক, তখন পাণ্ডবগণের এ দশা হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি।

চেদিরাজ শিশুপালের এইরূপ কটূক্তি শ্রবণ করিয়া, আরক্তিমনেত্র ভীমসেন ভ্রূকুটিপ্রদর্শনপূর্ব্বক, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাকে নিবারণ করিয়া শান্ত করিলেন। কৃষ্ণ ভিন্ন চেদিরাজ আর কাহারও বধ্য নয়, তাহার জন্ম-বৃত্তান্ত

বলিয়া * তিনি ভীমসেনকে বুঝাইলেন। শিশুপালের তেজস্বিতা, তন্মধ্যে কৃষ্ণের তেজ স্থিতি করিতেছে, এই জন্য; এই কথা শুনিয়া সে পুনরায় কটূক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রে নীচ চাটুকার, যদি তোর স্তাবকতাই স্বভাব হয়, তবে কৃষ্ণের স্তব ছাড়িয়া এই বাহ্লীকরাজ দরদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের এবং দ্রোণ প্রভৃতি বীর্য্যশালী যোদ্ধবর্গের স্তবে নিযুক্ত হ। যে স্তবের যোগ্য নয়, কেন তাহাকে বার বার স্তব করিতেছিস্। বুঝিয়াছি, মূর্খতা-বশতঃ মুক্তিকামনায় এই দুরাত্মাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতেছিস্। এ তোর বুদ্ধি নয়, তোর প্রকৃতিই তোকে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। হিমালয়-প্রদেশে ভুলিঙ্গনামক পাখী যেমন সিংহের দন্তলগ্ন মাংসখণ্ড ঠোকরাইয়া খায়, অথচ মূর্খতাবশতঃ বোঝে না যে, তার যে জীবন রক্ষা পায়, সে কেবল সিংহের করুণায়, তোরও সেইরূপ মূর্খতা দেখিতেছি। তুই কি জানিস্ না যে, তোর যে জীবন রক্ষা পাইতেছে, তাহা এই ভূপালগণের কৃপায়। কি বলিব, তোর সমান লোকবিদ্বিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই।

মহামতি ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কি, আমি এই নৃপতিগণের কৃপায় এত ক্ষণ জীবিত আছি? আমি বলিতেছি, আমি নৃপগণকে তৃণসমানও জ্ঞান করি না। এই কথা শুনিয়া ভূপালগণ অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভীষ্ম বলিলেন, তোমরা আমায় পশুবৎ বধই কর, তপ্ত কটাহেই দগ্ধ কর, আমি এই সকলের মাথায় পা রাখিয়া বলিতেছি, এই গোবিন্দ সম্মুখে অবস্থিতি করিতে-ছেন, ইঁহার আমরা অর্চ্চনা করিয়াছি। যার বুদ্ধি মরিবার জন্য সত্বর হইয়াছে, সে ইঁহাকেই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করুক।

* কথিত আছে যে, শিশুপাল যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার চারি ভুজ, তিন নেত্র হয়, জন্মিয়াই গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া অমঙ্গলাশঙ্কায় পিতামাতা পুত্রবিসর্জ্জন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হন। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, এবং শুনিতে পান যে, যাঁহার ক্রোড়ে এই শিশু সংস্থাপিত হইলে, ইহার অতিরিক্ত হস্ত ও নেত্র তিরোহিত হইবে, তাঁহারই হস্তে ইহার মৃত্যু হইবে। কৃষ্ণের ক্রোড়ে এই শিশুকে অর্পণমাত্র অতিরিক্ত ভুজ ও নেত্র তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাতে কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা শিশুপালজননী তাঁহার নিকটে এই ভিক্ষা চান যে, তাঁহার পুত্রের অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৪৩ অ)।

শিশুপাল এতচ্ছ্রবণে সমরাভিলাষী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তিনি তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়া, শান্তভাবে রাজগণকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, এই সাত্বতীতনয় সাত্বতগণের নিতান্ত অহিতকারী। আমরা যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশে গমন করিয়াছিলাম, তখন এই দুরাত্মা আমাদিগকে অনুপস্থিত জানিয়া, দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল। রৈবতক পর্ব্বতে ভোজরাজ স্ত্রী ও রাজগণ সহ ক্রীড়ারত ছিলেন, সেই সময়েও তাঁহাদিগের অনেককে বধ, অনেককে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল। আমার পিতা অশ্বমেধের জন্য অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই পাপমতি তাঁহার যজ্ঞের বিঘ্নের জন্য সেই অশ্বকে হরণ করিয়াছিল। বভ্রুমহিষী সৌবীর দেশে গমন করিয়াছিলেন, এই দুরাত্মা তাঁহার সতীত্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। এই দুরাচার মায়াচ্ছন্ন হইয়া করূষাধিপতির জন্য ভদ্রাকে হরণ করিয়াছিল। আমি পিতৃষসার অনুরোধে ইহাকে বহুবার ক্ষমা করিয়াছি। রাজগণসমক্ষে এ যে প্রকার অবমাননাসূচক কথা কহিল, ইহাকে আজ আর আমি ক্ষমা করিতেছি না। এই মৃত্যুকাম দুরাচারের রুক্মিণীলাভের প্রার্থনা ছিল। এ কি প্রকারে রুক্মিণীকে লাভ করিবে? শূদ্র কি কখন বেদশ্রুতি লাভ করিয়া থাকে?

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, সকলে চেদিরাজ শিশুপালকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। শিশুপাল তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, আমার সহিত রুক্মিণীর সম্বন্ধ হইয়াছিল। রুক্মিণীর কথা এ সভায় বলিতে কি তোর কিছু লজ্জা হয় না? তুই বিনা এমন আর কে আছে, যে অন্যপূর্ব্বা মহিলার কথা সভাতে তুলিতে পারে! তুই আমায় ক্ষমা কর্‌লি বা না কর্‌লি, তুই প্রসন্ন হ'লি বা ক্রুদ্ধ হ'লি, তাতে আমার কি আসে যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চক্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক, রাজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহার মাতার অনুরোধে আমি এক শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, এখন আমি ইহাকে তোমাদের সমক্ষে বধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি চক্রনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কথিত আছে, শিশুপাল হইতে তেজ বিনিঃসৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইল। শিশুপালবধ-দর্শনে সমুপস্থিত রাজগণ অবাক্ হইয়া, কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। যাঁহাদিগের চিত্তে রোষের উদয় হইল, তাঁহাদিগকে রোষ সংযত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে

হইল। যজ্ঞসমাপনানন্তর শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের সম্ভাষণ করিয়া, দ্বারকায় গমন করিলেন।

সাম্ববধ

পাণ্ডুপুত্রগণের অভ্যুদয়দর্শনে দুর্য্যোধন একান্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল। দ্যূত-ক্রীড়াচ্ছলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সে পরাজিত করিয়া, অবশেষে তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন না, সাম্ব-নৃপতির সঙ্গে সংগ্রামার্থ গমন করিয়াছিলেন। সময়ে জয়লাভ করিয়া, দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের কি প্রকার দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং দেখিবার জন্য, যে বনে পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, তথায় আগমন করেন। তাঁহাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রোষপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারি দুরাত্মার শোণিত শীঘ্রই ভূমি পান করিবে। ইহাদিগকে অনুচর সহচর সহ বধ করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি। যাহারা ঈদৃশ অসদাচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধদর্শন করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তিসকল বর্ণন করিয়া, তাঁহার ক্রোধপ্রশমন করিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার-কথার উল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমান অবতারে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আপনাতে না আছে ক্রোধ, না আছে মাৎসর্য্য, না আছে মিথ্যা। আপনি যুগান্তে সমুদায়কে প্রতিসংহরণ করেন, আবার যুগাদিতে সমুদায় জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পার্থ এইরূপ নানা কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়া নিবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আমার, আমি তোমার, যাহারা আমার, তাহারা তোমার। যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাহারা আমাকে দ্বেষ করে; যাহারা তোমার অনুগত, তাহারা আমার অনুগত। তুমি নর, আমি নারায়ণ, যথাসময় আমরা ঋষি নরনারায়ণ ইহলোকে অবতরণ করিয়াছি। তুমি আমা হইতে ভিন্ন নও, তোমা হইতে আমি ভিন্ন নই। আমাদের দুইয়ের পার্থক্য কেহ বুঝিতে পারে না *।

---

* "মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু॥

দ্রুপদতনয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিয়া, দুঃখ অবগত করিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, আপনি যাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের পত্নীগণ স্বামীদিগকে শোণিতপরিপ্লুত হইয়া ধরাতলে শয়ান দেখিয়া রোদন করিবে। আপনি শোক করিবেন না, আমি নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আপনি রাজার রাণী হইবেন। হিমালয় যদি ভগ্ন হইয়া পড়ে, পৃথিবী যদি খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আমার এ কথা কখন মিথ্যা হইবে না। দ্রৌপদী এই কথা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি রোদন করিও না। বাসুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদি দ্বারকায় থাকিতাম, আপনাদের এরূপ দুর্দ্দশা কখনও হইত না। আমি দ্যূতক্রীড়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া, উহা হইতে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিতাম। আমি দ্বারকায় আসিয়া, আপনাদিগের বিপৎপাতের কথা শ্রবণ করিয়া, আর থাকিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ দ্বারকা ত্যাগ করিয়া, এই দেখিতে আসিতেছি।

যুধিষ্ঠির দ্বারকায় অনুপস্থিত থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজসূয়যজ্ঞে আমি শিশুপালকে হত করিয়াছি, এই কথা শ্রবণ করত, সৌভপতি সাল্ব ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, আমার অনুপস্থিতিসময়ে আসিয়া দ্বারকাবরোধ করে। আমার পুত্র চারুদেষ্ণ, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন ইহারা তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সাল্বনৃপতির মন্ত্রী ও সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত সাম্ব, এবং বিবিন্ধ্যাসহকারে চারুদেষ্ণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাদিগের দুই জনকে বধ করে। এতদ্দর্শনে সাল্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সাল্বের আক্রমণে সকলকে একান্ত ভীত দেখিয়া, প্রদ্যুম্ন সাহসদানপূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হয়। প্রদ্যুম্ন সহ ঘোরতর যুদ্ধে প্রথমতঃ সাল্ব শরাঘাতে

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যয়ম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥
অনন্যঃ পার্থ মত্তস্ত্বং ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ।
নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ॥"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২ অ. ৪৪—৪৬।

বিচেতন হইয়া পড়ে, তৎপর সাল্ব চেতনালাভ করিয়া প্রদ্যুম্নের জক্রদেশে শরাঘাত করে। ইহাতে প্রদ্যুম্ন হতচেতন হইলে, বৃষ্ণিগণমধ্যে মহা হাহাকার উপস্থিত হয় এবং সকলে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। সারথি রথ রণভূমি হইতে দ্রুতবেগে বাহিরে আনয়ন করে। প্রদ্যুম্ন চেতনালাভ করিয়া, সারথিকে তাহার ঈদৃশ অসদৃশ আচরণের জন্য অত্যন্ত ভৎর্সনা করিল এবং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রদ্যুম্ন সাল্বের মস্তকে, বক্ষে ও মুখে এমনই শরাঘাত করিল যে, সে মোহপ্রাপ্ত হইল। এতদবস্থায় তাহাকে বধ করিবার জন্য মহাস্ত্র ত্যাগ করিল; কিন্তু সাল্ব আমার বধ্য, এ জন্য নারদ আসিয়া নিবৃত্ত করাতে, সেই অস্ত্র মৎপুত্র প্রত্যাগার করিয়া লইল। সাল্বনৃপতি প্রদ্যুম্নশস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া, ভগ্নচিত্তে দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রাজসূয়যজ্ঞানন্তর দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, নগর একেবারে শ্রীশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্দর্শনে আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এতচ্ছ্রবণে সাল্ববধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আমি সৌভপুরে গমন করি। সেখানে সাল্ব ছিল না, সমুদ্রকূলে গমন করিয়াছিল। আমি সেখানে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করি, সেও ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হয়। সৌভপতি সাল্ব অতি মায়াবী, সে যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশগামী হইল। আমি দেখিতে পাইলাম, একজন দ্বারকাবাসী লোক আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, আপনি যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, ত্বরায় দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বারকা রক্ষা করুন, আপনার পিতা হত হইয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে আমি অতীব বিস্মিত ও শোকার্ত্ত হইলাম। বলদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন থাকিতে আমায় দ্বারকারক্ষার্থ যাইতে হইবে, এ কি কথা। এঁরা সকলে বাঁচিয়া থাকিতে, আমার পিতাই বা কি প্রকারে হত হইলেন? কিঞ্চিৎ মুগ্ধমনা হইয়া সাল্বসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, অমনি দেখিতে পাইলাম, আমার হত পিতাকে সাল্ব আমার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনু খসিয়া পড়িল, আমি একেবারে মোহপ্রাপ্ত হইলাম *। আমাকে এতদবস্থ দর্শন করিয়া সৈন্যমধ্যে

* ভাগবতে (১০ স্ক, ৭৭ অ, ১৭ শ্লোক) লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁহার পিতাকে আনয়ন করিয়া, খড়্গাঘাতে সাল্ব তাঁহার শিরশ্ছেদন করে। ভাগবতে এই ঘটনাতে কৃষ্ণের মোহপ্রাপ্তি এই বলিয়া নিরসন করিয়াছেন,—

হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। আমি দেখিতে লাগিলাম, আমার পিতা নিপতিত রহিয়াছেন এবং শূলপট্টিশধারী দৈত্যগণ তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তৎপর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখি যে, না সেখানে সাল্ব আছে, না আমার পিতা আছেন, কেহই সেখানে নাই।

তৎপর আমি পুনরায় সৌভপতিসহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম, দেখিতে দেখিতে মায়াবী সাল্ব অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই প্রকারে মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত সাল্ব পাষাণবর্ষণ করিয়া আমায় পর্ব্বতাবৃত করিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে সৈনিকগণ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। পরিশেষে আমায় সকলে অনুরোধ করিল, সাল্বসহকারে সাধারণ ভাবে সমর করিলে চলিবে না, শীঘ্র তাহাকে বধ করা হউক। এতচ্ছ্রবণে আমি তাহাকে সত্বর বধ করিবার জন্য সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলাম, সেই চক্রের আঘাতে সৌভযান দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তৎপর গদাঘাতে সাল্ব নৃপতিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম *। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সৌভপতি সাল্ববধের বৃত্তান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে জ্ঞাপনকরতঃ, সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ।
যৎ স্ববচো বিরুধ্যেত ন নূনং তে স্মরন্ত্যুত॥"

ভাগবত ১০ স্ক ৭৭ অ, ২০ শ্লোক।

যে সকল ঋষি এরূপ বলিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা স্মরণ করেন নাই। এরূপ বলাতে যে স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে, এবং ভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরচিত নয়, প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহা ভাগবতকার ভুলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের ব্যাস অপ্রবুদ্ধ, ভাগবতের ব্যাস প্রবুদ্ধ এ জন্য ব্যাস আপনাকে আপনি ভিন্ন ব্যক্তি করিয়া লইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত এ কালে পরিগৃহীত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। ফলতঃ ভাগবতের কলেবরবৃদ্ধি একবার নয়, সাতবার হইয়াছিল। এ সাতবারের বক্তা একজন নন, ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং এরূপ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ সর্ব্বশেষ বক্তার হওয়া কিছু অসম্ভব নহে।

* ভাগবতে (১০ স্ক, ৭৭অ, ২৩—২৪ শ্লোক) সাল্বকে চক্রযোগে ছেদন, সৌভযান গদাঘাতে চূর্ণ করা লিখিত হইয়াছে। ইহা মহাভারতের লেখার বিপরীত। মহাভারতে (বনপর্ব্ব, ২২অ, ৩৫—৩৭ শ্লোক) চক্রে সৌভযান দ্বিধাচ্ছেদন, এবং গদাঘাতে সাল্বকে দ্বিধাকরণ লিখিত আছে।

দন্তবক্র ও বিদূরথ-বধ

সাল্বনৃপতির বধানন্তর পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম হয়। কথার উদ্ঘাতে পৌণ্ড্রকনৃপতির বৃত্তান্ত ও তৎসহ সমর পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (৭২পৃঃ)। সাল্ব ও পৌণ্ড্রকের কৃষ্ণহস্তে মৃত্যু শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগের সখা দন্তবক্র গদা হস্তে লইয়া, হস্ত্যশ্বরথাদি যান অগ্রাহ্যপূর্ব্বক, পদাতিক হইয়া, কৃষ্ণকে আসিয়া আক্রমণ করে *। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মাতুলেয়, অথচ মিত্রদ্রোহী জানিয়া, সে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়। দন্তবক্র সবেগে তাঁহাকে গদাঘাত করিল, কিন্তু তিনি তাহাতে অক্ষুব্ধ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গদা দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহাতে তাহার বক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে রুধির উদ্বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এতদ্দর্শনে তাহার ভ্রাতা বিদূরথ শোকে আকুল হইয়া, অসি-চর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইল। সে সম্মুখে আসিবামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ চক্রযোগে তাহার মস্তক ছেদন

সৌভযানসম্বন্ধে আখ্যায়িকা এই, রুক্মিণীর বিবাহকালে শিশুপাল ও তৎসখা সাল্ব-জরাসন্ধপ্রভৃতি যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। সেই সময়ে সাল্ব নৃপতিগণসমক্ষে পৃথিবী যাদবশূন্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য, সাল্ব রুদ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কথিত আছে, রুদ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, লৌহময় চলিষ্ণু সৌভনামক যান তাহাকে অর্পণ করেন। এই যান সৌভপুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ (ভাগবত, ৭৬অ, ১—৪ শ্লোক)। বোধ হয়, পুরীতে যে সকল আয়োজন থাকে, এই যানে সে সকলই ছিল। এই যান মায়াময় বলিয়া খ্যাত, এতদ্যোগে সাল্ব অনায়াসে আত্মগোপন করিত।

* প্রথমতঃ জরাসন্ধ, তৎপর শিশুপাল, তদনন্তর সাল্ব ও পৌণ্ড্রকবধ, তাহার অব্যবহিত-কালমধ্যে দন্তবক্র ও তাহার ভ্রাতা বিদূরথের বধ ভাগবতের লেখানুসারে স্থির হয়।

"শিশুপালস্য সাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্ম্মতেঃ।
পরলোকগতানাঞ্চ কুর্ব্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥"

ভাগবত, ১০ স্ক, ৭৮ অ, ১ শ্লোক।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতাধিপতি বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে,—

"বঙ্গপুণ্ড্রকিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ লোকেঽভিবিশ্রুতঃ ॥"

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৪ অ, ২০ শ্লোক।

গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশী পুণ্ড্র, কিরাত বন্যজাতি।

করিয়া ফেলিলেন। শিশুপালের তেজ যেমন শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইবার কথা বর্ণিত আছে (ভাগবত, ১০স্ক, ৭৪অ, ২৭ শ্লোক), দন্তবক্রের তেজও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে আসিয়া প্রবিষ্ট হইবার কথা লিখিত আছে (১০স্ক, ৭৮অ, ৬ শ্লোক)। ইহার তাৎপর্য্যাবধারণ করা কিছু কঠিন নহে। শিশুপাল ও দন্তবক্র যদিও কৃষ্ণবিদ্বেষী, তথাপি তাহাদিগের সঙ্গে তাঁহার শোণিতসম্বন্ধ ছিল। এই শোণিতের মধ্যে তাঁহার তেজ প্রাকৃতিক নিয়মে অবস্থিত ছিল বলিয়াই, পৌরাণিকেরা তাঁহাতে সেই তেজের প্রবেশ বর্ণন করিয়াছেন।

প্রভাসে সাক্ষাৎকার

অর্জ্জুন শস্ত্রলাভার্থ তপস্যায় গমন করিলে, কাম্যবন আর পাণ্ডুতনয়গণের নিকটে প্রীতিকর রহিল না। তাই রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও অবশিষ্ট ভ্রাতাদিগকে লইয়া তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে, ধর্ম্মরাজ সপরিবার প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন। সেখানে তিনি পিতৃতর্পণ নির্ব্বাহ করিয়া, দ্বাদশ দিন জল-ও বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক চারি দিকে অগ্নি জ্বালিয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই কঠোর তপস্যাচরণের কথা শ্রবণ করিয়া, বলরাম ও কৃষ্ণ বৃষ্ণিগণসহকারে তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ ভূমিতে শয়ান আছেন, সমুদায় গাত্র ধূলিধূসরিত, দ্রৌপদীও তদবস্থ; এতদ্দর্শনে যাদবগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, কৃষ্ণপুত্র ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ ধর্ম্মরাজের বন্দনা করিলেন. পাণ্ডুতনয়গণও যথাযথ তাঁহাদিগের সম্ভাষণা ও সম্মাননা করিলেন। তাঁহারা সকলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে বলরাম তাঁহাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বনবাসক্লেশ এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যসম্ভোগ, এতদ্দর্শনে লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত অনাস্থা উপস্থিত হইবে। তাহারা মনে করিবে, ধর্ম্মাপেক্ষা অধর্ম্মেতেই লোকের সমৃদ্ধি হয়, অতএব ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ভীষ্ম প্রভৃতি কুলবৃদ্ধগণ পাণ্ডুতনয়গণকে বনে প্রেরণ করিয়া, কি প্রকারে সুখে আছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহাদিগের সকলকেই ধিক্। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, কি না অন্যায়াচরণই করিয়াছেন? এই বৃকোদর—ইহার সমান যোদ্ধা কে আছে? সমরে ইহার ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া, সৈন্যগণ শকৃন্মূত্রত্যাগ

করিয়া থাকে। এ কি না এখন ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে ক্ষীণশরীর হইয়াছে! এই বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজসূয়যজ্ঞকালে দিগ্দিগন্তরস্থ রাজগণকে পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিল, তাহাদিগের আজ এই অবস্থা। এই যাজ্ঞসেনী যজ্ঞে বেদীতল হইতে উত্থিতা হইয়াছেন, ইনি কি না আজ বনবাসের ক্লেশবহন করিতেছেন! যদি ধর্ম্মপুত্র ভার্য্যা-ও-ভ্রাতৃগণসহকারে এরূপ অবসাদপ্রাপ্ত হন, আর দুর্য্যোধন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তবে নিশ্চয় জানিলাম, পৃথিবী সগিরি অবসাদগ্রস্ত হইবে।

এতচ্ছ্রবণে সাত্যকি অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এখন দুঃখ করিবার সময় নয়, কার্য্য করিবার সময়। রাজা যুধিষ্ঠির কিছু অসহায় নন, তাঁহার রামকৃষ্ণপ্রদ্যুম্নাদি সহায় থাকিতে, কেন তিনি অবসাদগ্রস্ত হইবেন? আজই বৃষ্ণিসৈন্য সমরে বিনিঃসৃত হউক, এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বিনাশ করুক। আমি একাই সগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের বিনাশে সমর্থ। প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কুমারগণ কি না করিতে পারে? স্বয়ং কৃষ্ণ যখন চক্রধারণ করিবেন, তখন ত্রিলোকমধ্যে কি অসাধ্য থাকিবে? বৃষ্ণি-ভোজ-অন্ধক-প্রভৃতি সাত্বতসেনা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া, আপনাদের যশ চারি দিকে বিখ্যাত করুক। ধর্ম্মরাজ যত দিন দ্যূতক্রীড়াকালে কৃতপ্রতিজ্ঞাবশতঃ ব্রতধারী হইয়া অবস্থিতি করিবেন, তত দিন অভিমন্যু রাজ্যশাসন করুক। ব্রতান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যভোগে প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথিবীকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রশূন্য করাই আমাদের যশের কার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাত্যকি, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু তুমি কখন এ কথা মনে করিও না যে, ইঁহারা নিজ ভুজবলে পরাজিত না করিয়া, পৃথিবীভোগ করিবেন। জানিও, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন, নকুল সহদেব বা দ্রৌপদী কেহই ভয়-লোভ-বা-অভিলাষবশতঃ কখন স্বধর্ম্মত্যাগ করিবেন না। সমরে ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। ইঁহারা মাদ্রীতনয়দ্বয় সহ সমুদায় পৃথিবী শাসন করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সময়ে পাঞ্চালপতি-প্রভৃতি সহ আমরা সকলে মিলিত হইয়া, ইঁহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, তখন নিশ্চয় সমরে শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া সাদরে কহিলেন, কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা আর বিচিত্র কি? আমার পক্ষে

সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নহে। কৃষ্ণ আমায় জানেন, আমি কৃষ্ণকে জানি। যখন বিক্রমপ্রদর্শনের সময় আসিবে, তখন সকলে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিবেন। আমি তোমাদিগের সকলকে দর্শন করিয়া সুখী হইলাম, সকলে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়ত কাল অপ্রমত্তভাবে অবস্থিতি করুন। রাজা যুধিষ্ঠির সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন, এবং আপনি সপরিবার বিদর্ভদেশস্থ পয়োষ্ণী নদীর অভিমুখে গমন করিলেন।

দ্রৌপদী ও সত্যভামা

রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিয়া, পুনরায় যখন কাম্যবনে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসহকারে পাণ্ডুতনয় ও কৃষ্ণাকে দেখিবার জন্য সমাগত হন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের চরণ-বন্দনা করেন, অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করেন, এবং দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাক্য বলেন। সত্যভামা কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আপনার নিকটে রাজ্যাপেক্ষা ধর্ম্ম সমাদৃত। আপনি সত্য-তপস্যা-ঋজুতায় ধর্ম্মাচরণ করিয়া, ইহলোক পরলোক উভয়ই আত্মবশে আনয়ন করিয়াছেন, আপনার গ্রাম্যসুখসম্ভোগে আসক্তি নাই, আপনি অর্থলোভে কখন ধর্ম্মপরিহার করেন না, আপনি ধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্মরাজ-নামে খ্যাত হইয়াছেন। কুরুসভায় কৃষ্ণা যেরূপ অবমানিতা হইয়াছিলেন, আপনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন। ইহা নিশ্চয় কথা যে, আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া গেলে, আপনি পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া প্রজাপালন করিবেন। পুরোহিত-ধৌম্য-ও-ভীমসেন প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত সম্ভাষণ, শস্ত্রলাভে কৃতার্থ অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া, কৃষ্ণাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি এখন সর্ব্বসম্পন্না। ধনঞ্জয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, আপনার পুত্রেরাও ধনুর্ব্বিদ্যায় অত্যন্ত সুশিক্ষিত হইয়াছে। আপনার পুত্রগণ অতি সুশীল, তাহারা দ্বারকায় এমন আনন্দে বাস করিতেছে যে, আপনার পিতা দ্রুপদ ও ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন সমাদর করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেও, তাহারা তথায় যাইতে চাহে না। অভিমন্যু শস্ত্রবিদ্যায় অতীব সুনিপুণ হইয়াছে, সে আপনার ভাই-দিগকে সর্ব্বদা আদরের সহিত শস্ত্রশিক্ষা দিয়া থাকে। অভিমন্যু ও আপনার পুত্রগণকে অস্ত্রশিক্ষা দান করিয়া, রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। সে

যেমন অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুকে শিক্ষা দিয়া থাকে, তেমনি আপনার পুত্রগণকে শিক্ষা দেয়। যখন আপনার পুত্রেরা কোথাও যায়, তখন হস্ত্যশ্বরথ তাহাদিগের অনুগমন করিয়া থাকে। আপনি এবং কুন্তীদেবী যে প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন, সুভদ্রা আপনার পুত্রগণের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, কুকুর-অন্ধক-দশার্হ-বংশীয় যোদ্ধগণ আপনার নিদেশবর্ত্তী, তাহাদিগকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহারা সেইরূপ করিবে। আপনি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করুন, যেখানে ইচ্ছা অবস্থিতি করুন। যাদবযোদ্ধগণ আপনার শত্রুগণকে বধ করুক, আপনি ব্রতান্তে স্বাধিকারে গমন করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি পাণ্ডবগণের আশ্রয়, তুমি পাণ্ডবগণের গতি ; যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, তখন নিঃসংশয় তুমিই এ সকল করিবে। আমরা প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস করিয়া এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, তোমারই আশ্রয়ে থাকিব। সত্যে অবস্থান করিয়া, আমাদিগের বুদ্ধি নিরন্তর তোমারই সেবা করুক। আমাদের দান ধর্ম্ম, স্ত্রী পরিজন, স্বজনবর্গ এবং আমরা সকলে তোমারই আশ্রিত।

এ দিকে দ্রৌপদী ও সত্যভামা বহুদিনান্তে উভয়ে উভয়কে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীতা হইলেন, এবং পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্রৌপদী, তুমি পঞ্চ পাণ্ডুতনয় সহ কি প্রকার আচরণ করিয়া থাক ? ইঁহারা সকলেই লোকপালসদৃশ মহাবীর, ইঁহাদিগকে বশে রাখা কিছু সামান্য কথা নহে। দেখিতে পাই, ইঁহারা সকলে তোমার একান্তবশবর্ত্তী ; তুমি এমন কি ব্রতাচরণ করিয়াছ বা তপস্যা করিয়াছ বা জপ-হোম-মন্ত্র-ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াছ, যাহাতে তুমি স্বামিগণকে এরূপ বশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছ। এতচ্ছ্রবণে দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, আপনার এ প্রশ্ন কৃষ্ণের পত্নীর সদৃশ হইল না। মন্ত্র-ঔষধাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কোথায় স্বামী বশে রাখিতে পারা যায় ? যাই স্বামী জানিতে পান যে, পত্নী মন্ত্র-ঔষধাদি উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বশে রাখিতে যত্ন করিতেছে, অমনি তাঁহার মনে একান্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয় ; কালসর্পসহকারে গৃহে বাস যে প্রকার, পত্নী সহ গৃহবাসে তেমনি তাঁহার মন নিরন্তর অশান্তি অনুভব করে। কখনও

মন্ত্রক্রিয়া দ্বারা ভর্ত্তা বশবর্ত্তী হন না। যে স্ত্রী ভর্ত্তাকে বশ করিবার জন্য ঔষধ-প্রয়োগ করে, সে একটি সর্ব্বনাশের দ্বার খুলিয়া দেয়। শত্রুরা বশীকরণ ঔষধচ্ছলে এমন ভয়ানক বিষচূর্ণ প্রেরণ করে, যাহা রসনায় সংযোগমাত্র মৃত্যু হয়, অথবা অনেক সময়ে জলোদর-কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হয়। যাহারা স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রৌষধাদি উপায় অবলম্বন করে, তাহারা অত্যন্ত পাপাচারিণী। কোন স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় যে, কখন স্বামীর প্রতি ঈদৃশ বিপ্রিয়াচরণ করে। আমি পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়া থাকি, শ্রবণ করুন। অহঙ্কারকামক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, আমি সপত্নীক পাণ্ডবগণের নিয়ত সেবা করিয়া থাকি। আমি তাঁহাদিগের প্রীতিলাভ করিয়া, তাহাতে অভিমানিনী হই না; আপনাকে আত্মবশে রাখিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের চিত্তে সুখ হয়, সেইরূপ আচরণ করি। কি জানি বা কখন কোন কথা বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে ক্লেশ দি, কখন বা তাঁহাদিগকে কুদৃষ্টিতে অবলোকন করি, কখন বা এমন স্থানে গমন করি বা অবস্থিতি করি, যাহা তাঁহারা ভালবাসেন না, এ সকল বিষয়ে আমি সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত থাকি। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন, গন্ধর্ব্বই হউন, যুবাই হউন, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃতই হউন, সম্পন্নই হউন বা সুন্দরই হউন, স্বামিভিন্ন আর কাহাকেও আমি পুরুষমধ্যে গণ্য করি না। ইঁহারা ভোজন না করিলে আমি ভোজন করি না, ইঁহারা স্নান না করিলে আমি স্নান করি না, ইঁহারা উপবেশন না করিলে আমি উপবেশন করি না। ইঁহারা যে স্থান হইতে কেন গৃহে আগমন করুন না, আমি অমনি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে আসন ও জল দিয়া সম্ভাষণ করি। আমি গৃহ ও গৃহসামগ্রী সকল সর্ব্বদা অতি পরিষ্কৃত রাখি, এবং ভাণ্ডারের ধান্যাদি অতিযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি। যাহারা অসৎ স্ত্রী, আমি কখন তাহাদিগের সংসর্গ করি না; যদি কখন সংসর্গ করিতে হয়, তবে তাহাদের আচরণে ধিক্কার না দিয়া, তাহাদিগের সঙ্গ করি না। আমি সর্ব্বদা অনলস থাকিয়া, স্বামিগণের অনুকূলাচরণ করিয়া থাকি। যখন অন্তঃপুরে অবস্থান করি, তখনও স্বামী সহ আমোদ বিনা হাসি না, পুনঃ পুনঃ দ্বারে গমন করি না, আবর্জ্জনাস্থানে অধিকক্ষণ দাঁড়াই না। অতিহাস্য, অতিরোষ এবং যে সকল বিষয়ে ক্রোধের সম্ভাবনা, তাহা পরিষ্কার করি, এবং আর সকল ছাড়িয়া

ভর্তৃসেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকি। স্বামী ছাড়া আর কিছু আমার অভিলাষের বিষয় নাই। তাঁহারা যখন প্রবাসে থাকেন, তখন আমি ব্রতচারিণী হইয়া অবস্থান করি। তাঁহারা যাহা পান ভোজন করেন না, আমি তাহা পান ভোজন করি না; তাঁহারা যেরূপ উপদেশদান করেন, আমি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। আমি গৃহধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশলাভ করিয়াছি, সেগুলি কখন লঙ্ঘন করি না। আমি কথায়, ব্যবহারে, পানভোজনে বা ভূষণাদিতে স্বামিগণকে অতিক্রম করি না, এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করি। গুরুজনের নিন্দা কখন আমার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয় না। আমি সাবহিত থাকিয়া গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তাই ভর্তৃগণ আমার বশবর্ত্তী। আমি পানভোজনাদি দিয়া আর্য্যা কুন্তীর সেবা করিয়া থাকি, আমি কখন অশনবসনভূষণে তাঁহাকে অতিক্রম করি না, অথবা তাঁহার নিন্দাসূচক কোন কথা উচ্চারণ করি না। আট হাজার ব্রাহ্মণ, আশি হাজার স্নাতক গৃহস্থ, যাঁহাদিগের এক এক জনের ত্রিশ জন দাসী, ইঁহাদিগকে এবং ইহা ছাড়া আর দশ হাজার ব্যক্তিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিত্য অন্নদান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণকে আমি নিত্য অশনবসনভোজন দিয়া অর্চ্চনা করি। যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যপালন করিতেছিলেন, সে সময়ে পাণ্ডুপুত্রগণের সহস্র সহস্র নৃত্যগীতবিশারদ সুন্দরালঙ্কারভূষিত দাসদাসী ছিল। তাহাদিগের কাহার কি কাজ, কাহার কি নাম, কাহার কিরূপ আকার, কাহার কিরূপ পান ভোজন বসন, এ সকল আমি জানি। এমন কি, অন্তঃপুরচারী যতগুলি ভৃত্য আছে, গোপাল মেষপাল পর্য্যন্ত সকলে কে কি করে, কে কি করে না, আমার সকলই জানা আছে। পাণ্ডুতনয়গণের কি আয়, কি ব্যয়, আমি একা সকলই জানি। পাণ্ডবগণ আত্মীয়স্বজনের সমুদায় ভার আমার উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, আমি রাত্রিদিন সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ দিবারাত্রি পাণ্ডবগণের সাহায্যে নিযুক্তা থাকিয়া, তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসার সময়ে সেবা করা আমার কাজ; এইরূপ সেবায় রাত্রিদিন কোথা দিয়া যায়, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি নিদ্রা হইতে প্রথমে উঠি, সকলের শেষে শয়ন করি, চির কাল এইরূপ করিয়া আসিতেছি। আমি এ সম্বন্ধে যাহা জানি, তোমায় বলিলাম। আমি ভর্তৃবন্দনা জানি, আর কিছু জানি না।

অসৎ স্ত্রীগণের আচরণের কথন অনুবর্ত্তন করি না, সেরূপ করিতে অভিলাষও নাই।

সত্যভামা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সখীত্বজন্য আমি উপহাস করিয়া যাহা তোমায় বলিয়াছিলাম, ক্ষমা কর। দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, ভর্ত্তার চিত্তহরণের জন্য যে উপায় আমি জানি, তোমায় বলিলাম। আমি জানি, ভর্ত্তার তুল্য ইহলোকে স্ত্রীর আর কিছুই নাই। তুমি নিরন্তর সৌহৃদ্য, প্রেম ও পানভোজনাদি দিয়া স্বামীর সেবা কর। তিনি যেন বুঝিতে পারেন, তোমার তিনি অতীব প্রিয়। দ্বারে তাঁহার স্বরশ্রবণমাত্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া, গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিও; যেমন আসিবেন, অমনি আসন ও পাদপ্রক্ষালন-জল দিও। দাসী থাকিতেও তাঁহার কাজ আপনি করিও। তুমি যে সমগ্রহৃদয়ে কৃষ্ণের সেবা কর, ইহা যেন তিনি জানিতে পান। তোমার নিকটে তিনি যে কোন কথা বলিবেন, গোপনীয় না হইলেও, তাহা অন্য কাহাকেও বলিবে না। কেন না তোমার সেই কথা শুনিয়া, কোন সপত্নী তাঁহাকে কিছু বলিলে, তাঁহার তোমার প্রতি বিরাগ জন্মিবে। যাহারা তোমার স্বামীর আত্মীয়, অনুরক্ত, প্রিয় ও হিতকারী, তাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়ে পানভোজন দিও; যাহারা অহিতকারী অমিত্র, এবং কপট ব্যবহারে উদ্যত, তাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিও না। অপর পুরুষগণের সঙ্গে আমোদিত হইও না, সর্ব্বদা সংযতমনা এবং মৌনাবলম্বিনী থাকিও। স্বামী যখন সঙ্গে নাই, তখন প্রদ্যুম্ন সাম্ব কুমারেরও সেবা করিও না। যে সকল কুলস্ত্রী সতী সাধ্বী পাপশূন্যা, তাহাদিগের সহিত তোমার সখ্য হউক; যাহারা উগ্রস্বভাবা, মদমত্তা, অতিভোজনবতী, চৌর্য্যানিরতা, দুষ্টা ও চপলস্বভাবা, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে সর্ব্বদা ভর্ত্তার সেবা কর, ইহাই আমার বলিবার বিষয়।

কৃষ্ণ ও সত্যভামা পাণ্ডুতনয় ও কৃষ্ণাকে সম্ভাষণ করিয়া, দ্বারকায় যাইবার জন্য রথারোহণ করিলেন। যাইবার সময় সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণে, উৎকণ্ঠিতা হইও না, মনে ক্লেশানুভব করিও না, আবার ভর্তৃগণ পৃথিবীজয় করিবেন, তুমি উহার অধিকারিণী হইবে। তোমার মত শীলসম্পন্না, অর্চ্চনাযোগ্যলক্ষণযুক্তা নারীগণ কখন চিরদিন ক্লেশ পান না।

তোমার বনগমনকালে যে সকল নারী গর্ব্বিতচিত্তে তোমায় উপহাস করিয়াছে, তাহারা শীঘ্রই হতসঙ্কল্পা হইবে। তোমার দুঃখ উপস্থিত দেখিয়া, যাহারা অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে, জানিও, তাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে। তোমার পুত্রগণের জন্য কোন চিন্তা করিও না, তাহারা সকলে অতি আদরে দ্বারকায় অবস্থিতি করিতেছে।

দুর্ব্বাসা-সংবাদ

একদা দুর্ব্বাসা ঋষি দুর্য্যোধনগৃহে গমন করেন। দুর্য্যোধন অতি যত্নে কয়েক দিন তাঁহার সেবা করিয়া, এই বর গ্রহণ করে যে, পাণ্ডুতনয় ও কৃষ্ণার ভোজন পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি সশিষ্য গমন করিয়া, তাঁহাদিগের আতিথ্যস্বীকার করিবেন। দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে কৃষ্ণার ভোজন শেষ হইলে, সশিষ্য গিয়া উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহকারে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আপনি শীঘ্র আহ্নিক সমাপন করিয়া আগমন করুন। তিনি স্নান করিতে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইহারা আমাদিগের এতগুলিকে কি প্রকারে ভোজন করাইবে। সশিষ্য দুর্ব্বাসা স্নানার্থ গমন করিলে, দ্রৌপদী আহারের কি উপায় করিবেন ভাবিয়া, একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন নিতান্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বারকায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাকে বিপদাপন্ন জানিতে পাইয়া, পার্শ্বস্থা রুক্মিণীকে শয্যায় পরিত্যাগকরত, দ্রৌপদীর নিকটে আগমন করিলেন। আসিয়াই বলিলেন, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়াছি, আমায় শীঘ্র আহার করাও। দ্রৌপদী তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন, এবং বলিলেন, আমি যত ক্ষণ ভোজন না করি, তত ক্ষণ সূর্য্যপ্রদত্ত স্থালীতে *

* মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহ বনে চলিলেন, তখন অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজের দরিদ্রতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে যত্ন পান; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হন না। যুধিষ্ঠির সঙ্কটাপন্ন হইয়া, পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশানুসারে সূর্য্যের আরাধনা করেন। সূর্য্য পরিতুষ্ট হইয়া, একটি তাম্রপিঠর (হাঁড়ি) অর্পণ করিয়া বলেন, যে পর্য্যন্ত দ্রৌপদী এই পাত্র হইতে পরিবেশন করিবেন, ফল, মূল, আমিষ, শাক অপর্য্যাপ্ত হইবে কিছুতেই ক্ষয় পাইবে না। দ্রৌপদী ভোজন করিলে আর অন্ন থাকিবে না। (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩ অ, ৭৩—৭৪ শ্লোক)

অন্ন থাকে, এখনত স্থালীতে কিছুই নাই। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এখন উপহাস করিবার সময় নয়। শীঘ্র স্থালী আনয়ন কর, আমি স্বয়ং স্থালী দর্শন করিব। কৃষ্ণা কি করেন, স্থালী তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন। দেখিলেন, স্থালীর কণ্ঠে শাকান্ন লগ্ন আছে। যজ্ঞভোক্তা বিশ্বাত্মা দেব প্রীত হউন, তুষ্ট হউন, এই বলিয়া সেই শাকান্ন ভোজন করিলেন। ভোজন করিয়া বলিলেন, ভোজনার্থী মুনিগণকে শীঘ্র আনয়ন করা হউক। এদিকে মুনিগণ জলে অবতরণ করিয়া অঘমর্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে অন্নের উদ্গার উঠিল এবং সকলের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়া গেল। জল হইতে উত্থান করিয়া, মুনিগণ পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। আমাদিগের জন্য অন্নপাক করিতে বলিয়া আসিলাম, এ দিকে আমরা অন্নে আকণ্ঠপরিতৃপ্ত। আমরা বৃথা পাক করাইলাম, এখন কি কর্ত্তব্য। দুর্ব্বাসা পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি অপরাধাচরণ করিলেন, ইহাতে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। পূর্ব্বে এক বার ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষনৃপতির প্রতি অন্যায় ক্রোধ করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। দুর্ব্বাসার পরামর্শে মুনিগণ, যিনি যে দিকে পারিলেন, পলায়ন করিলেন। ভীমসেন তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে গিয়া দেখেন, নদীতীরে একটি মুনিও নাই। পাণ্ডবগণ এ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদিগকে অপরাধী করিবার জন্য হয়তো নিশীথসময়ে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ভীত দেখিয়া বলিলেন, ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ভীতা দ্রৌপদী আমায় স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা ধর্ম্মনিরত, তাঁহাদিগকে কিছুতেই অবসাদগ্রস্ত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডবগণ সুস্থচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

অভিমন্যুপরিণয়

পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বর্ষ বনে বাস পরিসমাপ্ত হইলে, অজ্ঞাতবাসের সময় সমাগত হইল। এই সময়ে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রুপদতনয়া ছদ্মবেশে বিরাটগৃহে অবস্থিতি করেন। ভীষ্মদ্রোণাদি সকলকে সঙ্গে লইয়া দুর্য্যোধন বিরাটনৃপতির

গোধন হরণ করে ; কিন্তু ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুনের হস্তে পরাভূত হইয়া, তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। যখন বিরাটনৃপতি পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয়লাভ করিলেন, তখন তিনি আপন দুহিতা উত্তরাকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অর্জ্জুন এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি নিরন্তর আপনার অন্তঃপুরে বাস করিতাম। আপনার কন্যা আমাকে পিতৃভাবে দেখিত ; সুতরাং কি গোপনে, কি নির্জ্জনে, আমার সহিত ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিত না। আমি তাহাকে নৃত্য গীত শিখাইয়াছি, এ জন্য সে আমায় আচার্য্য বলিয়া ভালবাসিত। উত্তরা বয়ঃপ্রাপ্তা, আমি সংবৎসর কাল তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছি ; এখন যদি আমি তাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আপনার প্রজাগণের মনে অনুচিত আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। আমি শুদ্ধমনা হইয়া, তাহার সঙ্গে এত কাল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, এবং তাহাকেও একান্ত শুদ্ধিমতী বলিয়া জানিয়াছি। আমি যখন কন্যাদৃষ্টিতে দেখিয়াছি, এখন যদি সে আমার পুত্রবধূ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যাসম্বন্ধ স্থিরতর থাকিয়া যাইবে। অতএব আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। আমার পুত্র অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভাগিনেয়, বালক হইলেও অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ। সে আপনার জামাতা এবং কন্যার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত। বিরাটনৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর দিলেন, আপনি অতি জ্ঞানবান্ ও ধার্ম্মিক, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আপনার উপযুক্ত। আপনি যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, তাহাই করুন, আপনার সহিত সম্বন্ধানবন্ধনে আমার সমুদায় কামনার পরিপূর্ত্তি হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রগণের নিকট যুধিষ্ঠির ও বিরাটনৃপতি সংবাদপ্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কাশীরাজ ও দ্রুপদ প্রভৃতি নরপালগণ উপস্থিত হইলেন। আপনার পুত্রের জন্য প্রথমতঃ অর্জ্জুন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির উত্তরাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া, পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিলেন। অভিমন্যু বিবাহে বিপুল দান প্রাপ্ত হইলেন, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে গো-রত্ন-বস্ত্রাদি দান করিলেন। বিরাটনগর বিবাহোৎসবে আমোদ আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল।

উপস্থিত রাজগণের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

বিবাহের পরদিন দ্রুপদাদি রাজগণ বিরাটসভায় উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা সকলেই জানেন, সুবলপুত্র শকুনি কি প্রকার অক্ষক্রীড়ায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্বহরণ করিয়া ইঁহাকে বনে পাঠাইয়াছিল। ইঁহারা অনায়াসে পৃথিবী জয় করিয়া অধিকার করিতে পারেন; কিন্তু সত্যের অনুসরণ করিয়া, কঠোর ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক, ত্রয়োদশ বর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষের শেষ বর্ষ কি প্রকার ক্লেশে ইঁহাদিগকে যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা আপনাদিগের কাহারও অবিদিত নাই। যাহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন উভয়ের হিত হয়, এ প্রকার উপায় আপনারা চিন্তা করুন। এই উপায় ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। অধর্ম্মোপায়ে যদি সমুদায় দেবগণের রাজ্যও লাভ করা যায়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কখন তাহাতে অভিলাষ করিবেন না। যদি কোন একখানি গ্রামেও ধর্ম্মার্থযুক্ত আধিপত্যলাভ করেন, ইনি তাহাই পাইতে অভিলাষ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যেরূপ করিয়া ইঁহার পিতৃরাজ্যাপহরণ করিয়াছে, নৃপগণ তাহা সকলই জানেন। তাহারা কিছু স্বতেজে রণে পরাজয়পূর্ব্বক সমুদয় জয় করিয়া লয় নাই, মিথ্যা উপায়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহৎ কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছে। তথাপি ইনি আপনার সুহৃদ্বর্গ সহ তাহাদিগের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। পাণ্ডুপুত্রেরা স্বয়ং রাজগণকে পরাজিত করিয়া, যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছেন, ইঁহারা তাহাই চাহিতেছেন। ইঁহারা যখন বালক ছিলেন, রাজ্যহরণ করিবার অভিপ্রায়ে, ইঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য, তাহারা কত অসদুপায়াবলম্বন করিয়াছিল, আপনারা তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাদিগের কত দূর লোভ বাড়িয়াছে, সেটি দেখিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞতা ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করিয়া, আপনারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ এবং মিলিতভাবে অভিমত প্রকাশ করুন। ইঁহারা নিয়ত সত্যে রত; যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন। যদি তাহারা সত্যপালন না করে, তবে তাহাদিগের বধ ভিন্ন আর কি উপায় আছে? যদিও বহুসুহৃদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহারা ইঁহাদিগকে আক্রমণ করে, তথাপি ইঁহারা যে অল্পসংখ্যক বলিয়া জয়লাভ করিবেন না, ইহা কখন আমার মনে

হয় না। ইঁহাদিগের বন্ধুবর্গ সকলে মিলিত হইয়া যে তাহাদিগের বিনাশের জন্য যত্ন করিবেন না, তাহাও নহে। দুর্য্যোধন কি করিবে, আমরা ঠিক তাহা জানি না। যখন বিরোধীর মত জানা নাই, তখন কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আপনাদিগের মত চাই। এ বিষয়ে আমার মত এই যে, এখান হইতে এমন এক জন ধর্ম্মশীল বিশুদ্ধচরিত্র অপ্রমত্ত দূত প্রেরিত হউক, যে গিয়া এরূপ করিয়া আসিতে পারে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া দুর্য্যোধন শান্তিসংস্থাপন করে।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া বলদেব বলিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধনের যাহাতে হিত হয়, এরূপ কথা মহীপালগণ শ্রবণ করিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলে, আমরা সকলেই সুখী হইব, কেন না ইহাতে শান্তিরক্ষা পাইবে। তবে আমার মত এই যে, রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ হইয়াও, যখন দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তখন ইহাতে শকুনির কোন অপরাধ নাই, ইঁহারই অপরাধ। সুতরাং ইঁহারা বিনীতভাবে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করুন। কৌরবগণের মধ্যে যুদ্ধ না হয়, ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয়। এতচ্ছ্রবণে সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, আপনি যেমন, তেমনি কথা বলিলেন। আপনি বলিলেন বলিয়া আমার অসূয়া উপস্থিত হইল, তাহা নহে; আপনার কথা শুনিয়া অপরে সেইরূপ বিশ্বাস করিবে, এই জন্য আমার অসূয়া উপস্থিত। আপনি সভামধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অপরাধ কি প্রকারে নির্ভয়ে নির্দ্ধারণ করিলেন? রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াসক্ত নহেন, দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান কি কখন ধর্ম্মসঙ্গত? তিনি যদি স্বগৃহে দ্যূতক্রীড়ায় নিরত থাকিতেন, সেখানে গিয়া কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিত, তাহা হইলে ন্যায়তঃ তিনি পরাজিত হইতেন। তাঁহাকে যখন অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন তিনি ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুরোধে, অনভিজ্ঞ হইয়াও, অক্ষক্রীড়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই। যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় নিয়োগ করিল, তাহাদিগের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে? ইঁহাদিগের বনবাস পণ ছিল, সে পণ হইতে ইঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এখন কেন পিতামহের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না? যদি তাহারা ধর্ম্মতঃ রাজ্য না দেয়, আমি

বলিতেছি, আমি তীক্ষ্ণশরদ্বারা তাহাদিগকে বিনত করিয়া, মহাত্মা কুন্তীপুত্রের পদে প্রণিপাত করাইব। যদি তাহারা প্রণত না হয়, অমাত্যবর্গ সহ যমসদনে গমন করিবে। যাহারা আততায়ী শত্রু, তাহাদিগকে বধ করাতে কিছু অধর্ম্ম নাই; যদি প্রণত হইয়া তাহাদিগের নিকট যাচ্ঞা করা হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও অযশ দুইই হইবে। আজ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করুন, অন্যথা আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, তাহারা সকলে ধরাতলে শয়ান হউক।

রাজা দ্রুপদ বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হইবে। দুর্য্যোধন কখন মধুর ব্যবহারে রাজ্য দিবে না। সুতবাৎসল্যবশতঃ ধৃতরাষ্ট্র, কার্পণ্যবশতঃ ভীষ্ম দ্রোণ, মূর্খতাবশতঃ কর্ণ ও শকুনি তাহারই অনুসরণ করিবে। বলদেব যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকটে যুক্ত বোধ হয় না। যাঁহারা নীতিপরায়ণ, তাঁহাদিগের নিকটে বিনীতভাব-প্রদর্শনে ফল হয়, পাপবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের নিকটে মৃদুবাক্য বলাতে কোন লাভ নাই, সে কখন মৃদুব্যবহারে অনুকূল হইবার নহে। তাহার সহিত মৃদু ব্যবহার করিলে, সে মনে করিবে যে, ইহাদের শক্তি নাই, তাই এরূপ ব্যবহার করিতেছে। আমার মত এই যে, মিত্র নৃপতিগণের নিকট দূতপ্রেরণ করিয়া সৈন্যসংগ্রহ করা হউক, অন্যথা দুর্য্যোধন অবসর পাইয়া, অগ্রে আমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ পক্ষ করিয়া লইবে। রাজগণের নিকটে দূত প্রেরিত হউক *, এ দিকে আমার সুবিজ্ঞ

---

* দ্রুপদনৃপতি যে সকল রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে বলেন, তাহার মধ্যে দন্তবক্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

"দুর্জ্জয়ো দন্তবক্রশ্চ রুক্মী চ জনমেজয়ঃ ।"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩ অ, ১৬ শ্লোক।

ইহাতে ভাগবতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও সাল্ববধের অব্যবহিত পরে দন্তবক্রবধ যে লিখিত আছে, তাহা অপ্রতিপন্ন হয়। এ দন্তবক্র ভাগবতোক্ত দন্তবক্র, কি অপর আর এক জন তন্নামা কেহ ছিলেন, ইহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে দন্তবক্রকে বধ করেন, সে দন্তবক্র করূষাধিপতি। দন্তবক্র নিহত হইয়াছে বলিয়াই, স্বতন্ত্র করূষাধিপতি রাজগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

"কারূষকাশ্চ রাজানঃ ক্ষেমধূর্ত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ।" ঐ ১৮ শ্লোক।

দ্রুপদোক্ত দন্তবক্র করূষাধিপতি নন, এ অনুমান অযুক্ত নহে। করূষাধিপতি দন্তবক্রের কৃষ্ণহস্তে মৃত্যু ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বে বিদুর কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে বক্তব্য বিষয় বলিয়া প্রেরণ করা যাউক। দুর্য্যোধনকে কি বলিতে হইবে, ভীষ্মকে কি বলিতে হইবে, ধৃতরাষ্ট্রকে কি বলিতে হইবে, দ্রোণকে কি বলিতে হইবে, ইঁহাকে বলিয়া দেওয়া হউক।

দ্রুপদরাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, ইহাতে পাণ্ডবগণের অবশ্য প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইবে। ইনি যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন, তাহার অনুষ্ঠান না করিলে, আমাদিগের রাজনীতির অনুসরণ করা হইবে না, বরং বিপরীতাচরণ করাতে মূর্খতাই প্রকাশ পাইবে। তবে কুরুপাণ্ডু উভয়ের সহিতই আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ। আমরা এখানে সকলে বিবাহোপলক্ষে আসিয়াছি, শীঘ্রই স্ব স্ব স্থানে গমন করিব। পঞ্চালাধিপতি, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে রাজগণের মধ্যে বৃদ্ধতম। আমরা সকলে আপনার শিষ্যের মত। ধৃতরাষ্ট্র আপনার সম্মান করিয়া থাকেন, আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ আপনার সখা। যে কথা বলিয়া পাঠাইলে, পাণ্ডবগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, আপনি সেই কথা বলিয়া পাঠান। আপনি যাহা বলিয়া পাঠাইবেন, আমাদের সকলের তাহা অনুমত হইবে। যদি ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়ানুসরণ করিয়া, শান্তিস্থাপন

"অম্বরাজশ্চ নিহতঃ কংসশ্চারিষ্টমাচরন্।
জরাসন্ধশ্চ বক্রশ্চ শিশুপালশ্চ বীর্য্যবান্॥"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১২৯ অ, ৪৭ শ্লোক।

৬৯ পৃষ্ঠায় রুক্মিবধবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপর আলোচনা না করিয়া, প্রথম বারে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হওয়াতে, রুক্মিবধের সময়নির্ণয়ে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রুক্মিবধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়। অধ্যায়বিভাগের অনুরোধে, বৃত্তান্তটি যে স্থলে সংগৃহীত হইয়াছিল, সেখানেই থাকিল বটে, কিন্তু কালসম্বন্ধে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ঐ ঘটনা হয়, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। রুক্মী যোদ্ধৃত্বের অভিমানপ্রদর্শন করাতে, পাণ্ডব ও দুর্য্যোধন উভয় কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

"বিনিবর্ত্ত্য ততো রুক্মী সেনাং সাগরসন্নিভাম্।
দুর্য্যোধনমুপাগচ্ছত্তথৈব ভরতর্ষভ॥
তথৈব চাভিগম্যৈনমুবাচ বসুধাধিপঃ।
প্রত্যাখ্যাতশ্চ তেনাপি স তদা শূরমানিনা॥"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৫৭ অ, ৩৬—৩৮ শ্লোক।

করেন, ভ্রাতৃবিরোধ জন্য কুলক্ষয় হইবে না। যদি মোহ-ও-দর্পবশতঃ দুর্য্যোধন শান্তির পথানুসরণ না করে, তবে আর আর রাজগণের নিকট দূতপ্রেরণ করিয়া, পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে, দুর্য্যোধন সবান্ধব সহামাত্য বিনষ্ট হইবে।

সারথ্যস্বীকার

বিরাটনৃপতি সমুদায় রাজন্যবর্গকে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক, স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন, এ দিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। দ্রুপদ আপনার পুরোহিতকে দূত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। পুরোহিতপ্রেরণানন্তর নৃপতিগণের নিকট দূত প্রেরিত হইল। স্বয়ং অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিলেন। পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন, গুপ্তচর দ্বারা দুর্য্যোধন অবগত হইয়া, সেও দ্বারকায় গমন করিল। অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত। তাঁহারা যে সময়ে উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত ছিলেন। দুর্য্যোধন প্রবেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শিরের দিকে উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করিল। তাহার প্রবেশের পর অর্জ্জুন গিয়া চরণের দিকে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি জাগ্রৎ হইয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর উভয়কে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধন হাসিয়া বলিল, উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হইতে হইতেছে। আপনার অর্জ্জুনের প্রতি যেমন, আমার প্রতিও তেমনি সখ্য ; আপনার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধও তুল্য। তবে আমি অগ্রে আসিয়াছি। যিনি অগ্রে আগমন করেন, সজ্জনগণ তাঁহাকে অগ্রে স্বীকার করিয়া থাকেন। আপনি সজ্জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যে সদাচার আছে, তাহা প্রতিপালন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি যে পূর্ব্বে আসিয়াছেন, তাহাতে আমার সংশয় নাই, কিন্তু আমি অগ্রে ধনঞ্জয়কে দেখিয়াছি। আপনি আগে আসিয়াছেন, ইঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সুতরাং আমি দুজনেরই সাহায্য করিব। বয়ঃকনিষ্ঠকে অগ্রে অভীষ্টদান করিবে, এই শ্রুতি অনুসারে, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে অভীষ্টলাভ করিতে পারেন। অতএব ধনঞ্জয়ের নিকটে আমি অগ্রে দুইটি অভীষ্ট উপস্থিত করিতেছি। এক শরীরসম্বন্ধে আমার সমান দশ কোটি গোপজাতীয় সৈন্য আছে, তাহারা

নারায়ণনামে প্রসিদ্ধ। তাহারা সকলে সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিবে, আর আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিব না। এ দুইয়ের মধ্যে, পার্থ, তোমার যেটি হৃদ্যতর, সেইটি গ্রহণ কর, তুমিই ধর্ম্মতঃ অগ্রে অভীষ্টলাভ করিতে পার।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন কৃষ্ণের সৈন্যগণকে লাভ করিয়া, এই মনে করিয়া হৃষ্ট হইল, আমি কৃষ্ণের সমুদায় বল অপহরণ করিয়া লইয়া চলিলাম। দুর্য্যোধন বলরামের নিকটে গমন করিলে, তিনি বলিলেন, আমি বিরাটরাজগৃহে তুল্য সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমার সে কথার অনুমোদন করেন নাই। আমি কৃষ্ণ বিনা মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। তাই আমি মনে করিয়াছি, আমি এ যুদ্ধে কাহারও সহায় হইব না। দুর্য্যোধন কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করিলে, তিনি তাঁহাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা অর্পণ করিলেন। দুর্য্যোধন চলিয়া গেলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যুদ্ধ করিব না, অথচ কি মনে করিয়া তুমি আমায় বরণ করিলে? অর্জ্জুন কহিলেন, আমার এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, আপনি একা সমুদায় শত্রুসৈন্য বধ করিতে পারেন। তবে আমি জানি, আমিও একা সকলকে বধ করিতে সমর্থ। আপনিতো লোকে কীর্ত্তিমান্ আছেনই, সে কীর্ত্তি আপনার চির দিন থাকিবে। আমিও যশ চাই, তাই আপনাকে বরণ করিয়াছি। আমার মনে নিরন্তর এই সাধ আছে যে, আপনি আমার সারথির কার্য্য করিবেন। আমার অনেক কালের এই অভিলাষ আপনাকে পূর্ণ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই হইবে, আমি তোমার সারথ্য করিব।

দূতপ্রতি কৃষ্ণবাক্য

দ্রুপদপ্রেরিত দূতের মুখে সমুদায় কথা অবগত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয় আসিয়া যুদ্ধ হইতে অযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধে রাজ্যলাভাপেক্ষা বনে বিচরণ শ্রেয়ঃ, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া, ধর্ম্ম-রাজকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার কথার উত্তরদানপূর্ব্বক, পরিশেষে সমুচিত উত্তরের জন্য, কৃষ্ণের নিকটে সমগ্র প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন, কি কর্ত্তব্য, ইনি তাহা নিঃসংশয় নির্ণয় করিতে পারেন। ইনি যাহা বলিবেন, আমরা কখন তাহা অতিক্রম করিব না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবগণের অবিনাশ ও সমৃদ্ধি অভিলাষ করি এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণেরও উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। তোমরা সকলে শান্তিতে অবস্থিতি কর, এ ভিন্ন আমি আর তাঁহাদিগকে অন্য কোন কথা বলিতে পারি না। পাণ্ডবদিগের পক্ষে শান্তি আশ্রয় করা সম্ভব, কিন্তু যখন ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ লোভপরবশ, তখন শান্তি দুষ্কর। এরূপ অবস্থায় কলহ হইবে না, এ কি সম্ভব? অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের কথা আমার নিকটে এবং ধর্ম্মরাজের নিকটে জানিয়াও, কেন অনুষ্ঠেয় বিষয়ে উৎসাহী পাণ্ডুতনয়ের যাহাতে সাধু অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়, সেরূপ কথা বলিতেছ। ইনি যে বিধি অনুসরণ করিতে উদ্যত, তাহা ছোট বড় সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণের অভিমত। কাহারও মতে কর্ম্মযোগে সিদ্ধি হয়, কাহারও মতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানে সিদ্ধি হয়। ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন না করিয়া জ্ঞানীরও তৃপ্তি হয় না, কোন্ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ইহা বিদিত নাই? যে সমুদায় জ্ঞান কর্ম্মসাধন করে, সেই সকল জ্ঞান সফল, অন্য জ্ঞান নিষ্ফল। দেখ, কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান কর, তখনই তৃষ্ণার শান্তি হইবে। কর্ম্মযোগেই বিধি নিবদ্ধ হইয়া থাকে, বিধানমাত্রেই কর্ম্ম আছে। বিধানে কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু যে ভাল মনে করে, সে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার কথা নিষ্ফল। পরলোকে দেবগণের দীপ্তি কর্ম্মে। ইহলোকে কর্ম্মে বায়ু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতন্দ্রিত-ভাবে সূর্য্য নিয়ত উদিত হইতেছে। মাস অর্দ্ধমাস বা নক্ষত্রগণেতে চন্দ্র যে গতায়াত করিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কর্ম্মযোগেই। পৃথিবী যে গুরুভার বহন করিতেছে, নদী সকল যে সর্ব্বভূতের তৃষ্ণানিবারণ করিয়া বহমান রহিয়াছে, ইন্দ্র যে জলবর্ষণ করেন, এ কেবল কর্ম্মজন্য। ইন্দ্র বৃহস্পতি রুদ্র যম প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মযোগে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেরই কর্ম্ম পরম ধর্ম্ম, ইহা জানিয়াও, কেবল কৌরবগণের পক্ষপাতবশতঃ, কেন তুমি বিপরীত বলিতেছ? বেদে নিত্য কর্ম্মের প্রয়োগ আছে, রাজসূয় অশ্বমেধে অস্ত্র শস্ত্র বর্ম্মাদির ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন। যদি ইঁহারা কৌরবগণের বধে প্রবৃত্ত না হন, ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্য হইবে না, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গবশতঃ আর্য্যচরিত্রও রক্ষা পাইবে না। ইঁহারা পৈতৃক কর্ম্মে স্থিতি করিয়া যদি বিপদগ্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তথাপি যথাশক্তি স্বকর্ম্ম

পূর্ণ করাতে, মৃত্যুও প্রশংসিত হইবে। যুদ্ধ করিয়া শান্তিস্থাপন তুমি ধর্ম্মানুমোদিত মনে কর, অথবা যুদ্ধ না করিয়া শান্তিস্থাপন ধর্ম্ম মনে কর? চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বকর্ম্ম কি, শ্রবণ করিয়া, তাহার পর ইঁহাদিগকে নিন্দা করিতে হয় কর, প্রশংসা করিতে হয় কর। অধ্যয়ন, যজন, দান, তীর্থভ্রমণ, অধ্যাপন, যাজ্যযাজন, সৎপাত্র হইতে দানপরিগ্রহ, এই সকল ব্রাহ্মণগণের স্বকর্ম্ম। ধর্ম্মানুসারে অপ্রমত্তভাবে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, দারপরিগ্রহপূর্ব্বক পুণ্যানুষ্ঠানে গৃহে বাস রাজন্যবর্গের স্বকর্ম্ম। বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য, ধনসঞ্চয়, গৃহস্থ হইয়া গৃহে বাস বৈশ্যের স্বকর্ম্ম। বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞ শূদ্রের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা ও বন্দনাই তাহার ধর্ম্ম। শূদ্র নিয়ত আত্মোন্নতির জন্য সযত্ন থাকিবে। ব্রাহ্মণাদিবর্ণসমূহকে রাজা প্রতিপালন করিবেন, তাহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে নিরত রাখিবেন, আপনি কামনার বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া প্রজাগণের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন; যে সকল কামনার বিষয় ধর্ম্মসঙ্গত নহে, সে সকলের কখন অনুরোধ রক্ষা করিবেন না। কি প্রকার কামনার বিষয় হইতে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহা জানিয়া, তাহা হইতে ধর্ম্মের পরিবৃদ্ধি হইবে বলিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি যাহাতে হয়, তাহার নিমিত্ত অনুশাসন করিবেন; আপনিও তাহাতে নিত্য স্থিতি করিবেন, কখন তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। পরের ঐশ্বর্য্যে লোভী হইয়া বলপ্রকাশ করাতে, যুদ্ধ ও তাহার উপযোগী বর্ম্ম শস্ত্র ধনুর উৎপত্তি হইয়াছে। দস্যুগণের বিনাশের জন্য স্বয়ং ইন্দ্র এই সকল উপকরণ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধ করিলে পুণ্যলাভ হয়। কুরুগণ ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের দস্যুত্বাপরাধ ঘটিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র পরস্বাপহরণ করিয়াছে, পুরাতন রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। কুরুগণের কাহারও রাজধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নাই। লোকের অগোচরে ধনহরণ করিলেও চৌর্য্য, চক্ষুর গোচরে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেও চৌর্য্য। এ উভয়ই নিন্দনীয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রে ও দস্যুতে কিছুই পার্থক্য নাই। লোভবশতঃ সে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য আপনি ভোগ করিতেছে এবং ক্রোধমোহের বশবর্ত্তী হইয়া সে মনে করিতেছে যে, ইহাই রাজধর্ম্ম। পিতৃরাজ্য লাভ করিতে গিয়া যদি মৃত্যুও হয়, অপরের রাজ্যলোভ হইতে তাহাও ভাল। সঞ্জয়, তুমি গিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবার জন্য সমানীত

মুঢ় রাজগণের নিকটে কৌরবদিগের এই প্রাচীন ধর্ম্মের কথা বল। সভামধ্যে কুরুগণ কি পাপ কর্ম্মই না আচরণ করিয়াছে! পাণ্ডবগণের শীলসম্পন্না যশস্বিনী প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী সভামধ্যে ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াও ভীষ্ম-প্রভৃতি কুরুগণ উপেক্ষা করিয়াছেন। যদি তাঁহারা বালবৃদ্ধ সকলে মিলিত হইয়া নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে ধৃতরাষ্ট্র আমার প্রিয়কার্য্য করিতেন, এবং পুত্রগণের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য, তাহাও সম্পন্ন হইত। দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে সভামধ্যে শ্বশুরগণের সন্নিধানে আনয়ন করিল, তিনি সকরুণ সকলের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এক বিদুর বিনা তিনি আর কাহারও সাহায্যলাভ করেন নাই। সভায় সমবেত রাজগণ কার্পণ্য-বশতঃ কেহই কিছু বলেন নাই; এক বিদুরই ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণা সভামধ্যে দুষ্কর কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া, পাণ্ডবগণকে ক্লেশরাশি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণাকে শ্বশুরগণের সম্মুখে সূতপুত্র কর্ণ কি না বলিয়াছিল,—যাজ্ঞসেনি, তোমার আর গতি নাই, এখন দুর্য্যোধনের গৃহে গিয়া দাসী হও; তোমার পরাজিত স্বামিগণ আর তোমার স্বামী নহেন, এখন গিয়া অন্য স্বামী বরণ কর। সেই কথা তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অর্জ্জুনের অস্থিভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া আছে। ইহারা যখন কৃষ্ণাজিন পরিধান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, দুঃশাসন কত কটু কথাই বলিয়াছিল। কৌরবগণ আজ কেন, দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তৈলহীন তিলবৎ বিনষ্ট হইয়া নরকে গমন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে যখন দ্যুতক্রীড়ায় হারিলেন, তখন গান্ধাররাজ শকুনি বলিয়াছিল, এখন আর তোমার কি আছে, এখন যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে পণ কর। দ্যূতকালে কি সকল গর্হিত বাক্য তাহারা বলিয়াছে, সঞ্জয়, তুমি সকলই জান। এখন যে বিপৎকর কার্য্য সমুপস্থিত, ইহার সমাধান জন্য আমি স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত আছি। যদি গিয়া পাণ্ডবের জন্য সমান ভাগ কুরুগণের নিকট হইতে লইতে পারি, আমার পুণ্য হইবে, কীর্ত্তি হইবে। আমি গিয়া যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মসঙ্গত হিংসাশূন্য কথা বলিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যদি আমার কথা রক্ষা করে, আমার সম্মান করে, কুরুগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবে। যদি না শুনে, তবে জানিও, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিজ পাপে যুদ্ধার্থী অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইবে। দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণকে দুর্য্যোধন যে ভয়ানক রুক্ষ বাক্য

শুনাইয়াছিল, গদাহস্ত ভীমসেন যথাসময় তাহা স্মরণ করাইয়া দিবেন। দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীতনয়দ্বয় তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আমি ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র বন, সপুত্র পাণ্ডুতনয়গণ ব্যাঘ্র। সব্যাঘ্র বন ছেদন করিও না, বন হইতে ব্যাঘ্রগণের যেন অদর্শন না হয়। ব্যাঘ্র বনহীন হইলে মারা যায়, বনে ব্যাঘ্র না থাকিলে বন কাটা যায়। এ জন্য ব্যাঘ্র বনকে রক্ষা করিবে, বন ব্যাঘ্রকে পালন করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ লতাধর্ম্মবিশিষ্ট, পাণ্ডুপুত্রগণ শালবৃক্ষসদৃশ। লতা কখন মহাদ্রুম আশ্রয় না করিয়া বর্দ্ধিত হয় না। কুন্তী-তনয়গণ শুশ্রূষা করিতেও প্রস্তুত আছেন, যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত আছেন; রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যাহা কর্ত্তব্য, এখন তিনি তাহা করুন। ধর্ম্মচারী পাণ্ডুতনয়গণ শান্তিদানেও প্রস্তুত, সমর করিতেও সমর্থ, ইহা জানিয়া, যথাযথ তাঁহাকে গিয়া সকল কথা বল।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য

সঞ্জয় প্রতিগমন করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, মিত্রবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, এখন সময় উপস্থিত। আপদের সময়ে তুমি বিনা আমাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে? আমাদের নির্ভয় ও অমোঘ দর্প তোমাকে লইয়া। অমাত্যসহকারে দুর্য্যো-ধনকে আমরা পঞ্চভূতে বিলীন করিব। তুমি বৃষ্ণিগণকে যে প্রকারে আপদে রক্ষা করিয়া থাক, আমাদিগকেও তেমনি মহাভয় হইতে রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনার যাহা বলিবার, বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। ইহাতে রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাপন করিলেন, পৈতৃক রাজ্যাংশ দিতে অস্বীকার করাতে, তিনি অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও আবসান, এই পাঁচখানি গ্রাম দুর্য্যোধনের নিকট চাহিয়াছিলেন, তাহাও সে দিতে অস্বীকার করিয়াছে। নির্ধনের কি প্রকার দুরবস্থা, জ্ঞাতিবিরোধ কি প্রকার পাপ ও অনিষ্টজনক, এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করত, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ, সর্ব্বথা মানার্হ, তাঁহার নিকটে প্রণিপাত দ্বারা শান্তিস্থাপন করা সমুচিত। কিন্তু তাঁহাতে পুত্রবাৎসল্য যে প্রকার প্রবল, তাহাতে প্রণিপাতে কিছু ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এখন কাল সমুপস্থিত, এ সময়ে, কৃষ্ণ, তুমি কি মনে কর? যাহাতে অর্থহানি না হয়, ধর্ম্মহানি

না হয়, এরূপ কৃচ্ছ্র যখন উপস্থিত, তখন তোমা বিনা আর কাহার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিব? তুমি সকল কার্য্যের গতি বিশেষরূপে অবগত, তুমি সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। বল, এ সম্বন্ধে কি উপায় হইতে পারে?

এই কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাদের উভয় পক্ষের জন্য আমি কুরুসভায় গমন করিব। যদি আপনাদের অর্থহানি না জন্মাইয়া শান্তি প্রত্যানয়ন করিতে পারি, আমার পুণ্য ও যশ মহাফল লাভ হইবে; কুরু, সৃঞ্জয়, পাণ্ডব, ধৃতরাষ্ট্রতনয়, এমন কি সমুদায় পৃথিবীকে মৃত্যুপাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি কুরুগণের নিকটে যাইবে, ইহাতে আমার মত নাই। তাহারা কখন তোমার কথানুসরণ করিবে না। অনেকগুলি ক্ষত্রিয় দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে তোমার যাওয়া আমার মনে ভাল লাগে না। তোমার প্রতি যাহাতে অত্যাচার হইবে, তাহাতে সম্পৎ-সুখ-দেবত্ব-ঐশ্বর্য্য-লাভ হইলেও, কখন আমাদের প্রীতিকর হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের পাপশীলতা আমি জানি, কিন্তু যাহাতে সকল স্থানের রাজন্যবর্গের নিকটে আমরা নিন্দনীয় না হই, তাহা করা সমুচিত। যদি সকল রাজগণ মিলিত হইয়া, আমার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হয়, আমি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহারা কখন আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। আমার মনে হয়, আমি সমুদায় কুরুকে একাই দহন করিব। আমার সেখানে যাওয়া নিরর্থক হইবে না। যদি অর্থপ্রাপ্তি না হয়, অন্ততঃ নিন্দার কারণত থাকিবে না। যুধিষ্ঠির বলিলেন, তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর। তুমি কুরুগণের নিকটে গমন কর, আবার যেন আমরা দেখিতে পাই, তুমি কার্য্যসমাধা করিয়া মঙ্গলমত ফিরিয়া আসিলে। সেখানে গিয়া, যাহাতে সকলের চিত্ত শান্ত হয়, তাহাই কর; আমাদের সকলের মন ভাল হউক। তুমি অর্জ্জুনের সখা, অর্জ্জুনের ভাই, আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের পরস্পর সৌহৃদ্য আছে; তোমার প্রতি কোন আশঙ্কাই উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাতে সমৃদ্ধি হয়, এরূপ কল্যাণ লাভ কর। তুমি আমাদিগকেও জান, শত্রুগণকেও জান, প্রয়োজনীয় বিষয়ও জান, কি কি বলিলে আমাদের হিত হয়, তাহাও বলিতে জান, দুর্য্যোধনকে সেইগুলি বলিও।

যাহাতে ধর্ম্ম ঠিক থাকে, এমন হিতকর প্রিয় মধুর বাক্য হউক বা তার বিপরীত হউক, বলিও।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সঞ্জয়ের কথাও শুনিয়াছি, এবং আপনার কথাও শুনিলাম। তাদের অভিপ্রায় কি, আপনার অভিপ্রায় কি, তাও জানি। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মাশ্রিত, তাদের মতি শত্রুতাশ্রিত। যুদ্ধ না করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপনি বহু মনে করেন। হে রাজন্, ক্ষত্রিয়ের এটি নৈষ্ঠিক কর্ম্ম নয়। সকল আশ্রমীরাই বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের এই সনাতন স্বধর্ম্ম, বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এখানে কার্পণ্য কখন প্রশংসনীয় নহে। কার্পণ্য আশ্রয় করিয়া আপনি কখন জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন না। আপনি বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুবিনাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অত্যন্ত লোভী, তাহাদিগের প্রতি স্নেহও করা হইয়াছে, দীর্ঘকাল একত্র বাস করাও হইয়াছে। এখন তাহারা অনেক মিত্রলাভ করিয়াছে, সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছে। এখন আর সমান নাই যে, আপনার সঙ্গে সমব্যবহার করিবে। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদি সহায় থাকাতে, তাহারা আপনাদিগকে বলবান্ই মনে করিয়া থাকে। যত দিন ইহাদিগের সঙ্গে মৃদু ব্যবহার করিবেন, তত দিন ইহারা আপনার রাজ্য হরণ করিবে। কি দয়া, কি দৈন্য, কি ধর্ম্মার্থ, কিছুরই জন্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। তাহারা দুষ্কর পাপ করিয়াও অনুতাপ করে নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ব্রাহ্মণ, সাধু, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, নগরবাসিগণ এবং কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোকের সম্মুখে আপনার ন্যায় দানশীল, মৃদু, দান্ত, ধর্ম্মশীল, অনুব্রত ব্যক্তির দ্যূতক্রীড়ায় সমুদায় বঞ্চনা করিয়া লইল, অথচ নৃশংস যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের কিছুমাত্র লজ্জা নাই। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রণয় করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার কথা দূরে, তাহারা সকল লোকের বধ্য। আপনাকে এবং ভ্রাতৃবর্গকে কঠোর কথায় কত কষ্ট দিয়াছে। এখন আপনাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই, দেখিবেন, ইহাদের নামগোত্রও থাকিবে না। কালে ইহাদিগের পরাভব হইবেই। ইহারা যখন নষ্টপ্রকৃতি, তখন সে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিবেই। দুঃশাসন রাজসভায় অনাথবৎ দ্রৌপদীর কি অবমাননাই না করিয়াছে। আপনি

বিক্রমশালী ভাইদিগকে বারণ করিয়াছিলেন, ইঁহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ, তাই তখন কিছু করিতে পারেন নাই। আপনি বনে গেলে, এত সকল কঠোর কথা বলিয়াও, জ্ঞাতিগণমধ্যে কতই না এ দুরাত্মা আত্মশ্লাঘা করিয়াছে। আপনি নিরপরাধ, সে সময়ে আপনাকে যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই রোদন করিয়াছে। সভাস্থ রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ কেহই দুর্য্যোধনের কার্য্যে অনুমোদন করেন নাই, সকলেই নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দা ও বধ এতদুভয়ের মধ্যে কুলীন ব্যক্তির পক্ষে বধই আদরণীয়, নিন্দিত হইয়া কুৎসিতজীবনধারণ নহে। যখন সে পৃথিবীর সমুদায় রাজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া নির্লজ্জ হইয়াছে, তখনই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। যাহার চরিত্র এরূপ, তাহার বধ অতি সামান্য কার্য্য। যে বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইয়া অল্প একটুতে বাধিয়া আছে, একটু নাড়া পাইলেই উহা ভূমিসাৎ হয়। দুর্ম্মতি অনার্য্য ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সকলেরই বধ্য, আপনি ইহাকে বধ করুন, এ বিষয়ে আপনার সংশয় করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ভীষ্ম এবং জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আপনি প্রণিপাত করিবেন, এ বিষয় আমারও অভিমত; কিন্তু ইহাতে কিছু ফল হইবে না। রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি যাহাদিগের দ্বিধা আছে, আমি গিয়া তাহাদিগের সকলের সংশয়চ্ছেদন করিব, রাজগণমধ্যে গিয়া আমি আপনার পুরুষোচিত গুণসকলের কথা বলিব, আর তাহার যে সকল অনুচিত ব্যবহার, তাহারও উল্লেখ করিব। আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নানা দেশাগত রাজগণ আপনাকে ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং সে যে কি প্রকার লোভে পরিচালিত, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। পৌর জানপদ বৃদ্ধ বালক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলকে লইয়া ইহার নিন্দাঘোষণা করিব। আপনি যখন শান্তি চাহিতেছেন, তখন ইহাতে আপনার কোন অধর্ম্ম হইবে না। রাজন্যবর্গ ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুগণকেই নিন্দা করিবে। সকল লোকে যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন আর কি কার্য্য অবশেষ রহিল, ইহাতেই তো তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইলে যাহা করিতে হয়, আপনি কেবল তাহাই করুন। আমি কুরুগণের নিকটে গিয়া, আপনাদের যাহাতে ক্ষতি না হয়, এরূপ করিয়া শান্তিস্থাপনে যত্ন করিব, এবং তাহারা কি করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিব। যুদ্ধার্থ তাহারা কি করিতেছে, তাহা অবগত হইয়া, আপনার জয়ের জন্যই ফিরিয়া আসিব।

মৃগপক্ষিগণের ঘোরশব্দপ্রবৃত্তিতে যুদ্ধ হইবেই, তাহার লক্ষণ চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। যোদ্ধারা অস্ত্র শস্ত্র রথাদিতে সজ্জিত এবং প্রস্তুত হইয়া থাকুন; সংগ্রামের যে সকল উদ্যোগ, সকলই করুন। দ্যূতক্রীড়ায় আপনাকে জয় করিবার পূর্ব্বে, আপনার যে রাজ্য ছিল, দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে তাহা কখনই আপনাকে ফিরাইয়া দিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীমসেন কুরুগণের সহিত শান্তিস্থাপনজন্য অনুরোধ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন মরিতে প্রস্তুত, তথাপি আপনার মত কখন ছাড়ে না, ইত্যাদি তাহার অসদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া, তিনি বলিলেন, তাহাকে ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর মৃদু বাক্য বলিও, কখন উগ্রকথা বলিও না। বরং আমরা তাহার অনুগতের ন্যায় থাকিব, তবু যেন ভরতবংশ বিনষ্ট না হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের অভূতপূর্ব্ব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রতি ক্রোধবশতঃ তিনি মুহূর্ত্তকাল শান্ত ও ধীর থাকিতে পারিতেন না, সেই সকল কথা বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ উপস্থিতপ্রায় জানিয়া, ভীমসেনের মনে যেন ভয় উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে কতকগুলি কথা বলিলেন; ইহাতে ভীমসেন তাঁহার কথার এই বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, যখন যুদ্ধ সমুপস্থিত হইবে, তখন বিক্রম কিরূপ, বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তিনি ভয়প্রযুক্ত কখন শান্তিস্থাপনের অনুরোধ করেন নাই। সকলক্লেশবহন করিয়াও, কেবল সৌহৃদ্যবশতঃ, ভরতবংশের বিনাশ না হয়, ইহা তিনি হৃদয়ের সহিত অভিলাষ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য সে সকল কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার যে কত বিক্রম, তাহা তিনি তাঁহা অপেক্ষাও অধিক জানেন। বিলক্ষণ পুরুষকার থাকিলেই যে জয়লাভ হয়, ইহা অনেক সময়ে হয় না। তাই তিনি, যুদ্ধে জয়লাভ হইবেই, এরূপ একান্ত আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে নিষেধ করিলেন। তবে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় জানিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষশোকপরিশূন্য হইয়া, সকলে কার্য্য করিবে, এই তাঁহার মত। তিনি শান্তির জন্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহাকেই (ভীমসেনকেই) যুদ্ধের সমুদায় ভার বহন করিতে হইবে। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি,

শান্তিস্থাপন হইবে না। কর্ম্মানুষ্ঠান বিনা পুরুষের কোন ফল নাই সত্য, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যদি ফলোদয় না হয়, তাহা হইলেই বা কি হইল? অতএব আপনি তাই করুন, যাহাতে কুশল সমুপস্থিত হয়। আপনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, হউক, আপনার ইচ্ছাই আমাদের নিয়ামক। দৈব ও মনুষ্যের প্রযত্ন এই দুইয়ের সম্মিলনে ফলাফল হয় *, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথার সমুচিত উত্তরদান করিলে, নকুল যুদ্ধার্থ উৎসাহপ্রকাশ করিলেন। সহদেব, সাত্যকি এবং কৃষ্ণা, বিনাযুদ্ধে কিছুতেই তাঁহাদিগের চিত্তের প্রশান্তি হইবার নহে, বিশেষরূপে তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ইঁহাদিগের কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কাল সমুপস্থিত, কখন তাঁহার কথায় তাহারা কর্ণপাত করিবে না। সুতরাং নিশ্চয় তাহারা সমরে ধরাশায়ী হইবে।

পর দিন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ কুরুগণের নিকটে যাইবার জন্য রথারোহণ করিলেন, দুর্য্যোধন পাপমতি, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি রথে যুদ্ধাস্ত্র সকল লইলেন; সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণিগণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় রাজা যুধিষ্ঠির মাতা কুন্তী এবং গুরুজনকে তাঁহার অভিবাদন অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, যদি দুর্য্যোধন অর্দ্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় স্বগণসহ বিনষ্ট হইবে। শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে যে দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন, সকলের নিকটে পূজাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন, এ কথা ঘরে ঘরে বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা কহিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা একান্ত আশ্চর্য্য মনে করিলেন, এবং দুর্য্যোধনকে তাঁহার সম্ভাষণার্থ বিশেষ আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন। পথে পথে যে সকল স্থান আছে, তথায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আসন-গন্ধমাল্যাদির আয়োজনকরত, সায়ংকালে তিনি বৃকস্থলে উপনীত হইবেন বলিয়া, সেখানে বিশেষ সভা নির্ম্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এ সকল আয়োজনের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, একেবারে কুরুগৃহের দিকে গমন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধনরত্নাদিপ্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবেন, এই মনে করিয়া

* "দেবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্।"
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৭৮ অ, ৫ শ্লোক।

বিদুরকে তাঁহার সম্ভাষণের আয়োজন বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে বিদুর বলিলেন, আপনার এ সকল আয়োজন ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নহে; বাহিরে আপনি কৃষ্ণকে সমাদর প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু অন্তরে আপনার অভিলাষ, অর্থ দ্বারা আপনি কৃষ্ণের চিত্তহরণ করিবেন। আমি নিশ্চয় জানি, অর্থ, উদ্যম বা নিন্দা কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে ধনঞ্জয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। আপনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং ধনঞ্জয়ের দৃঢ় ভক্তি জানুন। আমি জানি, অর্জ্জুন ইঁহার প্রাণ-তুল্য, কখন ইনি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। জলপূর্ণ কুম্ভ, পাদধৌত জল, কুশলসংপ্রশ্ন বিনা শ্রীকৃষ্ণ কিছুই চাহিবেন না; আপনি তাঁহার উপযুক্ত আতিথ্যসৎকারের আয়োজন করুন। দুর্য্যোধন বলিল, মহামতি বিদুর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারিবে না। তাঁহাকে ধনাদি দান করা সমুচিত নহে, তাহাতে কিছু ফল নাই। বরং তিনি মনে করিবেন, ভয়প্রযুক্ত আমরা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, কৃষ্ণকে সৎকার করা হউক, বা অসৎকার করা হউক, তিনি কিছুতেই ক্রোধ করিবেন না। তবে ইঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কেন না ইনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য জানিবেন, এমন কেহ নাই যে, কোন উপায়ে তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবে। তিনি যাহা বলিবেন, নিঃশঙ্কচিত্তে পাণ্ডবেরা তাহাই করিবে। ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা বলিবেন, তাঁহাকে যেন সকল বন্ধুতে মিলিয়া প্রিয়বাক্য বলা হয়। দুর্য্যোধন এই কথা শুনিয়া বলিল, পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজশ্রী ভোগ করিব, ইহা কখন আমা হইতে হইবে না। আমার যুক্তি এই, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে, তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক, তাঁহাকে বদ্ধ করিলে সকলেই বান্ধা পড়িবে। এমন কিছু উপায় করা হউক, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন। এতচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস, এমন কথা বলিও না; শ্রীকৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ আছে, বিনাপরাধে কেমন করিয়া তাঁহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারে। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই প্রকার অনার্য্যচেষ্টায় ক্লিষ্ট হইয়া, ক্রোধে সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বৃকস্থলে রাত্রিযাপন করিয়া, পর দিন প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রাজা

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র দ্রোণ ও ভীষ্মসহকারে ধৃতরাষ্ট্র আসন হইতে উঠিলেন, কৃপ সোমদত্ত প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। সেখানে সৎকারগ্রহণপূর্ব্বক, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিদুরগৃহে প্রস্থান করিলেন। সেখানে কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক, তিনি দুর্য্যোধনগৃহে গমন করিলেন। তিনি যাইবামাত্র সকলে গাত্রোত্থান করিয়া যথা-নিয়ম তাঁহার সম্ভাষণা করিল। রাজা দুর্য্যোধন আহারের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। শঠতা অন্তরে আচ্ছাদিত রাখিয়া দুর্য্যোধন বলিল, অন্ন, পান, বসন, শয্যা আপনার জন্য আনীত হইয়াছে; কেন গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি উভয়কেহ সাহায্য দিয়াছেন, উভয়েরই হিতে রত। আপনার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং আপনি পিতা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়। আপনি ধর্ম্মার্থ সর্ব্বথা যথাযথ জানেন। আপনি কেন এরূপ করিলেন, তাহার কারণ শুনিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দূত যে কার্য্যের জন্য আইসে, সে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, তবে ভোজন করিয়া থাকে, পূজাগ্রহণ করিয়া থাকে। আমি যখন কৃতার্থ হইব, তখন আমার অর্চ্চনা করিও। দুর্য্যোধন উত্তর করিল, আপনি কৃতার্থ হন বা অকৃতার্থ হুন, আমরা আপনার পূজা করিতে যত্ন করিতেছি, অথচ পূজা করিতে পারিতেছি না। কেন যে আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন না, তাহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। আমাদের সঙ্গে শত্রুতাও নাই, বিরোধও নাই। এ সকল জানিয়া, আপনার এরূপ বলা উচিত নয়। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, হেতুবাদ ও লোভবশতঃ কখন কোনরূপে ধর্ম্মপরিত্যাগ করিব না। প্রীতিতে অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া হয়, আপৎকালে ভোজনার্থ অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে; এখানে প্রীতিও দেখিতেছি না, আমি আপদ্গ্রস্তও হই নাই। জন্ম অবধি পাণ্ডবগণকে আপনি কেন দ্বেষ করেন? তাঁহারা আপনার ভাই, তাঁহারা সকলে প্রীতির সহিত আপনার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সমগ্রগুণসম্পন্ন। বিনা কারণে পার্থগণের প্রতি দ্বেষ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। পাণ্ডবেরা নিরন্তর ধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে কে কি বলিতে পারে? যে তাঁহাদিগকে দ্বেষ করে, সে আমাকে দ্বেষ করে; যে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী, সে আমার অনুবর্ত্তী। ধর্ম্মাচরণশীল পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমায় একাত্মা

জানিবেন। কামক্রোধানুবর্ত্তী হইয়া, মোহবশতঃ যে ব্যক্তি বিরোধ করিতে অভিলাষ করে, গুণবান্‌কে যে দ্বেষ করে, তাহাকে পুরুষাধম বলা যায়। মোহ-ও-লোভবশতঃ যে ব্যক্তি কল্যাণগুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অসদৃষ্টিতে দেখে, সে ব্যক্তি অজিতাত্মা অজিতক্রোধ, কখন চির দিন তাহার শ্রী থাকে না। আত্মহৃদয়ের নিকট অপ্রিয় হইলেও, যে ব্যক্তি গুণসম্পন্ন লোকদিগকে প্রিয়াচরণে বশীভূত করে, তাহার যশ চির কাল থাকিয়া যায়। দুষ্টজনসংস্কৃত এ সকল অন্ন ভোজন করা উচিত নয়, এক বিদুরের অন্ন ভোজনীয়, এই আমার অভিমত। এই বলিয়া তিনি বিদুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও কুরুগণ সকলে আপনার আপনার গৃহবাসার্থ নিবেদন করিলেন। তিনি সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া, সকলকে বিদায় দিলেন।

ভোজনান্তে নিশাকালে, বিদুর তাঁহাকে, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিকটে কেন দূতকার্য্য করিতে আসা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তো কখন সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে না, বরং তাঁহার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবে, এ জন্য বিদুর আশঙ্কাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে বলিলেন, আপনি প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, এবং সুহৃজ্জনের উপযুক্ত কথাই বলিলেন। আমার প্রতি আপনার পিতা মাতার ন্যায় স্নেহ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সকলই ঠিক। তবে আমি কি জন্য আসিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের দৌরাত্ম্য, ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা জানিয়াই, কৌরবগণের নিকটে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি এই বিপদ্‌গ্রস্ত পৃথিবীকে মৃত্যুর পাশ হইতে রক্ষা করে, সে উত্তম ধর্ম্ম লাভ করে। ধর্ম্মকার্য্যের জন্য যত দূর শক্তি যত্ন করিয়া, যদি কৃতকার্য্যও না হয়, তবে সে সে কার্য্যের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। মনে পাপ চিন্তা করিয়া, যদি কার্য্যে পাপপ্রদর্শন না করে, তবে সে ব্যক্তি বাহ্যে সৎকার্য্য প্রদর্শিত হইল বলিয়া, সৎকার্য্যের ফললাভ করিতে পারে না, ধর্ম্মবেত্তারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। কুরু ও সৃঞ্জয় বংশীয়েরা সংগ্রামে বিনাশ পাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, আমি নিষ্কপটভাবে তাহাদিগের মধ্যে শান্তি আনয়নজন্য যত্ন করিব। দুর্য্যোধন ও কর্ণ হইতে কুরুকুলে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। বিপদের সময়ে যথাশক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া, যে ব্যক্তি মিত্রের

হিতসাধন না করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা নৃশংস বলিয়া থাকেন। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যাচার করিবার জন্য আসিয়া কেশ না ধরিয়াছে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধু ব্যক্তিকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করিবে। যদি কেহ যথাশক্তি যত্ন করে, বলুন, সে কি কখন নিন্দিত হয়? আমি ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য বলিব, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র এবং তাহার অমাত্যগণের আমার কথা শ্রবণ করা সমুচিত। বস্তুতঃ আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়, পাণ্ডুতনয় এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয়গণের হিতসাধন করিতে অকপটভাবে যত্ন করিব। যদি হিতের জন্য যত্ন করিলেও, দুর্য্যোধন আমার প্রতি আশঙ্কা করে, তাহাতে কি? আমার তো হৃদয়ে প্রীতি হইবে, এবং ঋণমুক্ত হইব। জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরস্পর যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা না করে, তাহাকে কখন মিত্র বলা যায় না। অধার্ম্মিক মূঢ় শত্রুরা যেন এ কথা বলিতে না পারে, কৃষ্ণ বারণ করিতে পারিতেন, অথচ ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবকে তিনি নিবারণ করেন নাই। আমি কুরুপাণ্ডব উভয়ের কার্য্যসাধনের জন্য আসিয়াছি, আমি সর্ব্বথা যত্ন করিয়া মনুষ্যমণ্ডলীর নিকটে অনিন্দিত হইব। আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত কল্যাণকর কথা শুনিয়াও, যদি মূঢ় দুর্য্যোধন তাহা গ্রহণ না করে, সে আপনার ভাগ্যের ফল আপনিই ভোগ করিবে। পাণ্ডবগণের অর্থক্ষতি না করিয়া, যদি শান্তি আনয়ন করিতে পারি, আমার পুণ্য হইবে, খ্যাতি হইবে, কুরুগণও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। তবে আপনি যে বলিলেন, তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি এই বলি যে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালের অনুষ্ঠেয় জপহোমাদি সমুদায় সমাপনকরত, কুরু-বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রথারোহণে সভাস্থলে গমন করিলেন। সেখানে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া, সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সমাগত ঋষি-গণকে তিনি আসন প্রদান করাইয়া, পরিশেষে আপনি উপবিষ্ট হইলেন। সকল রাজগণ নিস্তব্ধভাবে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, সমরে বীরগণের শোণিতপাত না হইয়া, কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এইটি যাচ্ঞা করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এই কুরুকুল দয়া ক্ষমা প্রভৃতি বিবিধগুণে সমুদায় কুল

হইতে শ্রেষ্ঠ। এ কুলে কোন অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কুরুগণ মধ্যে কেহ যদি বাহ্যে বা অন্তরে মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপনি তাহার শাস্তা আছেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ধর্ম্মার্থের প্রতি বিমুখ হইয়া, কেবলই নৃশংসাচরণে প্রবৃত্ত। ইহারা লোভবশতঃ নিজ বন্ধুগণের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছে, এবং সকল প্রকারের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। এখন ঘোর বিপদ উপস্থিত, যদি এই বিপৎকে উপেক্ষা করা হয়, পৃথিবী বিনষ্ট হইবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, শান্তি হইতে পারে, আপনার পক্ষে এ কার্য্য কিছু দুষ্কর নহে। শান্তি এক দিকে আপনার অধীন, আর এক দিকে আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্তিতে স্থাপন করুন, আমি অপর পক্ষকে শান্তিতে স্থাপন করিব। আপনার আজ্ঞা আপনার পুত্রগণ ও তাহাদিগের অনুবর্ত্তিগণের একান্ত পালনীয়। কেন না আপনার শাসনে অবস্থিতি করিলে, ইহাদিগের হিত হইবে। শান্তিস্থাপন হইলে আপনারও হিত হইবে, পাণ্ডবগণেরও হিত হইবে। যদি দেখিতে পান যে, আপনার শাসন নিষ্ফল হইল, তবে এমন করুন, যাহাতে ভরতবংশীয় সকলে আপনার সহায় হইবেন। আপনি পাণ্ডুতনয়গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মার্থে অবস্থিতি করুন। পাণ্ডবগণ যদি আপনায় রক্ষা করেন, কেহ আপনাকে পরাভব করিতে পারিবে না। যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি প্রভৃতি আপনার সহায়, সেখানে বলুন, কাহার এমন দুর্ম্মতি হইবে যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কুরুপাণ্ডব উভয়ে আপনার সহায় হইলে, আপনি সকল লোকের অধীশ্বর হইবেন, কোন শত্রুই আপনার কিছু করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ রাজগণ আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হইবেন। আপনি এইরূপে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত হইয়া, সুখে জীবননির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া, ইহাদিগকে লইয়া, পূর্ব্বের মত আপনি সমুদায় শত্রু পরাজিত করিতে পারিবেন, এ কিছু আপনার অল্প লাভ নয়। যদি আপনি এবং আপনার অমাত্যবর্গ পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলিত হন, তাহা হইলে তাহাদিগের অর্জ্জিত ভূমি আপনি ভোগ করিবেন। যদি এরূপ না করিয়া যুদ্ধই স্থির করেন, তাহা হইলে উভয়ের দিকে মহাক্ষয় উপস্থিত হইবে। এ কার্য্যে বলুন, আপনি কি ধর্ম্ম দেখিতেছেন? যুদ্ধে যদি

পাণ্ডবেরা মরে, অথবা আপনার পুত্রগণ মরে, তাহা হইলে আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইবেন? আপনার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থী হইয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত, আপনি তাহাদিগকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। দেখিতেছি, ক্রোধান্বিত হইয়া কুরুপাণ্ডব উভয়ে উভয়কে ক্ষয় করিবে, সমবেত রাজগণ বিনষ্ট হইবেন, প্রজাগণের বিনাশ উপস্থিত হইবে। আপনি সকলকে রক্ষা করুন, যেন প্রজাগণের বিনাশ না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলে, সকলই হইবে। সমাগত রাজগণ সকলেই বিশুদ্ধচরিত্র, বদান্য, লজ্জাশীল, আর্য্যগুণসম্পন্ন, পবিত্রকুলপ্রসূত, পরস্পর পরস্পরের সহায়; ইঁহাদিগকে আপনি রক্ষা করুন। ইঁহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া, পানভোজন এবং বিবিধ সৎকারলাভানন্তর বৈরপরিত্যাগপূর্ব্বক, স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করুন। পাণ্ডু পরলোকগমন করিলে, পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি আপনার যে ভালবাসা ছিল, আবার সেই ভালবাসা উপস্থিত হউক, আপনি আজ মিলন সাধন করিয়া দিন। তাহারা সকলে পিতৃহীন বালক, আপনি যথান্যায় সেই পুত্রগণকে পালন করুন। তাহারা বিপদে পড়িলে, আপনারই তাহাদিগকে রক্ষা করা সমুচিত। ইহাতে আপনার ধর্ম্মও নষ্ট হইবে না, অর্থও নষ্ট হইবে না। পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন করিয়া, অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়াই, দ্বাদশ বর্ষ বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে মহাদুঃখভোগ করিয়াছি। পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিজকৃত প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিবেন, এই নিশ্চয় থাকাতেই, আমরা প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি নাই, আমাদিগের এ মনের ভাব ব্রাহ্মণগণ অবগত আছেন। আমরা আমাদিগের প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছি, এখন মহারাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালন করুন। আমরা অনেক ক্লেশ পাইয়াছি, এখন আমরা আমাদের রাজ্যাংশ যেন লাভ করি। আপনি ধর্ম্মও জানেন, অর্থও জানেন, আপনি আমাদিগকে ত্রাণ করুন। আপনি আমাদের গুরু, এ দেখিয়াই আমরা অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আপনি আমাদের মাতা ও পিতার ন্যায় হউন। শিষ্যের প্রতি গুরুর যে গুরু ব্যবহার, আমাদিগের প্রতি করুন। আমরা আপনার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করি, আপনি আমাদিগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করুন। আমরা যদি উৎপথে গমন করি, তবে আপনাকেই আমাদিগকে সৎপথে স্থাপন করিতে হইবে। আমাদিগকে সৎপথে স্থাপন করুন, আপনি ধর্ম্মানুমোদিত পথে স্থিতি করুন।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৪ অ, ৪০—৪৭ শ্লোক)" আপনার পুত্রগণ এই কথা সভাসদ্‌গণকে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মজ্ঞ সভাসদ্‌গণের অন্যায়াচরণ কখন যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে ধর্ম্মকে অধর্ম্মে, সত্যকে মিথ্যায় সভাসদ্‌গণের গোচরে উচ্ছেদ করে, সেখানে সভাসদ্‌গণ বিনষ্ট হন। যে সভায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হন, এবং সভাসদ্‌গণ ধর্ম্মের শল্যখণ্ডন করেন না, সেখানে সভাসদ্‌গণ বিদ্ধ হন। নদী যেমন কূলস্থ বৃক্ষাদিকে, ধর্ম্ম তেমনি সেই সভাসদ্‌গণকে উচ্ছেদ করেন। যাঁহারা ধর্ম্মদর্শী হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে ধ্যানযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায্য সত্য বলেন। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৪ অ, ৪৮—৫১ শ্লোক)" এই সভাতে যে সকল মহীপাল আছেন, তাঁহারা বলুন, রাজ্যাংশদানভিন্ন অন্য আর কি তাঁহারা বলিতে পারেন। ধর্ম্মার্থনির্দ্ধারণ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি, এ যদি হয়, এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন; পাণ্ডবগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য পৈতৃক অংশ দিয়া শান্তি আশ্রয় করুন, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইবেন না। পাণ্ডবদিগকে প্রাপ্যাংশ দিয়া পুত্রগণ সহ রাজ্যভোগ করুন। আপনি জানেন, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিত্য কাল সাধুগণের ধর্ম্মে অবস্থিত এবং আপনি ও আপনার পুত্রগণ তাঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছেন। জতুগৃহে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কতরূপে তাঁহাকে নিরসন করিয়াছিলেন, অথচ পুনরায় তিনি আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি এবং আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ইনি সেখানে বাস করিয়া, সমুদায় রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে আপনাকে ইনি অতিক্রম করেন নাই। ইনি নির্ব্বিবাদে ছিলেন, অথচ ইঁহার ধন ধান্য-রাজ্য হরণ করিবার জন্য, শকুনি সহ দ্যূতক্রীড়ায় ইঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি দ্যূতক্রীড়ায় দুর্গত হইলেন. কৃষ্ণাকে সভাস্থলগতা দেখিলেন, অথচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না। আমি আপনার এবং তাঁহাদিগের কল্যাণ ইচ্ছা করি। অর্থকে অনর্থ, অনর্থকে অর্থ মনে করিয়া, প্রজাগণকে ধর্ম্ম ও সুখ হইতে বিনষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ লোভেতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগকে শাসন করুন। পার্থগণ শুশ্রূষা করিতেও প্রস্তুত, যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত; যাহা আপনার নিকটে হিতকর বোধ হয়, আপনি তাহাই করুন।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সভাসদ্‌গণ নির্ব্বাক্‌ ও স্তম্ভিত হইলেন, কেহই তাঁহার কথায় উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন না। সমাগত ঋষিগণ মধ্যে জামদগ্ন্য * কণ্ব ও নারদ আখ্যানাবলম্বন করিয়া, অভিমান ও নির্ব্বন্ধাতিশয় হইতে কি প্রকার অনিষ্টপাত হইয়া থাকে, তাহা দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছু ফলোদয় হইল না। বরং কণ্ব যখন কৃষ্ণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিলেন, তখন কণ্বের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া, জানুতাড়ন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধন বলিল, হে মহর্ষে, যে ভাব দিয়া, যেরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ঈশ্বর আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেইরূপে জীবনযাপন করিতেছি; বহু কথা বলিয়া ফল কি? নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে, দুর্য্যোধনের যাহাতে দুর্বৃত্ততা নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন, দুর্য্যোধন, তুমি এবং তোমার অনুচরবর্গ শান্তির পথ আশ্রয় করিবে, এই উদ্দেশে আমি যাহা বলিতেছি, বুঝিয়া দেখ। তুমি জ্ঞানসম্পন্ন মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, শাস্ত্রজ্ঞ ও চরিত্রবান্‌। তোমায় আমি যাহা বলিতেছি, সকল প্রকারের গুণযুক্ত হইয়া, তোমার তাহাই করা উচিত। তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা সেই সকল লোক করিতে পারে, যাহাদিগের দুষ্কুলে জন্ম, দুরাত্মা, নৃশংস এবং নির্লজ্জ। ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়েই সাধুগণের প্রবৃত্তি, অসাধুগণের প্রবৃত্তি তদ্বিপরীত বিষয়ে। তোমাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ সাধুজনবিপরীত ব্যবহার লক্ষিত হইয়াছে। যে সকল কার্য্যে অধর্ম্ম হয়, বিনা কারণে ঘোর প্রাণনাশক ব্যাপার উপস্থিত হয়, সে সকল করিতে পারাই তোমার পক্ষে অনুচিত। যদি অনর্থ পরিহার কর, তুমি আপনার কল্যাণ আপনি সাধন করিবে। অনর্থ পরিহার করিলে, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য ইহাদিগের সম্বন্ধে অধর্ম্ম ও অযশস্কর কার্য্য হইতে তুমি মুক্ত হইবে। পাণ্ডবেরা সকলেই প্রাজ্ঞ, বীর, নিরতিশয় উৎসাহী, জিতেন্দ্রিয়, বহুশাস্ত্রসম্পন্ন; তাহাদিগের সহিত তুমি সম্মিলিত হও। শান্তি আশ্রয় করিলে তোমার হিত হইবে, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুগণ, রাজগণ, জ্ঞাতি ও

---

* এই ঋষিগণ মহাভারতমতে দিব্যধামবাসী, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যে কি ফল হয়, ইহাই দেখিবার জন্য ধরাধামে আসিয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের মর্ম্ম, যে সময়ে ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইবে, সেই সময়ে উদ্‌ঘাটিত করিতে যত্ন করা যাইবে।

মিত্রগণের, এমন কি সমুদায় জগতের সুখ হইবে। তোমার লজ্জাশীলতাও আছে, ভাল কুলেও জন্মগ্রহণ করিয়াছ, শাস্ত্রজ্ঞও বট, অনৃশংস হইয়া পিতা মাতার শাসনে অবস্থান কর। তোমার পিতা, শান্তি হউক, ইচ্ছা করেন। যে সময়ে আপদ্ উপস্থিত, সে সময়ে পিতার শাসন স্মরণ করা সমুচিত। তোমার পিতা এবং তাঁহার অমাত্যবর্গের অভিরুচি এই যে, পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলন হয়; তোমারও এই প্রকার অভিরুচি হউক। সুহৃদ্গণের অনুশাসন শুনিয়াও, যে ব্যক্তি তাহা অবলম্বন না করে, পরিণামে ভক্ষিত মাকাল ফলের ন্যায় এই উপেক্ষা তাহাকে দহন করে। মঙ্গলকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মোহবশতঃ যে তাহার অনুসরণ করে না, তাহার এই গতিক্রিয়াজন্য মহাক্ষতি হয়, এবং পরে তাহাকে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হয়। আপনার মত পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি মঙ্গলকর বাক্যের অনুসরণ করে, তাহার ইহলোকে সুখ বর্দ্ধিত হয়। অর্থলোভী ব্যক্তির বাক্যমধ্যে আত্মপ্রতিকূল ব্যাপার আছে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, যে জন সেই প্রতিকূল বিষয়ই শোনে, সে শত্রুর বশতাপন্ন হয়। সজ্জনগণের মত অতিক্রম করিয়া, যে ব্যক্তি অসজ্জনগণের মতে চলে, অচিরাৎ বিপদে নিপতিত হইয়া, তাহার সুহৃদ্গণের সে মহাশোকের কারণ হয়। মুখ্য অমাত্যগণকে ছাড়িয়া, যে ব্যক্তি হীন লোকদিগের অনুসরণ করে, সে ঘোর আপদে পড়িয়া, আর তাহা হইতে উদ্ধার পায় না। যে ব্যক্তি অসজ্জনের সেবা করে, মিথ্যাচারনিরত এবং সজ্জন সুহৃদ্বর্গের কথা শোনে না, আপনার লোককে দ্বেষ করে এবং যাহারা আপনার নয়, তাহাদিগকে গ্রহণ করে, তাহাকে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। তুমি সেই বীর পাণ্ডবগণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া, যাহারা অশিষ্ট, অসমর্থ ও মূঢ়, তাহাদিগের হইতে তোমার পরিত্রাণ হইবে, ইচ্ছা কর। পৃথিবীতে তোমা ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে, যে ইন্দ্রসম মহাবল জ্ঞাতিগণকে অতিক্রম করিয়া, অন্যের নিকটে ত্রাণপ্রার্থী হয়। জন্ম হইতে কুন্তীপুত্রগণের প্রতি নিত্য কত অত্যাচার করিয়াছ; তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, এজন্য তাঁহারা কদাপি তোমার প্রতি অপচার করেন নাই। তোমারও সেই মুখ্য বন্ধুগণের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করা উচিত। প্রাজ্ঞেরা যাহার অনুষ্ঠান করেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এ তিনই অবস্থিতি করে। যে স্থলে এ তিনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ এ দুই অভিলাষ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম,

অর্থ ও কাম, এ তিন্ যেথানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত, একের সঙ্গে আর একটির মিল নাই, সে স্থলে পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মই অভিলাষ করিয়া থাকেন ; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি কলহের হেতু অর্থ ও কামকেই চাহিয়া থাকে। (ম-ভা, উ-প, ১২৩অ, ৩৪—৩৫ শ্লোক) প্রাকৃত জন ইন্দ্রিয়প্ররোচনায় লোভবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এবং অনুচিত উপায়ে কাম ও অর্থ চায়। তাহাদের অগ্রে ধর্ম্মই আচরণ করা উচিত, অর্থ ও কাম কদাপি ধর্ম্ম ছাড়া হইতে পারে না। ত্রিবর্গসাধনে ধর্ম্মই উপায়। শুষ্ক তৃণেতে যে প্রকার অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার সেই ধর্ম্মে ত্রিবর্গ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাত, তুমি অনুচিত উপায়ে সমুদায় রাজগণমধ্যে প্রখ্যাত দীপ্যমান অধিরাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যাঁহারা সাধুপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যে ব্যক্তি মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি, কুঠারযোগে যে প্রকার বন ছিন্ন হয়, তেমনি আপনাকে আপনি শাসনাধীন করে। যে ব্যক্তির পরাভব আকাঙ্ক্ষণীয় নয়, তাহার বুদ্ধি যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেইরূপ করা সমুচিত ; কেন না বিচ্ছিন্ন না হইলে, বুদ্ধি সর্ব্বদা কল্যাণে স্থিতি করে। আত্মবান্ ব্যক্তি তিন লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিরও অবমাননা করেন না, পাণ্ডবগণের কথাতো বলিতেই হয় না। ক্রোধের বশীভূত হইয়া মনুষ্য কিছুই বুঝিতে পারে না, অতিসুস্পষ্ট প্রমাণও তখন অগ্রাহ্য করে। তাত, তোমার দুর্জ্জনসঙ্গাপেক্ষা পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলিত হওয়া শ্রেয়স্কর। তাহাদের সঙ্গে প্রীতিবন্ধন হইলে, তুমি সমুদায় কামনার বিষয় লাভ করিবে। পাণ্ডবেরা যে ভূমি জয় করিয়াছে, এখন তাহা ভোগ করিতেছ ; আর তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, অন্যের নিকটে রক্ষা আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, এদের ক্ষমতায় ভূমিভোগ করিবে ; জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ, বিক্রম, কিছুতেই ইহারা পাণ্ডবগণের প্রতিযোগিতায় পর্য্যাপ্ত নহে। ইহারা যদি সকল রাজার সঙ্গে একত্র মিলিত হয়, তথাপি সমরে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। এইতো সমুদায় পার্থিব বল সমুপস্থিত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ততনয়, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ সকলেই আছেন। ইঁহারা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ক্ষমবান্ নহেন। সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য কেহই সমরে তাহাকে জয় করিতে পারে না। তাই বলি, যুদ্ধে চিত্তস্থাপন করিও না। এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির কর, যে অর্জ্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া,

কুশলে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে। এতগুলি জনক্ষয় করিয়া প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি জয় করিলে তোমার জয় হইবে, এমন এক জন লোক বাহির কর। যে পাণ্ডুতনয় খাণ্ডবপ্রস্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ সকলকে পরাজিত করিয়াছিল, কে তাহার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইবে? বিরাটনগরে সে একাই তোমাদের বহু জনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, এই এক নিদর্শনই পর্য্যাপ্ত। যুদ্ধে যে সাক্ষাৎ শিবকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, সেই অজেয় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবে, মনে করিয়াছ? এমন কে আছে যে, আমি যাহার সারথি, তাহাকে সমরার্থ আহ্বান করিতে পারে? অর্জ্জুন সাক্ষাৎ পুরন্দর, সে পৃথিবীকে উৎখাত করিতে পারে, ক্রোধে সমুদায় প্রজাকে দহন করিতে পারে, স্বর্গ হইতে দেবগণকে ভূতলে পাতিত করিতে পারে। দেখ, এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ, যে এই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, স্বজন, আত্মীয় যেন তোমার জন্য না মরে। কৌরবকুল থাকিয়া যাউক, এ কুলের যেন উচ্ছেদ না হয়। তোমায় যেন কেহ কুলঘ্ন না বলে, তোমার যেন অকীর্ত্তি না হয়। মহারথ পাণ্ডবগণ তোমাকেই যৌবরাজ্যে স্থাপন করিবে। পিতা ধৃতরাষ্ট্রনৃপতির নিকটে মহাসম্পত্তি আসিতে উদ্যত, তুমি এই সম্পত্তির অবমাননা করিও না। পার্থগণকে অর্থসম্পত্তি দান করিলে, তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সুহৃদ্গণের কথারক্ষা করিয়া, মিত্রগণের প্রীতিভাজন হইয়া, তুমি চিরকল্যাণ লাভ করিবে।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়া, কৃতকার্য্য হইলেন না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শান্তির জন্য বলিতে লাগিলেন, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া, দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বিচার করিয়া বলা উচিত। আপনিও আমাকেই নিন্দা করিতেছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ইঁহারাও আমাকেই নিন্দা করিতেছেন। আমি যে কি অন্যায় করিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবেরা রাজ্য হারিল, তাহাতে আমার অপরাধ কি? বিনাপরাধে পাণ্ডবেরা কুরুকুল সৃঞ্জয়কুলের উচ্ছেদে সমুদ্যত। আমরা ভয় পাইয়া কখন প্রণত হইব না। যদি পাণ্ডবগণ অপরাজেয়ই হয়, যুদ্ধে না হয় আমরা মরিব, তাহাতেতো আমাদের স্বর্গলাভ হইবে। ক্ষত্রিয় হইয়া আমি কখন কাহারও নিকটে প্রণত

হইতে পারি না। আমার পিতা তাহাদিগকে রাজ্যাংশ দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তাহারা কখন রাজ্যাংশলাভ করিবে না। তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রে যত টুকু ভূমি বিদ্ধ করিতে পারা যায়, তত টুকুও আমরা পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া দিব না *।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া হাসিলেন, এবং ক্রুদ্ধনয়নে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, তুমি বীরশয়ন অভিলাষ করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে। মহাসংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে, একটু স্থির হও। পাণ্ডবগণের প্রতি আমি কোন অন্যায়াচরণ করি নাই, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এ যে তোমার মিথ্যা কথা, সকল নরপতিগণ বুঝুন। তুমি পাণ্ডবগণের সম্পদ্ দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়াছিলে, তাই শকুনির সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া দ্যূতক্রীড়া উপস্থিত করিয়াছিলে। তোমার যে জ্ঞাতিগণকে সাধুগণ সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কোন প্রকার শঠতা জানেন না, শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ উপস্থিত করিবার জন্য কেন এ কুমন্ত্রণা করিলে? দ্যূতক্রীড়ায় সাধুগণের মতিভ্রংশ হয়, অসাধুগণের মধ্যে বিচ্ছেদ বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া, অরিষ্ট করিবার অভিলাষে, দ্যূতক্রীড়াযোগে তুমি এই মহাবিপদ্ উপস্থিত করিয়াছ। প্রকাশ্যসভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়া, তুমি যেমন অপমানসূচক কথা বলিয়াছ, তোমা ছাড়া এমন আর কে আছে যে, ভ্রাতৃপত্নীর এরূপ অবমাননা করিতে পারে? পাণ্ডুতনয়গণের মহিষী সৎকুলজাতা চরিত্রসম্পন্না, প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা, তাঁকে কিনা এরূপ অবমাননা করিয়াছ? কুন্তীপুত্রগণ যখন বনে যাইতেছিলেন, তখন কুরুসভায় তাঁহাদিগকে দুঃশাসন কি বলিয়াছিল, কুরুগণ সকলেই জানেন। আত্মবন্ধুগণ মধ্যে যাঁহারা সাধুচরিত্র, লোভশূন্য এবং ধার্ম্মিক, কোন্ সাধুব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অন্যায়াচরণ করিতে পারে? নৃশংস অনার্য্য পুরুষেরা যেরূপ বলিয়া থাকে, তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন সেরূপ অনেক কথা বলিয়াছ। বারণাবতে মার সঙ্গে অল্পবয়স্ক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলে, তোমার সে যত্ন

---

* যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১২৭ অ, ২৬ শ্লোক।

সিদ্ধ হয় নাই। সে সময়ে পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণগৃহে বহুকাল প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিয়াছিলেন। বিষ পান করাইয়া, সর্পবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, পাণ্ডবগণকে মারিয়া ফেলিতে যত্ন করিয়াছ; তবে সে যত্ন তোমার সিদ্ধ হয় নাই, এইমাত্র। সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার এইরূপ বুদ্ধি, এইরূপ অসদাচরণ, অথচ তাঁহাদিগের প্রতি তোমার কোন অপরাধ নাই, এ কেমন কথা? তাঁহারা পিত্রংশ চাহিতেছেন, তোমার দিবার ইচ্ছা নাই। ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, সেই রাজ্যাংশ দিতে হইবে। পাণ্ডবগণের প্রতি নৃশংসের ন্যায় বহু অন্যায় কার্য্য করিয়া, আজ তাহা অস্বীকার করিতেছ। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, মাতা পিতা সকলেই শান্ত হইতে বলিতেছেন; তথাপি তোমার শান্তিতে প্রবৃত্তি নাই। শান্তিতে তোমারও লাভ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও লাভ, তাতে তোমার রুচি নাই; অল্পবুদ্ধিতাভিন্ন এ আর কি? সুহৃদ্‌গণের বচন অতিক্রম করিয়া সুখ হইবে না, কেবল অধর্ম্ম ও অযশ হইবে।

দুর্য্যোধন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া এবং দুঃশাসন কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া, ক্রোধে সভা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, অমাত্যগণ ও রাজগণ তাহার অনুগমন করিলেন। এতদ্দর্শনে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বিসংবাদ অনুমোদন করে, অচিরে তাহার বিপদে শত্রুগণ উপহাস করে। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় উপায় বুঝে না, মিথ্যাভিমানী, কেবল রাজ্যের জন্য ক্রোধলোভের বশবর্ত্তী। সমুদায় ক্ষত্রগণের কাল উপস্থিত, তাই মোহবশতঃ রাজগণ ও মন্ত্রিবর্গ ইহার অনুসরণ করিতেছে। ভীষ্মের উক্তি শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দুর্য্যোধনের প্রভুত্ব নিয়মিত না করাতে, আমি দেখিতেছি, সমুদায় কুরুবৃদ্ধগণের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতেছে। এ সময়ের উপযোগী কি করিলে, কল্যাণ হইতে পারে, বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, হিতের জন্য আমি যাহা বলিতেছি, আপনাদের যদি রুচি হয়, অনুসরণ করিতে পারেন। বৃদ্ধ ভোজরাজ জীবিত থাকিতেই, দুরাচার কংস পিতার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মাকে তাহার সকল বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমি সমরে তাহাকে বধ করি। আমরা পুনরায় সকলে উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। কুলের কুশলের জন্য এক কংসকে পরিত্যাগ

করিয়া, অন্ধক বৃষ্ণিরা এখন সুখে কালযাপন করিতেছেন। পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রজাপতি দেখিলেন, এ যুদ্ধে দেবাসুরমনুষ্যগন্ধর্ব্বাদি সকলে পরস্পরকে হনন করিবে; অতএব অসুরগণকে বদ্ধ করিয়া, বরুণকে সমুদায় অর্পণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই বলি, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে অবরোধ করিয়া, পাণ্ডবগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য দান করা হউক। কুলের জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামের জন্য কুলত্যাগ করিবে। (ম-ভা, উ-প, ১২৭অ, ৪৯শ্লোক) রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বদ্ধ করিয়া, পাণ্ডবগণের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করিলে, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ উপস্থিত হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে শীঘ্র গান্ধারীকে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। দেবী গান্ধারী আসিয়া পুত্রকে বহুপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। দুর্য্যোধন ক্রোধভরে সভা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত এই পরামর্শ করিল যে, তাহাদিগকে বদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, বলপূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাহারা বদ্ধ করিবে। কৃষ্ণকে বদ্ধ করিলে, পাণ্ডবগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। কেন না এই কৃষ্ণই তাহাদিগের 'শর্ম্ম' 'বর্ম্ম' সকলই। বুদ্ধিমান্ সাত্যকি দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুশ্চেষ্টা বুঝিতে পারিলেন। তিনি হার্দ্দিক্যসহকারে বাহিরে আসিয়া, কৃতবর্ম্মাকে সজ্জিত হইয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতে বলিলেন এবং আপনি সভাস্থলে গিয়া দুরাত্মাদিগের অভিপ্রায় প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে, তৎপর ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে জ্ঞাপন করিলেন। বিদুর এই কথা শ্রবণ করিয়া, যাহাতে ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের বিনাশ না হয়, তাহার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদুরের বাক্যশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া, সুহৃদগণের শ্রবণগোচরে বলিলেন, ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যদি আমায় নিগ্রহ করে, আমাকে ইহারা বা আমি ইহাদিগকে নিগ্রহ করিতে পারি, আপনি এ বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝুন। ইহারা যদি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত হয়, আমি একাই ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে উৎসুক। আমি কখন নিন্দিত পাপ কার্য্য করিব না। পাণ্ডবগণের অর্থে লোভ করিয়া, আপনার পুত্রগণের নিজ অর্থই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহারা যদি আমায় নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে যুধিষ্ঠির কৃতকার্য্য হন; কেন না আজই আমি

ইহাদিগকে সানুচর নিগ্রহ করিয়া, পার্থগণকে সমুদায় দিতে পারি, ইহা কিছু দুষ্কর কার্য্য নহে। তবে এরূপ ক্রোধসম্ভূত পাপবুদ্ধিপ্রণোদিত নিন্দিত কার্য্যে আমি কখন প্রবৃত্ত হইব না। দুর্য্যোধন যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই হউক ; কিন্তু এ সমুদায় অনীতির হেতু আমি আপনাকেই মনে করিব।

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহামতি বিদুরকে সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। দুর্য্যোধন সমাগত হইলে, তিনি তাহাকে যথোচিত ভৎ'সনা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার তাহার সামর্থ্য নাই, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বিদুর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, তাহাকে ঈদৃশ দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে শ্রীকৃষ্ণ নৃপতি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, দুর্য্যোধন, তুমি যে মোহবশতঃ আমায় একা মনে করিতেছ, এবং ভাবিয়াছ, আমায় পরাভব করিয়া যুদ্ধ করিবে, সে তোমার ভুল। জানিও, এখানে পাণ্ডবেরা আছেন, অন্ধকবৃষ্ণিগণ আছেন, এমন কি ঋষি, রুদ্র ও বসুগণ এখানে বর্ত্তমান। এই বলিয়া, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবগণ অগ্নিশিখা বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, ভুজে লোকপালগণ, মুখে অগ্নি প্রকাশ পাইলেন। আদিত্য, সাধ্য, বসু, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় প্রাদুর্ভূত হইয়া, দক্ষিণে অর্জ্জুন, বামে বলদেব, ভীম যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব পৃষ্ঠদেশে, সম্মুখে অন্ধক বৃষ্ণি প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। কৃষ্ণের চক্ষু হইতে, কর্ণ হইতে সধূম অগ্নিশিখা এবং রোমকূপসকল হইতে সূর্য্যকিরণ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার এই ঘোর রূপ দর্শন করিয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণ বিনা সকল রাজগণ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কথিত আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সেই সময়ের জন্য চক্ষু লাভ করিয়া, এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (ম-ভা, উ-প, ১৩০অ, ৩—১৫ শ্লোক) *।

* এইরূপ অলৌকিক ঘটনা ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে, এখনকার পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষায় নির্ণয় করিতেছেন। এরূপ ঘটিবার কারণ আজ পর্য্যন্ত এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহির হইতে বস্তুর প্রতিকৃতি সমুদায় চক্ষুর স্নায়ুযোগে অভ্যন্তরে নীত হয় এবং সেই সকলে মস্তিষ্কের ভাগদ্বয়ের সম্মুখভাগ উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনায় বস্তুর রূপ

কিছুক্ষণ পরে তিনি এই অলৌকিক মূর্ত্তি প্রত্যাহার করিয়া, সাত্যকি ও হার্দ্দিক্যের হস্তধারণ করিয়া, সভা হইতে বহির্গত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় করিয়া বলিলেন, তাঁহার কোন অপরাধ বা পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। তাঁহার সম্মুখেই তিনি শান্তির জন্য যত্ন করিলেন, তাঁহার পুত্র কিছুতেই শাসন গ্রহণ করিল না, তিনি কি করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে বহির্গত হইয়া, কুন্তীদেবীর নিকটে গমন করিলেন। সেখান হইতে যাইবার বেলা তিনি কর্ণকে রথে তুলিয়া লইয়া যান। কর্ণকে তিনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া বলেন, ধর্ম্মতঃ তিনি পাণ্ডুতনয়। তিনি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হউন। তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সৌভ্রাত্র উপস্থিত হউক, ইহাতে মিত্রগণ আনন্দিত হইবেন, শত্রুগণ মর্ম্মব্যথা পাইবে।

মন পরিগ্রহ করিয়া থাকে। যদি কোন কারণে অগ্রে মস্তিষ্কের সেই ভাগ উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে যে প্রণালী দিয়া বাহির হইতে বস্তুর প্রতিকৃতি ভিতরে যায়, সেই প্রণালী দিয়া ভিতরের প্রতিকৃতি বাহিরে আসিয়া রূপবত্তা লাভ করে, ইহাকেই "দৃষ্টিভ্রান্তি" বলিয়া থাকে। কোন এক জনের প্রবল ইচ্ছা ইথরকে আন্দোলিত করিয়া সঞ্চরণপূর্ব্বক অপরের মস্তিষ্কভাগ গূঢ়ভাবে উত্তেজিত করিয়া দেয়, সেই উত্তেজনায় যে ব্যক্তির ইচ্ছা উত্তেজিত করিল, তাহার ইচ্ছানুরূপ বিষয়ের প্রতিকৃতিসমুদায় অপরের মস্তিষ্কভাগে সমুপস্থিত হয় এবং তাহা ইন্দ্রিয়নালী দিয়া বাহিরে আসিয়া সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া, দুর্য্যোধনের মনে তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। মায়া, ইন্দ্রজাল অথবা কুহক বিনা আর কি উচ্চ-ভাবে সে এই ব্যাপারকে গ্রহণ করিতে পারে? যুদ্ধসংবাদ যখন সে পাঠায়, তখন সে এই বলিয়া উপহাস করে :—

"সভামধ্যে চ যদ্রূপং মায়য়া কৃতবানসি।
তত্তথৈব পুনঃ কৃত্বা সার্জ্জুনো মামভিদ্রব॥"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৫৯ অ, ৫৪ শ্লোক।

মায়া ইন্দ্রজালাদি যোদ্ধার নিকটে কখন দাঁড়াইতে পারে না, এই বলিয়া সে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে :—

"ন মায়া হীন্দ্রজালং বা কুহকা বাপি ভীষণাঃ।
আত্তশস্ত্রস্য সংগ্রামে বহন্তি প্রতিগর্জ্জনাঃ॥"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৫৯ অ, ১১৯—২০ শ্লোক।

কর্ণ এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথার উত্তর দিলেন, যদিও তিনি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুতনয়, তথাপি মাতা রাধার যখন স্নেহবশতঃ স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হইয়াছিল, এবং সেই স্তন্যপান করিয়া তিনি প্রতিপালিত হইয়াছেন, এবং স্বয়ং রাধা তাঁহার মূত্র-পুরীষ পরিষ্কার করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার পিণ্ডচ্ছেদ * কিছুতেই করিতে পারেন না। ত্রয়োদশ বৎসর তিনি দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন, অর্জ্জুনের প্রতিযোগিরূপে বৃত হইয়াছেন; এখন তিনি কি প্রকারে দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ জানিয়া, কখন রাজ্যগ্রহণ করিবেন না; কিন্তু তিনি আপনি যদি রাজ্য পান, তাহা হইলে দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিবেন। তবে তিনি জানেন, এই রণযজ্ঞে তাঁহারা সকলে হত হইবেন, কিন্তু এইরূপে হত হওয়াই শ্রেয়ঃ। কেন না কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্রে সম্মুখসংগ্রামে মৃত্যু স্বর্গলোকে গমনের জন্য হইবে। পুনরায় কথোপকথনেও যখন কর্ণের মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণ বলিলেন, বুঝিলাম, আজ পৃথিবীর বিনাশ উপস্থিত, তাই আমার হিতবাক্য তোমার হৃদয়স্পর্শ করিল না। সকলের বিনাশ যখন উপস্থিত হয়, তখন অনীতিও নীতি বলিয়া প্রতিভাত হয়, হৃদয় হইতে সে অনীতি কিছুতেই অপনীত হয় না। কর্ণ উত্তর দিলেন, যদি বিনাশ হইতে রক্ষা পাই, পুনরায়, কৃষ্ণ, তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। যদি মৃত্যু হয়, স্বর্গে তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। এই বলিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, স্বরথে তিনি প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। যখন শান্তি আর কোন উপায়ে হইল না, তখন সমরই নিশ্চয় হইল।

সৈন্যদর্শন

কুরু ও পাণ্ডবসৈন্য যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। দুর্য্যোধনপক্ষে ভীষ্ম এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতিপদে বৃত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

---

* মৎস্নেহাদেব রাধায়াঃ সদ্যঃ ক্ষীরমবাতরৎ।
সা মে মূত্রং পুরীষঞ্চ প্রতিজগ্রাহ মাধব॥
তস্যাঃ পিণ্ডব্যপনয়নং কুর্য্যাদস্মদ্বিধঃ কথম্।

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৪০অ, ৬—৭ শ্লোক।

প্রোৎসাহিত করিয়া বলিলেন, ভীষ্মসমানীত সৈন্যনিচয়কে বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রথম সংগ্রামে সমুদ্যত, সংগ্রামাধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীকে স্তব কর। তাঁহার উপদেশানুসারে তিনি দুর্গার স্তব করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন রণোদ্যত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে উভয়সেনামধ্যে এই জন্য রথস্থাপন করিতে বলিলেন যে, যুদ্ধার্থ কাহারা সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এক বার তিনি অবলোকন করিতে পারেন। তিনি ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রভৃতি গুরুজন এবং আত্মীয়-স্বজন-পৌত্র-ভ্রাতা-মাতুল-প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া, শোকাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, যুদ্ধোদ্যত আত্মীয় স্বজনগণকে দেখিয়া, আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইতেছে। আমার শরীরে কম্প উপস্থিত, আমার হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। আর আমি এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, আমার মন আপনাতে আপনি নাই। যুদ্ধে স্বজনবর্গকে বধ করিয়া, কি শ্রেয়োলাভ হইবে? আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ, তাহারাই যদি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল, তবে সে রাজ্য দিয়াই বা প্রয়োজন কি, ভোগ দিয়াই বা প্রয়োজন কি, জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আচার্য্যপ্রভৃতিকে বধ করিয়া, যদি ত্রৈলোক্যলাভ হয়, তাহাও আকাঙ্ক্ষা করি না, সামান্য পৃথিবীর কথা তো দূরে। ইঁহাদিগকে বধ করিয়া, কখন সুখী হইতে পারিব না, কেবল পাপভাজন হইব। আমি দেখিতেছি, এই যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, কুলক্ষয় হইলে কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, কুলস্ত্রীরা দুশ্চরিত্রা হইবে। তাহারা ভ্রষ্টা হইলে, বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইবে। বর্ণসঙ্কর হইলে, পিতৃক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে। এই রূপে জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া, চিরকাল নরকে বাস হইবে। হায়, আমরা কি মহা পাপকর্ম্ম করিতেই উদ্যত হইয়াছি! আমি শস্ত্রত্যাগ করিলে, যদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমায় বধ করে, আমার পক্ষে তাহাই মঙ্গলকর।

সাংখ্যযোগ

অর্জ্জুনকে এইরূপে বিষাদগ্রস্ত অবলোকন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, সংগ্রাম উপস্থিত, এ সময়ে এ মোহ তোমার কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ইহা যে আর্য্যজনের অনুপযুক্ত, ইহাতে অকীর্ত্তি হইবে, স্বর্গভ্রষ্ট হইবে। তোমাতে এরূপ অপুরুষত্ব শোভা পায় না। ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া

উঠ। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, ভীষ্ম দ্রোণ ইঁহারা আমার গুরুজন, পূজার্হ; সমরে ইঁহাদিগের শরীরে কি প্রকারে অস্ত্রপাত করিব? আমি কি গুরুজনের শোণিতদিগ্ধ ভোগ্যসামগ্রী ভোগ করিব? জয় ও পরাজয় এ দুইয়ের কোন্‌টি শ্রেয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সম্মুখে সেই সকল ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা উপস্থিত। আমি একান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছি, ধর্ম্ম কি, আমি এখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; এখন কর্ত্তব্য কি, বলুন। আমি আপনার শিষ্য, শরণাপন্ন হইতেছি, আমায় উপদেশ দিন। আমার যে শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি দেখিতেছি, সমগ্র পৃথিবী এবং দেবগণের রাজ্যলাভ করিলেও, সে শোক অপনীত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহাদিগের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ। যাহারা মরিয়াছে, অথবা যাহারা মরে নাই, তাহাদিগের কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। আমি কখন ছিলাম না, তা নয়; তুমি ছিলে না, তা নয়; এই রাজন্যবর্গ ছিল না, তা নয়; ইহার পর আমরা সকলে থাকিব না, তা নয়। কৌমার, যৌবন, জরা এ সকল যেমন দেহীর দেহের, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনই। সুতরাং ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ উপস্থিত হয়, এগুলি আসে, আর চলিয়া যায়, একান্ত অনিত্য; তাই, হে ভারত, এ সকলকে সহিষ্ণুতার সহিত বহন কর। যে ধীর ব্যক্তিকে এগুলি (শীতোষ্ণাদি) ব্যথিত করিতে পারে না, সুখ দুঃখে সমানভাবে থাকেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহা অসৎ, তাহা থাকে না, যাহা সৎ, তাহার কখন অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শিগণ সৎ অসৎ এ দুইয়ের চরম দেখিয়াছেন। দেহী সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে অবিনাশী জান; এই অক্ষয় দেহীকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। শরীরী নিত্য, ইহার এই সকল শরীর বিনাশশীল। শরীরী যখন অবিনাশী ও অপ্রমেয়, তখন যুদ্ধ কর। যে মনে করে যে, শরীরীকে হনন করিল, যে মনে করে যে শরীরী হত হইল, সে দুই জন কিছুই জানে না; কেন না, এ হতও হয় না, হননও করে না। শরীরী কখন জন্মেও না, এক বার হইয়া আবার হয়ও না। ইহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি নাই, শরীর বধ

করিলে ইহার কখন বধ হয় না। যে ব্যক্তি শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম-ও-ক্ষয়বিরহিত বলিয়া জানে, সে কেমন করিয়া, হে পার্থ, কাহাকেও বধ করে বা বধ করায়। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া, অপর নবীন দেহ প্রাপ্ত হয়। শস্ত্রও ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নিও ইহাকে দগ্ধ করে না, জলও ইহাকে আর্দ্র করে না, বায়ুও ইহাকে শোষণ করে না; কেন না, ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্যকাল এ একরূপ থাকে, স্থিরস্বভাব, অবিনাশী, সর্ব্বগত, চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য, কোনরূপে বিকারগ্রস্ত হয় না, এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। দেহীর এরূপ স্বভাব জানিয়া, তোমার কখন শোক করা উচিত নয়। হে মহাবাহু, যদি মনে কর, আত্মার নিত্য জন্ম আছে, নিত্য মৃত্যু আছে, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নয়। কেন না যাহার জন্ম আছে, তাহারই নিশ্চয় মৃত্যু আছে ; যাহার মৃত্যু আছে, তাহার নিশ্চয় জন্ম আছে। জন্ম মৃত্যু যখন এইরূপে অপরিহার্য্য হইল, তখন তাহার জন্য তোমার শোক শোভা পায় না। আগে শরীর ছিল না, শরীরের কারণ মাত্র ছিল, পরে মাঝে শরীর হইল, হইয়া পুনরায় কারণে বিলীন হইয়া গেল ; এরূপ অবস্থায়, বল, তজ্জন্য শোক কেন? লোকে দেহীর কথা শুনিয়াও উহাকে বুঝিতে পারে না, অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে *। কেন না উহাকে অদ্ভুত বলিয়া দেখে, অদ্ভুত বলিয়া উহার কথা বলে, অদ্ভুত বলিয়া উহার কথা শোনে। সকলের দেহস্থিত এই দেহী নিত্য অবধ্য, সুতরাং সকল প্রাণীরই জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। আর এক দিকে স্বধর্ম্ম জানিয়া তোমার যুদ্ধত্যাগ সমুচিত নহে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা আর কিছু শ্রেয় নাই। এই যুদ্ধব্যাপার আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়গণ এরূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ তুমি না কর, স্বধর্ম্মত্যাগ ও কীর্ত্তিত্যাগ জন্য তোমার পাপ হইবে ; লোকেরা তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অধিক। যে সকল মহারথ উপস্থিত, তাঁহারা মনে

---

* প্রচলিত মর্ম্ম হইতে এখানে মর্ম্মের একটু ব্যতিক্রম করিতে হইল। কেন না এরূপ মর্ম্মের ব্যতিক্রম না করিলে, "যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, তাহাদের মধ্যে কেউ আমায় তত্ত্বতঃ জানে" আচার্য্যের একথা সিদ্ধ হয় না।

করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে। যাঁহারা এখন তোমার সম্মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লঘু হইয়া পড়িবে। তোমার শত্রুরা কত অকথ্য কথা বলিবে, তোমার সামর্থ্যসম্বন্ধে কত নিন্দা করিবে; বল, ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় আছে? দেখ, যদি যুদ্ধে মর, স্বর্গে যাইবে; যদি জয়লাভ কর, পৃথিবীভোগ করিবে; তাই বলি, যুদ্ধ করিবে, স্থির করিয়া উঠ। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান বিবেচনা করিয়া, যুদ্ধে নিযুক্ত হও; ইহা হইলে পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে না।

আত্মতত্ত্বে যে বুদ্ধি হয়, তোমায় বলিলাম। কর্ম্মযোগে কি বুদ্ধি হয়, শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, হে পার্থ, তুমি কর্ম্মবন্ধ সম্যক্ পরিহার করিবে। এই কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত বিষয় নিষ্ফল হয় না, কোন প্রকার প্রত্যবায় হয় না। এই ধর্ম্মের অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও, মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কর্ম্মযোগে ও জ্ঞানযোগে এক একান্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির একান্ত বুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধি বহু দিকে প্রসৃত হয়, বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বেদোক্ত কর্ম্মসকলের প্রশংসার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাহা ছাড়া আর যে কিছু আছে, তাহা বলে না। তাহারা কামনার বিষয় লইয়া ব্যস্ত, [ক্ষয়িষ্ণু] স্বর্গকেই পুরুষার্থ মনে করে। সুতরাং জন্ম, কর্ম্ম ও তৎফল দান করে বলিয়া, ভোগ-ও-ঐশ্বর্য্যলাভের প্রতি যে সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলের প্রশংসাসূচক সাজান কথাগুলি বেশ ভাল করিয়া বলিয়া থাকে। যাহাদিগের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্ত, তাহাদিগের চিত্ত সেই প্রশংসাবাক্যে অপহৃত হয়, তাই সমাধিতে * তাহাদিগের একান্ত বুদ্ধি হয় না। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্ভূত কর্ম্ম-সকল বেদ উপদেশ করে; হে অর্জ্জুন, তুমি এই তিন গুণের অতীত হও। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া, নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর; যাহা পাও নাই বা যাহা পাইয়াছ, তাহার জন্য ব্যাকুল না হইয়া, আপনাকে স্ববশে রাখ। অনেক স্বল্প জলাশয়ে যে কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাহ্রদে সে সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে; সমুদায় বেদে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় সে সমুদায়ই হয়। কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে নহে।

* "সমাধি"—ধ্যেয়পদার্থ সহ অভিন্নভাবে স্থিতি।

তুমি কর্ম্মফলের কারণ * হইও না; কর্ম্ম না করিবার পক্ষেও যেন তোমার অভিনিবেশ না হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া, হে ধনঞ্জয়, কামনা-পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বকেই যোগ † বলিয়া থাকে। বুদ্ধিযোগাপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাহারা ফলের কারণ হয়, তাহারা অতি কৃপাপাত্র। কর্ম্ম করিয়াও বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ই পরিহার করে। সে জন্য যোগযুক্ত হও, যোগ কর্ম্মে কৌশল ‡। বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্ম্মজন্য ফল পরিত্যাগ করিয়া, জন্ম ও বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন, এবং অনাময় পদ লাভ করিয়া থাকেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহদুর্গ অতিক্রম করিবে, তখন শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে। নানা-প্রকার লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া, তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; সেই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন যোগ লাভ করিবে।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, যে সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রজ্ঞা স্থিরতালাভ করিয়াছে, তাঁহার লক্ষণ কি? যাঁহার বুদ্ধি স্থিরতালাভ করিয়াছে, তাঁহার চলা, বলা এবং পাওয়াই বা কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হে পার্থ, যখন মনোগত সমুদায়কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক সাধক আপনাতেই আপনি পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। দুঃখেতে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না,

---

* "কর্ম্মফলের কারণ"—কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি। স্বর্গাদির কারণ কামনা। সুতরাং যে ব্যক্তি কামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে স্বর্গাদি কর্ম্মফলের কারণ হয়। কর্ম্মফলের কারণ না হওয়ার অর্থ, নিষ্কাম হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান করা।

† "সমত্বকেই যোগ বলিয়া থাকে"—অবিচলিতভাবে মনের একেতে অবস্থিতি যোগ। যখন ফলের প্রতি বাসনাশূন্য হইয়া, কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন অনুষ্ঠিত কর্ম্মে ফল হইল বা না হইল, তৎপ্রতি মনের অবিকৃত ভাব থাকাতে, মনের সমতা বিনষ্ট হয় না। এই সমতা মনের একেতে অবিচলিতভাবে অবস্থিতির কারণ। সুতরাং কর্ম্মযোগে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েতে সমানভাবে স্থিতিকেই যোগ বলা হইয়াছে।

‡ "যোগ কর্ম্মে কৌশল"—কামনাপূর্ব্বক কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কর্ম্মফল স্বর্গাদিতে আসক্তিবশতঃ, কর্ম্ম জীবের বন্ধন হয়। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করিতেছে, অথচ তাহার ফলের প্রতি কোন কামনা নাই, সে কর্ম্ম করিয়াও করিতেছে না, ইহাতে তাহার চাতুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। কর্ম্মযোগ এই চাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুখেতেও যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তিভয়ক্রোধপরিশূন্য হইয়াছেন, যিনি নিয়ত মননশীল, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র যিনি মমতাশূন্য, শুভলাভ করিয়াও যিনি হৃষ্ট হয়েন না, অশুভলাভ করিয়াও যিনি দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কূর্ম্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যক্ প্রকারে [ভিতরে] আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাহার দেহীর [বাহিরে] ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু [ভিতরে] তৎপ্রতি অভিলাষের নিবৃত্তি হয় না, উহা বিষয়ের অতীত আত্মাকে [পরমেশ্বরকে] দর্শন করিলে নিবৃত্ত হয়। যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তিরও মন ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিয়া থাকে, উহারা একান্ত চাঞ্চল্যবর্দ্ধক। সমুদায় ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোগী ব্যক্তি একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া * অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে থাকে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষয়চিন্তা করিতে করিতে, মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষশূন্য হইয়া আত্মার বশীভূত হয়, তখন মনও বশীভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় ভোগ করিয়াও, যোগী প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রসন্নতা উপস্থিত হইলে, সমুদায় দুঃখ বিদূরিত হয়। যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহার বুদ্ধি

---

* আমায়—অন্তর্যামী ঈশ্বরেতে। পূর্ব্বকালের উপদেষ্টৃগণ উপদেশকালে ঈশ্বর সহ যোগে অভিন্ন হইয়া, উপদেশ দান করিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে "আমি" "আমার" "আমাতে" ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ করিতেন, তাহা স্বয়ং ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া। তাঁহারা নিজে দৃশ্যতঃ থাকিয়াও থাকিতেন না। কেবল শ্রীকৃষ্ণই যে উপদেশকালে এতদবস্থাপন্ন হইয়া উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে; উপদেষ্টৃমাত্রেই এইরূপে আপনাকে উড়াইয়া দিয়া; উপদিষ্টসন্নিধানে অহংশব্দযোগে ঈশ্বরকে আনয়ন করিয়াছেন। এই জন্যই বেদান্ত-সূত্রকারকে "উপদেশো বামদেববৎ" (১ অ, ১ পা, ৩০ সূত্র) এই বলিয়া একটি সূত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। "ন চ পরমাত্মা হরিরস্মদর্থো বোধ্যঃ" সেই পরমাত্মা হরি অস্মচ্ছব্দের অর্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকারগণও এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। এটি বিশেষরূপে পরে বিবৃত হইবে।

স্থিরতালাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে নাই, তাহার বুদ্ধি নাই, সে ধ্যানও করিতে পারে না। যে ধ্যান করিতে পারিল না, তাহার শান্তি হইবে কিরূপে? যে শান্ত হইতে পারিল না, তাহার সুখই বা কোথা হইতে হইবে? ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ে বিচরণ করে, তখন মন অবশভাবে যাহার অনুসরণ করে, তাহাই—বায়ু যে প্রকার জলস্থনৌকাকে, সেই প্রকার—প্রজ্ঞাকে হরণ করে। হে মহাবাহু, সে জন্যই বলি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে যে ব্যক্তি সর্ব্বথা নিগৃহীত করিয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদায় জীবের পক্ষে যাহা নিশা, তাহাতে সংযমী জাগ্রৎ থাকেন; যাহাতে জীবগণ জাগ্রৎ থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা। নদী-সকল সমুদ্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কখন বেলা উল্লঙ্ঘন করে না, পুনরায় নূতন জল আসিয়া উহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কামনার বিষয়-সমুদায় যাহাতে প্রবেশ করে (অথচ বিকারগ্রস্ত হয় না), সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে, ভোগকামনাশীল নহে। যে ব্যক্তি কামনার বিষয়-সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মম, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে। ইহাকেই ব্রহ্মে স্থিতি বলে, ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর মোহপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যু-কালেও ইহাতে স্থিতি করিয়া সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।

কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে কেন, হে কেশব, আমায় দারুণ কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ? তুমি ব্যামিশ্র * বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছ! দুইয়ের মধ্যে যেটিতে আমার শ্রেয়ো-লাভ হয়, সেইটি নিশ্চয় করিয়া বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাংখ্যগণের জ্ঞানযোগ, এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগভেদে ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) লাভ হয়, তাহা নহে; কর্ম্মার্পণেই যে সিদ্ধি হয়, তাহাও নহে। কেহ কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক গুণে সকলেই অবশ হইয়াও কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে † কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া, যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের

* ব্যামিশ্র—একবার কর্ম্মের প্রশংসা, একবার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া সন্দেহ উৎপাদন করাতে ব্যামিশ্র।

† বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বিষয়নিচয়কে ভাবে, সে অতি বিমূঢ়চিত্ত, তাহাকে মিথ্যাচার বলা যায়। যে ব্যক্তি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে * সংযত করত, অনাসক্ত হইয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই বিশিষ্ট। নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিয়া, শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। যে কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ হয় না, সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, তুমি নিষ্কাম হইয়া, যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যজ্ঞের অধিকারী করিয়া, প্রজাগণকে সৃজনকরত, প্রজাপতি পূর্ব্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যজ্ঞ দ্বারা তোমাদের বংশবৃদ্ধি হউক, ইহা তোমাদিগকে অভীষ্ট দান করিবে। তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিলে, তাঁহারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া, পরম শ্রেয়োলাভ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া, দেবগণ তোমাদিগকে ইষ্টভোগ দান করিবেন। তাঁহারা যাহা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া, যে ব্যক্তি সে সমুদায় ভোগ করে, সে নিশ্চয় চোর। যে সকল সজ্জন ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে পাপাচারিগণ কেবল আপনাদের জন্য [অন্ন] পাক করে, তাহারা পাপ আহার করে। অন্ন হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেঘ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে হইয়া থাকে। কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন হয়, বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপ কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এ সংসারে যে ব্যক্তি এই চক্রের অনুবর্ত্তন করে না, তাহার আয়ু নিষ্ফল, সে কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আমোদলাভ করে, তাহার ব্যর্থ জীবনধারণ হয়। যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করিবার কিছু নাই। কর্ম্ম করিবারও তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সমুদায় ভূতমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার কোন প্রয়োজনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। সে জন্য অনাসক্ত হইয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞানে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকে। জনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা লোক-

* চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্—জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি।

দিগকে স্বকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা হইবে, ইহা দেখিয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান সমুচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর জনেরা তাহাই আচরণ করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন, লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই, অপ্রাপ্য পাইবার নাই, অথচ আমিও কর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকি। আমি যদি নিরলস হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করিতাম, সর্ব্বথা লোক সকল আমার পথানুসরণ করিত। আমি যদি কর্ম্ম না করি, লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যায়, আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হই, আমিই প্রজাদিগকে বিনাশ করি। অজ্ঞানিগণ আসক্ত হইয়া যে প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ লোকদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য, অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিবে। কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি যোগযুক্ত হইয়া, সমুদায়-কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইবে। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়; অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ততাবশতঃ, আমি করি, লোকে মনে করে। যিনি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ব জানেন, তিনি, গুণই গুণানুবর্ত্তন করিতেছে *, জানিয়া, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। মূর্খেরা প্রাকৃতিক গুণে বিমূঢ় হয় বলিয়া, গুণ ও তৎসম্ভূত ক্রিয়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহারা অসমগ্রদর্শী; যিনি সমগ্রদর্শী, তিনি তাহাদিগকে বিচলিত করিবেন না। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক, নিষ্কাম, নির্ম্মম এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। দোষদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয়। যাহারা দোষদর্শী হইয়া, আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ়। জানিও, তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, এরূপ স্থলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি করিবে? ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী।

---

* "গুণই গুণানুবর্ত্তন" করিতেছে—আত্মা ব্যতীত আর যাহা কিছু, সমুদায়ই প্রকৃতি-সমুৎপন্ন। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের আধার। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ প্রকৃতির গুণ হইতে সমুৎপন্ন। সুতরাং কারণ ও কার্য্যের অভিন্নতাবশতঃ গুণই গুণানুবর্ত্তন করিল। প্রথম গুণ ইন্দ্রিয়সমূহ, দ্বিতীয় গুণ তাহাদিগের বিষয়।

সাধক সেই অনুরাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না, কেন না উহারাই ইহার শত্রু। পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও, তদপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ। পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য ইচ্ছা না করিলেও, যেন কেহ বলপূর্ব্বক তাহাকে পাপে নিয়োগ করিয়া থাকে। বল, কাহার প্রেরণায় মানুষ পাপ করিয়া থাকে? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রজোগুণসম্ভূত এই কাম, এই ক্রোধ দুষ্পূর, মহাপাপ, ইহাকেই * শত্রু বলিয়া জান। ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি, মল দ্বারা যেমন দর্পণ, গর্ভাবেষ্টনচর্ম্মে যেরূপ গর্ভ আবৃত হয়, সেইরূপ এই জ্ঞান তদ্দ্বারা আবৃত। এই কামরূপ দুষ্পূর অনল নিত্যশত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানস্থান। এই সকল দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া, কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞাননাশী এই পাপকে সংহার কর। [দেহাদি হইতে] ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই দেহী। এইরূপে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ দেহীকে জানিয়া, আপনাকে আপনি নিশ্চল করতঃ, কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর।

কর্ম্মার্পণ ‡

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই অক্ষয় যোগ আমি আদিত্যকে বলিয়াছিলাম, আদিত্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। অনেক দিন গত হওয়াতে, এই যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা, তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন যোগ বলিলাম, এ উৎকৃষ্ট রহস্য। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্রে আদিত্যের উৎপত্তি, তদনন্তর তোমার জন্ম। আমি কি করিয়া জানিব যে, তুমি অগ্রে এই যোগ বলিয়াছিলে।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন. অর্জ্জুন, তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে।

---

* "ইহাকেই"—কাম ও ক্রোধ উভয়ই এক রজোগুণের বিকার, সুতরাং রজোগুণে ইহাদিগের একত্ব আছে, এজন্য কাম ও ক্রোধকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়া "ইহাকেই" বলা হইয়াছে।

‡ কর্ম্মার্পণ—কর্ম্মসংন্যাস। কর্ম্ম ঈশ্বরে ন্যস্ত করিয়া, আপনি কর্ম্মশূন্য হওয়া কর্ম্মসংন্যাস। কর্ম্মসংন্যাস সহজ ভাষায় কর্ম্মার্পণ।

সে সকল জন্মের কথা আমি জানি, তুমি জান না। আমি জন্মরহিত, অনশ্বর-স্বভাব, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও, আপনার প্রকৃতি অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপ আমার দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ যে ব্যক্তি জানে, তাহার দেহ-ত্যাগ করিয়া আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেকে আমায় আশ্রয়পূর্ব্বক, অনুরাগ-ভয়-ও-ক্রোধশূন্য, মদেকপরায়ণ এবং জ্ঞান ও তপস্যাযোগে পবিত্র হইয়া মদ্ভাবাপন্ন হয়। যে আমায় যে ভাবে অনুসরণ করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। যাহারা কর্ম্মজনিত সিদ্ধিলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা দেবতা যজনা করে, তাহাদিগের শীঘ্র মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হয়। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি, যদিও আমি সেই বিভাগের কর্ত্তা, তথাপি আমায় অকর্ত্তা এবং বিকাররহিত বলিয়া জান। কর্ম্ম-সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমায় এইরূপে জানে, সে কখন কর্ম্মে বদ্ধ হয় না। পূর্ব্বকালের মুমুক্ষু জনেরা এইরূপ জানিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও, পূর্ব্ব কালে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম কর। কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; সে জন্য তোমায় কর্ম্ম বলিতেছি, যাহা জানিয়া, তুমি অশুভ হইতে বিমুক্ত হইবে। (বিহিত) কর্ম্মেরও গতি বোঝা আবশ্যক, অবিহিত কর্ম্মেরও (বিকর্ম্মের) গতি বোঝা আবশ্যক, কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ম্ম করা হয় না (অকর্ম্ম), তাহারও গতি বোঝা আবশ্যক, কেন না কর্ম্মের গতি অতিদুর্ব্বোধ্য। কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে যে ব্যক্তি কর্ম্মদর্শন করে, মনুষ্যগণ মধ্যে সেই বুদ্ধিমান্, সেই যোগী, সেই সমগ্রকর্ম্মানুষ্ঠায়ী। যাহার সমুদায় অনুষ্ঠান কামনা-ও-সঙ্কল্পবর্জ্জিত, জ্ঞানাগ্নিযোগে যাহার সমুদয় কর্ম্ম, দগ্ধ হইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তিনি

কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, কিছুই করেন না। যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, সংযতদেহমনা, সকল প্রকারের পরিগ্রহশূন্য, তিনি কেবল শরীরসম্পর্কীয় কর্ম্ম করিয়া পাপভাজন হন না। যাহা আপনা হইতে আইসে, তাহাতেই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, সুখদুঃখাদির অতীত, মাৎসর্য্যশূন্য, সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, সে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তির আসক্তি নাই, যে ব্যক্তি মুক্ত এবং জ্ঞানেতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে, তাহার যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত সমুদায় কর্ম্ম বিলীন হয়। যদ্দ্বারা আহুতি দান করা হয়, তাহা ব্রহ্ম, যাহা আহুত হয়, তাহা ব্রহ্ম, ব্রহ্মকর্ত্তৃকই ব্রহ্মাগ্নিতে উহা আহুত হয়; এইরূপে ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে যাহার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে, সে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। কোন কোন যোগী দেবতা আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যজ্ঞকে উপায় করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞসমাধান করেন। কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন, কেহ কেহ শব্দাদিবিষয়নিচয়কে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন করেন। আর কেহ কেহ সমুদায় ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হবন করিয়া থাকেন। যত্নশীল ও তীক্ষ্ণব্রতধারী কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞ (দান), কেহ কেহ তপস্যাযজ্ঞ, কেহ কেহ যোগযজ্ঞ, কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানযজ্ঞ অবলম্বন করেন। কেহ কেহ অপানে প্রাণকে (রেচক), প্রাণে অপানকে (পূরক) হবনপূর্ব্বক, প্রাণ ও অপানের গতি অবরোধ করিয়া, (কুম্ভক) প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। অপরে আহার-সংযমপূর্ব্বক প্রাণকেই প্রাণেতে হবন করেন। ইঁহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ, যজ্ঞযোগে ইঁহাদিগের পাপ বিনষ্ট, ইঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজন করেন, ইঁহারা সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। হে কুরুসত্তম, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোকই হয় না, পরলোক কি প্রকারে হইবে? এইরূপ বেদবিহিত বহুবিধ যজ্ঞ আছে। সে সকলগুলিকে কর্ম্মজ বলিয়া জান, তুমি বিমুক্ত হইবে। হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয়। প্রণিপাত, প্রশ্ন, এবং সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় সেই জ্ঞানোপদেশ দিবেন, যে জ্ঞান জানিয়া আর তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইবে না, যে জ্ঞানে তুমি সমুদায় ভূতগণকে আপনাতে এবং আমাতে দর্শন করিবে। যদি সকল পাপী

হইতেও অতীব পাপকারী হও, তথাপি এক জ্ঞানপ্লবযোগে সর্ব্ববিধ পাপ তরিয়া যাইবে। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। এ সংসারে জ্ঞানসদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় এবং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করে। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। যোগে যে ব্যক্তি কর্ম্মার্পণ করিয়াছে, জ্ঞান দ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়াছে, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম কখন বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব, হে ভারত, অজ্ঞানসম্ভূত, আপনার হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞানাসিদ্বারা ছেদন করিয়া, যোগানুষ্ঠান কর, উঠ।

আত্মসংযম

অর্জ্জুন বলিলেন, কর্ম্মার্পণও বলিতেছ, আবার কর্ম্মযোগও বলিতেছ, এ দুইয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়, তাহাই আমায় নিশ্চিত করিয়া বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সংন্যাস (কর্ম্মার্পণ) ও কর্ম্মযোগ উভয়েতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এ দুইয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশেষ। হে মহাবাহু, তাহাকেই সংন্যাসী জানিবে, যে দ্বেষ করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না। সুখদুঃখাদির অতীত ঈদৃশ ব্যক্তিই সহজে বন্ধনবিমুক্ত হয়। বালকেরাই সাংখ্য * ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা বলেন না। এ দুইয়ের একটিকে সম্যক্ আশ্রয় করিলেও, (সাধক) উভয়েরই ফললাভ করে। সাংখ্য দ্বারা যে স্থান লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগদ্বারাও সেই স্থানলাভ হয়। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে যে ব্যক্তি এক দেখে, সেই দেখে। হে মহাবাহু, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিলে, সংন্যাসলাভ কষ্টকর; যোগযুক্ত ব্যক্তি মননশীল হইয়া, অচিরেই ইহা লাভ করিয়া থাকে। যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ হয়, আত্মা বিশুদ্ধ হইলে, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া পড়ে। সে সময়ে সে সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়া যায়। এ অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও, সে তাহাতে লিপ্ত হয় না। যোগযুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসত্যাগ, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, নেত্র-নিমীলন-উন্মীলন করিয়াও,

* সাংখ্য—সম্যক্ জ্ঞান। জ্ঞানজনিত কর্ম্মার্পণ বা সংন্যাস সাংখ্যশব্দে এখানে পরিগৃহীত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়-সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ানুবর্ত্তন করিতেছে, এইরূপ ধারণা করিয়া, আমি কিছু করিতেছি না, এরূপ মনে করে। ব্রহ্মেতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, যে ব্যক্তি আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জলের সঙ্গে পদ্মপত্র যে প্রকার লগ্ন হয় না, সেই প্রকার সে পাপে লিপ্ত হয় না। কায়, মন, বুদ্ধি এবং কেবল ইন্দ্রিয়যোগে আসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিগণ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, আত্যন্তিক শান্তি লাভ করিয়া থাকে। অযোগী জন কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। মনে মনে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ-করত, কিছুই না করিয়া, কিছুই না করাইয়া, দেহী এই নবদ্বারপুরে (দেহে) আত্মবশে সুখে স্থিতি করিতেছে। প্রভু (আত্মা) লোকসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বও সৃজন করেন না, কর্ম্মও সৃজন করেন না, কর্ম্মফলসংযোগও সৃজন করেন না, স্বভাবই (কর্ত্তৃত্বাদিরূপে) প্রবৃত্ত হয়। বিভু কাহাকেও পাপেও প্রবৃত্ত করেন না, সুকৃতেতেও প্রবৃত্ত করেন না ; অজ্ঞানদ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত, তাই তাহারা মোহপ্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের আত্মার অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের আদিত্যের ন্যায় জ্ঞান পরমজ্ঞানকে (ঈশ্বরকে) প্রকাশ করে। তাঁহাতে যাহাদিগের বুদ্ধি, তাঁহাতে যাহাদিগের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদিগের নিষ্ঠা, তিনিই যাহাদিগের পরমাশ্রয়, তাহাদিগের জ্ঞান দ্বারা পাপ বিদূরিত হয়, আর তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালকে, গো, হস্তী এবং কুক্কুরকে পণ্ডিতেরা সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের এই প্রকার সাম্যে মন অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসারজয় করেন। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সমভাবাপন্ন, তাই তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত। প্রিয় বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় বিষয় লাভ করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না ; ব্রহ্মবিৎ, স্থিরবুদ্ধি এবং অবিমুগ্ধ থাকিয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি করিবে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে যাহার চিত্ত অনাসক্ত, সে আত্মাতে যে সুখ, তাহাই লাভ করে ; ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সেই ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকে। বিষয়সম্ভূত ভোগ হইতে দুঃখই উৎপন্ন হয়, বিশেষ উহাদের আরম্ভ আছে, শেষ আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি কখন তাহাতে আমোদিত হন না। শরীরপরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহলোকেই যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের আবেগ সহ্য করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সমাহিত, সেই ব্যক্তি সুখী। যাহার অন্তরেই সুখ, অন্তরেই আরাম, অন্তরেই

জ্যোতি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত, এবং ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, দ্বৈধ ছিন্ন হইয়াছে, আত্মা সংযত হইয়াছে, সর্ব্বভূতের হিতে রত, সেই সকল সম্যগ্দর্শিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে। যাহারা কামক্রোধবিমুক্ত হইয়াছে, সংযতচিত্ত হইয়াছে, আত্মাকে জানিতে পাইয়াছে, তাহাদিগের (জীবন মরণ) দুই দিকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বিদ্যমান। বাহ্যবিষয়সমূহকে বাহিরে এবং চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া, নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান ও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করত, যে মননশীল মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছাভয়ক্রোধশূন্য হইয়াছে, সে নিরন্তর মুক্ত। আমি যজ্ঞ ও তপস্যার রক্ষক, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ, আমাকে জানিয়া শান্তি লাভ হয়।

ধ্যানযোগ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া, কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম করে, সেই সন্ন্যাসী, সেই যোগী; সে নিরগ্নি নয়, সে অক্রিয় নয়। যাহাকে সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) বলে, জানিও, তাহাকেই যোগ বলে; কেন না সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া, কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মননশীল ব্যক্তি যোগারূঢ় হইতে অভিলাষী, কর্ম্ম [তাহার যোগারোহণে] কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে নিবৃত্তি [জ্ঞানপরিপাকে] কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার যখন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে ও কর্ম্মেতে আসক্তি হয় না, তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। আপনাকে আপনি উদ্ধার করিবে, কখন আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিবে না। আপনি আপনার বন্ধু, আপনি আপনার শত্রু। যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে, সেই আপনি আপনার বন্ধু। যে আপনি আপনাকে জয় করিতে পারে নাই, সে শত্রুবৎ আপনি আপনার শত্রুত্বে দাঁড়ায়। যে আপনাকে জয় করিয়াছে ও প্রশান্ত হইয়াছে, তাহার আত্মা শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এবং মানাপমানে অবিচলিত থাকে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে চিত্ত পরিতৃপ্ত হওয়াতে যে যোগযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়। সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, পাপী, এ সকলেতে যে সমবুদ্ধি, সেই বিশিষ্ট। যোগী সতত নির্জ্জনে একাকী স্থিতি করিয়া, চিত্ত ও আত্মাকে সংযমপূর্ব্বক,

নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া আত্মসমাধান করিবে। শুচিদেশে আপনার নিশ্চল আসন স্থাপন করিবে। এই আসন অতি উচ্চ না হয়, অতি নীচ না হয়; অগ্রে কুশাসন, তদুপরি চর্ম্ম, তদুপরি চেলখণ্ড থাকিবে। চিত্ত-ও-ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সংযমপূর্ব্বক, মন একাগ্রকরত, সেই আসনে বসিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবে। [যোগার্থী] দেহ, মস্তক, গ্রীবা সোজা রাখিয়া নিশ্চলভাবে ধারণ করিবে, আর কোন দিকে না তাকাইয়া, স্থির হইয়া, নাসিকার অগ্র-ভাগ অবলোকন করিবে। প্রশান্তচিত্ত এবং ভয়শূন্য হইয়া, ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্ব্বক, মনঃসংযমকরত, মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইবে। সংযতমনা যোগী এইরূপে সর্ব্বদা আত্মসমাধানকরত, আমাতে স্থিতিরূপ নির্ব্বাণ-প্রধান শান্তি লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি অধিক আহার করে, তাহার যোগ হয় না; যে ব্যক্তি একান্ত অনাহারে থাকে, তাহারও যোগ হয় না; যে ব্যক্তি অধিক ঘুমায়, তাহারও যোগ হয় না; যে ব্যক্তি জাগিয়া থাকে, তাহারও যোগ হয় না। যে ব্যক্তি যথোপযুক্ত আহারবিহারে প্রবৃত্ত, যথোপযুক্ত কর্ম্মে চেষ্টাশীল, যথোপযুক্ত নিদ্রা-ও-জাগরণশীল, যোগ তাহারই দুঃখহরণ করে। যে সময়ে চিত্ত সংযত হইয়া আত্মাতেই স্থিতি করে, সমুদায় কামনার বিষয়ে সাধক নিস্পৃহ হয়, তখন যোগ হইয়াছে বলা যায়। যে যোগী ব্যক্তি চিত্তসংযমপূর্ব্বক আত্মসমাধান-যোগ অভ্যাস করে, তাহার সহিত সেই দীপের উপমা, যে দীপ নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিতির জন্য বিচলিত হয় না। তাহাকেই যোগ নামে অভিহিত বলিয়া জানিবে, যাহাতে যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হয়, এবং আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া আপনাতেই পরিতুষ্ট হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ, সাধক তাহাই উপলব্ধি করে এবং সেই সুখে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না। যাহা লাভ করিয়া, তদপেক্ষা আর অধিক লাভ কিছুই মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও আর বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, নিশ্চয় অক্ষুণ্ণচিত্তে সেই যোগ অভ্যাস করা সমুচিত। সঙ্কল্প হইতে কামনাসমূহ উপস্থিত হয়, সেই কামনাগুলিকে নিঃশেষরূপে পরিহার করিবে, এবং চারি-দিক হইতে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া, ধারণা দ্বারা বশীকৃত বুদ্ধি-যোগে মনকে আত্মাতে সংস্থাপনপূর্ব্বক, আস্তে আস্তে নিবৃত্ত হইবে, তখন আর

কিছুই চিন্তা করিবে না। অস্থির চঞ্চল মন যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করত, আত্মাতে বশ করিয়া রাখিবে। রজোগুণ নিবৃত্ত হইলে যোগীর মন প্রশান্ত হয়, মন প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত হইয়া, সে উত্তম সুখ লাভ করে। যোগী এইরূপে আত্মসমাধানকরত পাপশূন্য হয়, এবং সহজে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে, এবং আমাতে সমুদায় দেখে, তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না, সে আমার নিকটে অদর্শন হয় না। সর্ব্বভূতস্থ আমায় যে ব্যক্তি একত্বাবলম্বন করিয়া ভজনা করে, সে যে অবস্থায় থাকুক, সে যোগী আমাতে বর্ত্তমান। সুখদুঃখবিষয়ে আপনার যেমন [প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ], তেমনি আর সকলেতেও যে ব্যক্তি সমভাবে দেখে, সেই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন বলিলেন, [মনের] সাম্যাবস্থাজনিত যে যোগ তুমি বলিলে, চাঞ্চল্য-বশতঃ ইহার নিশ্চল স্থিতি আমি দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ক্ষোভকর, দৃঢ় ও সবল, বায়ুকে ধরিয়া রাখা যে প্রকার দুষ্কর, মনোনিগ্রহ করাও আমার নিকট সেইরূপ দুষ্কর মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কৌন্তেয়, মন চঞ্চল, তাহাকে নিগ্রহ করা সুকঠিন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই; তবে অভ্যাস-ও-বৈরাগ্যযোগে ইহাকে বশে আনা যাইতে পারে। যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই, আমার মতে যোগ তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। যাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, সে যত্ন করিলে এই উপায়ে যোগলাভ করিতে পারে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগারম্ভকরত, পশ্চাৎ শিথিলযত্ন হওয়াতে, যদি কেহ যোগ হইতে বিচলিতমনা হয়, তবে যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া, তাহার কি গতি হইয়া থাকে? সে কি [স্বর্গ ও মুক্তি] উভয়-বিভ্রষ্ট হইয়া আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়ে, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়? তুমি আমার এই সংশয় সর্ব্বথা ছেদন করিয়া দাও, তোমা বিনা সংশয়চ্ছেদন করে, এমন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে সে ব্যক্তির কোথাও বিনাশ নাই। হে তাত, যে ব্যক্তি কল্যাণানুষ্ঠান করে, সে কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

পুণ্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিয়া, সেখানে বহু বর্ষ বাসকরত, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের গৃহে জন্মে। লোকে ঈদৃশ জন্ম দুর্লভতর। হে কুরুনন্দন, এই জন্মে পূর্ব্ব দেহে যে বুদ্ধি ছিল, সে তাহা প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নশীল হয়। সে ব্যক্তি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ অবশভাবে যোগাভ্যাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগ জানিবার অভিলাষী হইয়াছে, সেও বেদ অতিক্রম করিয়াছে; যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপবিমুক্ত হইয়াছে, সে তো অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়ই। তপস্বিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের হইতে, কর্ম্মীদিগের হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব, অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। সমুদায় যোগিমধ্যে যাহারা মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিজ্ঞানযোগ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমাতে আসক্তমনা হইয়া, আমায় আশ্রয় করিয়া, যোগাভ্যাসপূর্ব্বক, নিঃসংশয়ভাবে আমায় সমগ্র কি প্রকারে জানিবে, শ্রবণ কর। আমি তোমায় সমগ্রভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিয়া, আর তোমার কিছুই জানিবার অবশেষ থাকিবে না। সহস্র মানুষের মধ্যে দুই এক জন সিদ্ধির জন্য যত্ন করে। আর যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, তাহাদের মধ্যে এক আধ জন আমায় তত্ত্বতঃ জানে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি; এটী অপরা প্রকৃতি। জানিও, এ অপেক্ষা আর একটী আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটী জীবপ্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি, জানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থান। আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি-সকল গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে। হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভা, সমুদায় বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষত্ব, পৃথিবীতে সদ্গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন, তপস্বিগণেতে তপ। আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান, আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবান্‌দিগের কামরাগবিবর্জ্জিত বল, আমি জীবগণেতে

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ অভিলাষ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে সকল ভাব, সে গুলিকে আমা হইতেই [উৎপন্ন] জানিও; কিন্তু সে গুলিতে আমি নাই, আমাতেও সে গুলি নাই। ত্রিগুণময় ভাবে এই সমুদায় জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, তাই আমি যে এই সকলের অতীত অব্যয় বস্তু, তাহা জানে না। এই আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অনতিক্রমণীয়া। যাহারা আমায় আশ্রয় করে, তাহারাই কেবল ইহা হইতে উত্তীর্ণ হয়। দুষ্কৃতী নরাধম মূঢ়েরা আমায় আশ্রয় করে না, তাহাদিগের জ্ঞান মায়াকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে এবং তাহারা আসুরিক ভাব আশ্রয় করিয়াছে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থপ্রার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী লোকে আমায় ভজনা করে। তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ নিত্যযোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ। আমি জ্ঞানী জনের অতীব প্রিয়, সেও আমার প্রিয়। ইহারা সকলেই উদার, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা—এই আমার অভিমত; কেন না সে সমাহিতচিত্ত হইয়া আমাকেই উত্তম গতি বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্মের পর আমায় লাভ করিয়া থাকে; সমুদায় বাসুদেব, এরূপ [জ্ঞানযুক্ত] মহাত্মা সুদুর্লভ। নানাবিধ কামনা দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া বিশেষ-বিশেষ-নিয়মাশ্রয়পূর্ব্বক অন্য দেবতাগণের শরণাপন্ন হয়। যে যে ভক্ত যে যে তনু [মূর্ত্তি] শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে সেই তনুসম্পর্কীয় অচলা শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকি। সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, সেই তনুর আরাধনাতে যত্ন করে এবং তাহা হইতে আমি যে সকল কামনার বিষয় বিধান করিয়াছি, তাহা লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল অল্পজ্ঞান ব্যক্তি ক্ষয়িষ্ণুফল লাভ করে; কারণ যাহারা দেবযজনা করে, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহারা আমায় ভক্তি করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুত্তম, আমার এই পরম ভাব না জানাতেই, তাহারা এরূপ করিয়া থাকে। আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সকলের নিকট আমি প্রকাশ নহি। আমি যে জন্মরহিত এবং নিত্য, মূঢ় লোকেরা তাহা জানে না। হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূতসমূহকে জানি, আমায় কিন্তু কেহ জানে না। শীতগ্রীষ্মসুখদুঃখাদিতে ইচ্ছা বা দ্বেষবশতঃ যে মোহ উপস্থিত হয়, সেই মোহে

সমুদায় জীব উৎপত্তিকালে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। যে সকল লোকের পুণ্যকর্ম্মবশতঃ পাপ অন্ত হইয়াছে, তাহারা সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে বিমুক্ত এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া আমারই ভজনা করে। জরামরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যাহারা আমায় আশ্রয় করিয়া কার্য্যশীল হয়, তাহারাই সেই ব্রহ্মকে জানে, আত্মতত্ত্ব জানে, সমুদায় [অনুষ্ঠেয়] কর্ম্ম জানে। প্রয়াণকালেও যে সকল ব্যক্তি অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ বলিয়া আমায় অবগত, তাহাদিগের চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, তাহারা আমায় জানে।

অধ্যাত্মযোগ

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্মই বা কি, সেই আত্মতত্ত্বই বা কি, সেই কর্ম্মই বা কি ? অধিভূতই বা কাহাকে বলে, অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? হে মধুসূদন, কিরূপে কে এই দেহে অধিযজ্ঞ হইয়া আছেন ? যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত হইয়াছে, তাঁহারা প্রয়াণকালে কেমন করিয়া তোমায় জানেন ? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, যিনি পরম অক্ষর [অবিনশ্বর], তিনি ব্রহ্ম ; স্বভাবকে আত্মতত্ত্ব বলা যায়। জীবসত্তার যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাদৃশ দ্রব্যযজ্ঞ কর্ম্ম নামে অভিহিত। নশ্বর সত্তা অধিভূত, পুরুষ অধিদৈবত [অধিষ্ঠাত্রী দেবতা], হে দেহিশ্রেষ্ঠ, আমিই এই দেহের অধিযজ্ঞ [যজ্ঞাধিষ্ঠাতা]। অন্তকালে যে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, সে সেই ভাবই লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য সকল সময়ে আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, নিঃসংশয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। হে পার্থ, অভ্যাসরূপ যোগ (উপায়) অবলম্বন করিয়া যে চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, আর কোথাও যায় না, সেই চিত্তযোগে দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষ কবি [সর্ব্বজ্ঞ], পুরাণ [অনাদিসিদ্ধ], শাস্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, এবং অন্ধকারের অতীত। প্রয়াণকালে অবিচলিতমনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌প্রকারে প্রবিষ্টকরত, সেই দিব্য পরম পুরুষকে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, যতিগণ বিষয়ানুরাগ পরিহার করিয়া যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে

[জানিবার] ইচ্ছা করিয়া সাধকেরা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন, সেই প্রাপ্য [বিষয়] তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে বিষয় হইতে বিরত এবং মনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করত, আপনার প্রাণকে মস্তকে লইয়া যোগধারণাশ্রয়-পূর্ব্বক, 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমায় স্মরণপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় নিত্য নিরন্তর স্মরণ করে, আমি সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে সুলভ। সেই মহাত্মারা আমায় প্রাপ্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর দুঃখের আলয় অনিত্য জন্ম গ্রহণ করে না। ব্রহ্মলোক হইতে যতগুলি লোক আছে, সকলগুলিতে গিয়া আবার পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়, আমায় পাইয়া আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাহারাই অহোরাত্রের তত্ত্ব জানে, যাহারা জানে যে, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। [ব্রহ্মার] এক দিন আসিলে অব্যক্ত হইতে চরাচর সমুদায় প্রকাশ পায়, রাত্রির আগমনে সেই অব্যক্তে পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। এই ভূতসমূহ দিনের আগমে উৎপন্ন হয়, হইয়া আবার রাত্রির আগমে অবশভাবে বিলীন হইয়া যায়। সেই অব্যক্ত হইতে আর একটি যে অব্যক্ত সনাতন পরম ভাব আছে, সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া গেলেও বিনষ্ট হয় না। অব্যক্ত অক্ষর [অবিনাশী] বলিয়া কথিত হন, সেই অক্ষরকেই পরম গতি বলে। যাহা লাভ করিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, সেই আমার পরম ধাম। হে পার্থ, অনন্য ভক্তিতে সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়, যাঁহার অন্তঃস্থ সমুদয় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগী যে কালে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসে না, যে কালে গেলে ফিরিয়া আইসে, সেই কালের কথা বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস, ইহাতে যে সকল ব্রহ্মবিদ্ প্রয়াণ করে, তাহারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, ইহাতে [গমন করিলে] যোগী চান্দ্রমসজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটি জগতের অনাদিসিদ্ধ গতি, ইহার একটি দিয়া গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না; আর একটী দিয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে। হে পার্থ, এই দুই পথ জানিয়া কোন যোগী মুগ্ধ হয় না, তাই তুমি সকল কালে যোগযুক্ত হও। বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানেতে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা

জানিয়া সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকে। যোগী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান প্রাপ্ত হয়।

রাজযোগ *

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন. তুমি দোষদর্শী নও, আমি সবিজ্ঞান গুহ্যতম জ্ঞান তোমায় বলিতেছি। এই জ্ঞান অবগত হইয়া, তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই জ্ঞান পবিত্র, উত্তম; ইহা সমুদায় বিদ্যার, সমুদায় রহস্যের রাজা; ইহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়, সুখে অনুষ্ঠান করা যায়, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অক্ষয়। এই ধর্ম্মের প্রতি যে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমায় না পাইয়া, মৃত্যুযুক্ত সংসারপথে ভ্রমণ করে। অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না, এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, আমি ভূতস্থ নহি, আর আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক। মহান্ সর্ব্বস্থানগামী বায়ু যেমন নিত্য আকাশস্থিত, সেই সমুদায় ভূত আমাতে সেইরূপ অবস্থিত জানিও। কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে আবার তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি। সমগ্র এই ভূতসমূহ প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া পরতন্ত্র। আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করিয়া থাকি। হে ধনঞ্জয়, সেই সকল (সৃষ্টি) কর্ম্ম আমায় বদ্ধ করে না, কেন না আমি উদাসীনবৎ অবস্থিত, সে সকল কর্ম্মেতে আসক্ত নহি। আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকে, আর এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়। আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পাইয়া, মনুষ্যের শরীরাশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে। এই সকল হতচেতন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, ইহাদিগের সমুদায় কর্ম্ম, আশা ও জ্ঞান নিষ্ফল। কিন্তু যে সকল মহাত্মা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা সমুদায় ভূতের আদি ও নিত্য জানিয়া, অনন্যমনে আমার ভজনা করে।

* এই অধ্যায় মুক্তি, অথবা রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ নামে অভিহিত। রাজযোগ অতি স্বাভাবিক বলিয়া, আমরা এই যোগকে রাজযোগ নামে অভিহিত করিলাম।

তাহারা দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া আমায় কীর্ত্তন করে, আমায় যত্ন করে, ভক্তিপূর্ব্বক আমায় নমস্কার করে, নিত্য সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করে। কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞে যজনা করিয়া, আমি বিশ্বতোমুখ, আমায় একত্বে, পৃথক্ত্বে অথবা বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, বেদ্যবস্তু, পাবন ও ওঙ্কার এবং ঋক্, যজু ও সাম। আমি স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, গতি, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, স্থিতিস্থান, নিধান, অবিনাশী কারণ। হে অর্জ্জুন, আমি উত্তপ্ত করি, আমি জল বর্ষণ করি বা অবরুদ্ধ করি, আমি অমৃত, আমি মৃত্যু, আমি সদসৎ (স্থূল সূক্ষ্ম)। বেদবাদিগণ আমায় যজ্ঞ দ্বারা যজনা করিয়া সোমপান করে এবং পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করে। তাহারা পবিত্র স্বর্গে গমন করিয়া, সেখানে দিব্য দেবভোগ-সকল ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হয়। পুনরায় সেই বেদধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া, কামনার বিষয় কামনা করে, সুতরাং তাহাদের পুনঃ পুনঃ গতায়াত হয়। যে সকল ব্যক্তি আমা বিনা আর কিছু চায় না, আমাকেই চিন্তা করে, আমারই উপাসনা করে, সেই অবিরল মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম * আমিই বহন করি। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্য দেবতার যজনা করিয়া থাকে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই যজনা করে। আমিই সমুদায় ব্রতের ভোক্তা ও প্রভু; বস্তুতঃ আমায় জানে না বলিয়াই, তাহাদিগের অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি হয়। দেবোদ্দেশে যাহারা ব্রতাচরণ করে, তাহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়; পিতৃগণোদ্দেশে যাহারা শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়; যাহারা ভূতগণের যজনা করে, তাহারা ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়; যাহারা আমার যজনা করিয়া থাকে, তাহারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক আমায় যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তির উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর,

---

* যোগ ও ক্ষেম—যোগ যোগান, ক্ষেম রক্ষা করা। যোগ ও ক্ষেম বহন করার অর্থ—যাহা তাহার নাই, তাহা আমি যোগাই, এবং যাহা যোগাই, তাহা আমি স্বয়ং রক্ষা করি।

যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমুদায় আমায় অর্পণ কর। এইরূপে শুভাশুভফলযুক্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; মুক্ত হইয়া, কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগ-যুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সকল ভূতের প্রতিই আমি সমান, আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, আমার কেহ প্রিয় নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতে এবং আমিও তাহাদিগেতে। যদি নিতান্ত দুরাচার হয়, অথচ অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে; কেন না সে উৎকৃষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, নিত্য শান্তি লাভ করে। হে পার্থ, [অপরের নিকটে] প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্ত বিনাশ পায় না। আমায় আশ্রয় করিয়া, হে পার্থ, যাহারা নিকৃষ্ট জাতি, স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র, তাহারাও পরম গতি লাভ করিয়া থাকে; পবিত্রজন্মা ভক্ত ব্রাহ্মণ ও দেবর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? অনিত্য অসুখের হেতু ইহলোকে থাকিয়া আমার ভজনা কর। মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমারই যজনা কর, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া, আত্মসমাধানপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

বিভূতি-যোগ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি প্রীতিমান্, তোমার হিতের জন্য আমি পুনরায় যে উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রভব (আবির্ভাব) দেবগণও জানে না, মহর্ষিগণও জানে না; আমি সর্ব্বথা সমুদায় দেবগণের আদি, আমি সমুদায় মহর্ষিগণের আদি। যে আমাকে অজ, অনাদি, লোকসকলের মহেশ্বর বলিয়া জানে, সেই মনুষ্যগণমধ্যে মোহশূন্য, সেই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, ভূতগণের এই সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি লোকে এই সকল প্রজা যাঁহাদের সন্তান সন্ততি, সেই সাত জন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন মহর্ষি এবং মনুগণ আমারই ভাব, আমারই মানসজাত। আমার এই বিভূতি এবং যোগ যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ জানে, সে সংশয়বিরহিত যোগে যুক্ত হয়, ইহাতে আর সংশয় নাই। আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া ভাবযুক্ত হইয়া, আমার ভজনা করে। আমাতে

তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ প্রবিষ্ট, তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপ করিয়া পরিতুষ্ট হয়, আমোদিত হয়। নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া, তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে ; তাই আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে। তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই [তাহাদিগের] বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিতি করি এবং সেখানে থাকিয়া, দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে, আমি তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি পরব্রহ্ম, পরম লোক, পরম পবিত্র। সমুদায় ঋষিগণ, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং স্বয়ং আপনিও আপনাকে জন্ম-রহিত, সর্ব্বগত, আদিদেব, নিত্য, দিব্য পুরুষ বলেন। কেশব, আপনি আমায় যাহা কিছু বলিলেন, সকলই সত্য মনে করি। ভগবন্, আপনার প্রকাশ দেবতারাও জানে না, অসুরেরাও জানে না। হে পুরুষোত্তম, হে জগৎপতে, হে দেবদেব, হে ভূতেশ্বর, হে ভূতভাবন, স্বয়ং তুমি আপনিই আপনাকে জান। আপনি আপনার সেই দিব্য বিভূতিসমূহ নিঃশেষরূপে বলুন, যে বিভূতিযোগে এই সমুদায় লোকে আপনি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। হে যোগী, আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়া, আপনায় কি প্রকারে জানিতে পারিব, কি কি পদার্থে, হে ভগবন্, আমি আপনায় চিন্তা করিব। হে জনগণের শাস্তা, আপনার যোগ ও বিভূতি পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক বলুন, আপনার বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

আচার্য্য বলিলেন, অহো, আমি তোমায় প্রথমতঃ আমার দিব্য বিভূতিগুলির কথা বলিতেছি ; হে কুলশ্রেষ্ঠ, আমি অতি বিস্তৃত, আমার অন্ত নাই। হে বিজিত-মিত্র, আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত। আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রকাশপদার্থগণমধ্যে আমি কিরণমালী রবি, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি শশী, বেদসকলের মধ্যে আমি সাম, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতসকলমধ্যে আমি মেরু। হে পার্থ, সমুদায় পুরোহিতগণের মধ্যে আমায় বৃহস্পতি জানিও,

সেনানীগণমধ্যে আমি কার্ত্তিক, সরোবরসকলের মধ্যে আমি সাগর। মহর্ষিগণ মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যমধ্যে আমি একাক্ষর [ওঙ্কার], যজ্ঞমধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরগণমধ্যে আমি হিমালয়। সমুদায় বৃক্ষমধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণমধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণমধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণমধ্যে আমি কপিলমুনি। অশ্বগণমধ্যে অমৃতোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যগণমধ্যে আমায় মনুষ্যাধিপতি জান। আয়ুধগণমধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণমধ্যে আমি কামধেনু, সন্তানোৎপত্তিহেতু আমি কন্দর্প, সর্পগণমধ্যে আমি বাসুকি। নাগগণ-মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরমধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণমধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়ন্তৃ-গণমধ্যে আমি যম। দৈত্যগণমধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণমধ্যে আমি কাল, মৃগগণমধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণমধ্যে আমি গরুড়। পবিত্রকারিগণমধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণমধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণমধ্যে আমি মকর, প্রবাহগণ-মধ্যে আমি জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন, সৃষ্টিমধ্যে আমি আদি অন্ত মধ্য, বিদ্যামধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণমধ্যে আমি বাদ। অক্ষরসমূহমধ্যে আমি অকার, সমাসমধ্যে আমি দ্বন্দ্ব ; আমি অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা। আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, যাহারা জন্মিবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি উৎপত্তি, নারীগণমধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। সামসকলমধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দঃসমূহমধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসসকলমধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুসমূহমধ্যে আমি বসন্ত। বঞ্চনাপরায়ণগণমধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বিগণের মধ্যে আমি তেজ, [জেতৃগণমধ্যে] আমি জয়, [উদ্যমশীলগণ মধ্যে] আমি উদ্যম, সাত্ত্বিকগণমধ্যে আমি সত্ত্ব, বৃষ্ণিগণমধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণমধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণমধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণমধ্যে আমি কবি শুক্র। শাস্তৃগণমধ্যে আমি দণ্ড, জিগীষুগণ-মধ্যে আমি নীতি, গোপ্যবিষয়সমূহমধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি জ্ঞান। হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু সর্ব্বভূতের বীজ, তাহা আমি ; চরাচর এমন ভূত নাই, যাহা আমা বিনা হইতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিনিচয়ের অন্ত নাই, উদ্দেশে এই বিভূতির বিস্তার আমি বলিলাম। যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জান। অথবা তোমার এ সকল বহু বিষয় জানিবার কি প্রয়োজন ? আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

বিশ্বরূপ-দর্শন

অর্জ্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ, পরমগুহ্য অধ্যাত্মনামে অভিহিত যে বাক্য আপনি আমায় বলিলেন, তাহাতে আমার মোহ চলিয়া গেল। ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং [আপনার] অক্ষয় মাহাত্ম্য, হে কমল-পত্রাক্ষ, আপনার নিকট হইতে বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর, আপনি আপনার কথা যেরূপ বলিলেন, তাহা এইরূপই। হে পুরুষোত্তম, আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো যোগেশ্বর, যদি সেরূপ আমি দেখিতে পারি, এরূপ আপনি মনে করেন, তবে আপনি আপনাকে দেখান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ, আমার শতশঃ, সহস্রশঃ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিযুক্ত নানাবিধ দিব্যরূপ দর্শন কর। আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ এবং আরও অনেক, যাহাদিগের রূপ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ দর্শন কর। আমার এই দেহে এক স্থানে অবস্থিত সচরাচর সমগ্র জগৎ এবং আর যাহা কিছু দেখিতে চাও, আজ দেখ। তুমি এই নিজের চক্ষে আমায় দেখিতে পারিবে না। আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।

এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে অনেক বক্ত্র, অনেক নয়ন, দিব্যাভরণ, দিব্য বসন, দিব্য মাল্য, এবং দিব্য গন্ধানুলেপনযুক্ত বিশ্বতোমুখ অদ্ভুত অনন্ত ঐশ্বরিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ উদিত হয়, তবে তাহার দীপ্তির সঙ্গে সেই মহান্ আত্মার সাদৃশ্য হয়। অর্জ্জুন তখন দেবদেবের শরীরে একস্থানে অবস্থিত সমগ্র জগৎ অনেক প্রকারে বিভক্ত দেখিতে পাইলেন। এতদ্দর্শনে অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন হইলেন, রোমাঞ্চিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক, যাহা যাহা তাঁহাতে দেখিতে পাইলেন, প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করিলেন, তদনন্তর স্তব করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার শরীরে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু, গন্ধর্ব্ব, যক্ষাদি সকলকে দেখিয়াছিলেন। ভীষ্মদ্রোণাদি সকলে ভয়ানক দংষ্ট্রাকরাল মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এরূপ কেন দৃষ্ট হইতেছে, তিনি জিজ্ঞাসা করাতে, কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তিনি কালরূপে সমুদায়কে হরণ করিতেছেন; অর্জ্জুন বিনা যোদ্ধবর্গ বিনষ্ট হইবে, কেহ আর পৃথিবীতে

থাকিবে না। যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগকে মারিয়া তিনি যশস্বী হউন, রাজ্য ভোগ করুন। তিনি শত্রুক্ষয়ে নিমিত্তমাত্র, কর্ত্তা নহেন।

ভক্তিযোগ

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, সতত সমাহিত হইয়া, যে সকল ভক্ত তোমায় এইরূপে এবং যাহারা তোমায় অব্যক্ত অক্ষর [ব্রহ্ম] রূপে উপাসনা করে, তাঁহাদিগের মধ্যে যোগবিত্তম কাহারা ? আচার্য্য উত্তর দিলেন, মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া যাহারা নিত্য সমাহিত, এবং পরমশ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ। যাহারা ইন্দ্রিয়নিচয়সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নিত্য অক্ষরের উপাসনা করে, এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত হয়, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা দেহধারী, তাহারা অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ করিয়া থাকে। যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক, মৎপরায়ণ হইয়া, একান্ত [ভক্তি] যোগে আমায় ধ্যানকরত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে, হে পার্থ, অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতে মন স্থাপন কর, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, দেহান্তে নিঃসংশয় আমাতেই বাস করিবে। যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগে আমায় লাভ করিতে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্মপরায়ণ হও, আমার জন্য কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি আমার সঙ্গে যোগাশ্রয়পূর্ব্বক ইহাও করিতে অসমর্থ হও, সংযতচিত্ত হইয়া সমুদায় কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ, ত্যাগ হইতে শান্তি বিশেষ। আমার যে ভক্ত সমুদায় ভূতের অদ্বেষ্টা, মিত্রভাবাপন্ন, করুণ, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমাবান্, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, সেই আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, যে লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে ভক্ত অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন ও সর্ব্বপ্রকারের উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয়। যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি

হৃষ্টও হয় না. দ্বেষও করে না, শোকও করে না, আকাঙ্ক্ষাও করে না, শুভ ও অশুভ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই আমার প্রিয়। সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়, যে শত্রুতে মিত্রেতে, মানেতে অপমানেতে, শীতে উষ্ণে, সুখে দুঃখে সমান, আসক্তিবর্জ্জিত, তুল্যনিন্দাস্তুতি, মৌনী, যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট, নিয়তবাসনাশূন্য ও স্থিরচিত্ত। এই যে অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম্ম কথিত হইল, এই ধর্ম্ম যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং মৎপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করে, তাহারা আমার অতীব প্রিয়।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞযোগ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এই শরীরকে যে জানে, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে। হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিমত। সেই ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ, যে বিকারযুক্ত, যাহা হইতে যাহা, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা, এবং যে প্রভাববিশিষ্ট, সংক্ষেপে শ্রবণ কর। ঋষিগণ বিবিধ ছন্দে যুক্তি-পূর্ণ নিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্রপদে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ [তন্মাত্র], ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাত, চেতনা, ধৈর্য্য, সংক্ষেপে এই সবিকার ক্ষেত্র কথিত হইল। অমানিত্ব, দম্ভশূন্যত্ব, অহিংসা, আচার্য্যসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির পুনঃ পুনঃ দুঃখ-ও-দোষ-দর্শন, অনাসক্তি, পুত্র দারা গৃহাদিতে আত্মবুদ্ধিত্যাগ, ইষ্ট বা অনিষ্ট উপস্থিত হইলে নিত্য সমচিত্তত্ব, অনন্যযোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনদেশসেবা, জনসমিতির প্রতি অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনদর্শন, ইহাকেই জ্ঞান বলে; যাহা কিছু ইহার বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান। যাহা জ্ঞেয়, বলিতেছি, যাহা জানিয়া তুমি অমৃতত্ব লাভ করিবে। পরব্রহ্ম অনাদিমৎ, তাঁহাকে সৎও বলে না, অসৎও বলে না; সর্ব্বত্র তাঁহার পাণিপাদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, ত্রিলোকে সমুদায় আবৃত করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সমুদায় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অনাসক্ত অথচ সকলের ধারয়িতা ও পরিপালক, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি ভূতগণের অন্তরেও

বটেন, বাহিরেও বটেন চলও বটেন, অচলও বটেন, দূরস্থও বটেন, নিকটস্থও বটেন. সূক্ষ্মত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। সেই জ্ঞেয় অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণেতে বিভক্তের মত অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের পোষক, সংহারক ও উৎপত্তির কারণ। তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত বলা হইয়া থাকে। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সংক্ষেপে তোমায় এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বলিলাম ; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া, মদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান, বিকার ও গুণ প্রকৃতিসমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হও। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হন। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয় ভোগ করিয়া থাকে। গুণসমূহের প্রতি আসক্তি ইহার সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। এই দেহে যিনি পরমপুরুষ, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকে ; ইনি সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যে ব্যক্তি এইরূপে গুণসহকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানে, সে যে কোন প্রকারে কেন জীবন যাপন করুক না, আর পুনরায় তাহার জন্ম হয় না। কেহ ধ্যানযোগে আত্মাতে আপনি আপনাকে দেখে, কেহ বা সাংখ্যযোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকে। অন্যে এরূপ না জানিয়া, অপরের নিকটে শুনিয়া উপাসনা করে। যাহা শুনে, তৎপ্রতি একান্ততাবশতঃ তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ জানিও। সমুদায় বিনাশশীল ভূতেতে সমভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখে, সেই দেখে। সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শনকরত, আপনি আপনার হিংসা করে না ; সে জন্যই সে তাহা হইতে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তি দেখে, সে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে। [সাধক] যখন ভূতগণের পৃথক্ ভাব একস্থ দর্শন করে এবং তাহা হইতেই [সৃষ্টি] বিস্তার দেখে, তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। এই পরমাত্মা অব্যয়। ইনি অনাদি ও নির্গুণহেতু শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না, কিছুতে লিপ্ত হন না। যেমন সূক্ষ্মত্ববশতঃ সর্ব্বগত আকাশ লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও লিপ্ত হয় না। এক সূর্য্য যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত

করে, এক ক্ষেত্রী তেমনি, হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষুতে যে ব্যক্তি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে, তাহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

গুণত্রয়বিভাগ

আবার জ্ঞানমধ্যে উত্তম পরম জ্ঞান বলিতেছি, যে জ্ঞান অবগত হইয়া, মুনি সকল পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সেই সকল ব্যক্তি সৃষ্টিকালে জন্মে না, প্রলয়কালেও তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করে না। এই মহৎ ব্রহ্ম [প্রকৃতি] আমার যোনি। ইহাতে গর্ভ আধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই সমুদায় ভূতের উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়, সমুদায় যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, মহৎ ব্রহ্ম তাহাদিগের সকলেরই [প্রকৃতি] যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা। সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতিসম্ভূত এই তিন গুণ, সেই গুণত্রয় নির্ব্বিকার দেহীকে দেহে বদ্ধ করে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব জন্য প্রকাশক ও অনাময় (শান্ত); সুতরাং উহা জ্ঞানাসক্তিতে ও সুখাসক্তিতে বদ্ধ করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক জানিও, তৃষ্ণা ও আসক্তি ইহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, ইহা কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দেহীকে বদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞানসমুদ্ভূত, ইহা সমুদায় দেহীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাযোগে, হে ভারত, ইহা আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া ভ্রান্তিতে আসক্ত করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে নির্জ্জিত করিয়া উপস্থিত হয়। এই দেহে [শ্রোত্রাদি] সমুদায় দ্বারে যখন প্রকাশ ও জ্ঞান সমুপস্থিত, তখন সত্ত্বের পরিবৃদ্ধি জানিতে হইবে। হে ভরতর্ষভ, যে সময়ে রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, সে সময়ে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অপ্রশম, স্পৃহা, এই সকল হইয়া থাকে। তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অনবধান ও ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণ পরিবৃদ্ধ হইলে যদি দেহীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, উত্তম তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের অমল-লোক-প্রাপ্তি হয়। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের মধ্যে, তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইলে, মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়। সুকৃত কর্ম্মের সত্ত্বগুণোদ্ভূত নির্ম্মল ফল, রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল

অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ হইতে ভ্রান্তি, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণস্থ লোকেরা ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণাপন্ন লোকেরা মধ্যম লোকে স্থিতি করে, নিকৃষ্ট তমোগুণস্থ লোকেরা অধোলোকে গমন করে। জীব যখন এই সকল গুণ ব্যতীত আর কাহাকেও কর্ত্তা দেখে না, [আপনাকে] গুণত্রয় হইতে অতিরিক্ত জানে, তখন সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহোৎপত্তির হেতু এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া, দেহী জন্মমৃত্যুজরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অমৃতত্ব লাভ করে।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের অতীত হয়? কি বা ইহার আচরণ? কিরূপেই বা তিন গুণ অতিক্রম করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এ তিন [স্বতঃ] প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করে না, নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করে না, উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হয়, এই সকল গুণ দ্বারা বিচলিত হয় না, গুণসকল আপনার কাজ করিতেছে—এই জানিয়া স্থির হইয়া থাকে, একটুও নড়ে না, সুখ দুঃখে সমান, আপনাতে অবস্থিত, লোষ্ট্র-প্রস্তর-কাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য, ধৈর্য্যশীল, নিন্দা ও স্তুতিতে সমানবোধ, মানাপমান ও শত্রু মিত্রে সমান, সকল প্রকারের উদ্যমত্যাগী, ঈদৃশ লোককে গুণাতীত বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভজনা করে, সে এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মের সহিত একতা লাভ করে। ব্রহ্মের [প্রকৃতির], অব্যয় অমৃতত্বের, নিত্যধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের আমিই প্রতিষ্ঠা [স্থিতিস্থান]।

পরমাত্মতত্ত্ব

ঊর্দ্ধ যাহার মূল, অধঃ যাহার শাখা, বেদসকল যাহার পত্র, যাহাকে অক্ষয় অশ্বত্থ * বলা হইয়া থাকে, তাহাকে যে ব্যক্তি জানে, সেই বেদবিৎ। [সত্ত্বাদি] গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ঊর্দ্ধে এবং অধোতে তাহার শাখা প্রসৃত হইয়াছে। বিষয় সকল তাহার পল্লব, অধোতে মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধ

* সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্বঃ (কল্য) ও যে থাকিবে না, এই অর্থে (অ—শ্বঃ—থ) অশ্বত্থ এখানে গৃহীত হইয়াছে। কেবল কল্য নয়, বহুদিন থাকিবে, এই অর্থে অশ্বত্থশব্দ অশ্বত্থবৃক্ষ বুঝায়। সংসার যদিও অস্থায়ী, তথাপি প্রবাহক্রমে থাকে বলিয়া, উহাকে অক্ষয় বলা হইয়াছে। সুতরাং অশ্বত্থবৃক্ষের ব্যুৎপত্তিও খাটিতে পারে।

[অবান্তর] মূলগুলি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহলোকে সেরূপ ইহার রূপ কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। ইঁহার অন্তও নাই, আদিও নাই, ইহার আশ্রয়ও নাই। অতিশয় বদ্ধমূল এই অশ্বথকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় শস্ত্রে ছেদন করিয়া, তদনন্তর 'যাঁহা হইতে চিরন্তন সংসারপ্রবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করি', এই বলিয়া, সেই পথ অন্বেষণ করিবে, যাহাতে পুনরাবৃত্তি হয় না। বিশেষরূপে যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমান ও মোহ নাই, আসক্তিদোষ জয় হইয়াছে, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিষ্ঠ, বিশেষরূপে কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখ দুঃখের প্রতি আসক্তিবশতঃ যে শীতোষ্ণাদি [অসহনশীলতা উপস্থিত হয়], তদ্বিমুক্ত, তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে স্থানকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আলোকিত করে না। যেথানে গিয়া আর নিবৃত্তি হয় না, তাহাকেই আমার পরম ধাম জানিবে। জীবলোকে জীবভূত আমার নিত্যকালস্থায়ী অংশ প্রকৃতিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। [ইন্দ্রিয়গণের] স্বামী [এই জীব] যে শরীর লাভ করে, অথবা যে শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে তেমনি লইয়া যায়, বায়ু যেমন গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে গন্ধ সকল লইয়া যায়। চক্ষু শ্রোত্র স্পর্শ রসনা ঘ্রাণ ও মনে অধিষ্ঠান করিয়া জীব বিষয় সেবা করে। গুণান্বিত * [ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত] জীব শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, অথবা তাহাতে স্থিতি করিতেছে, অথবা বিষয়ভোগ করিতেছে, মূঢ়েরা তাহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ দেখিয়া থাকেন। যত্নশীল যোগিগণ দেহস্থিত জীবকে দেখিতে পায়, অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ যত্ন করিয়াও অচিত্ততাবশতঃ ইহাকে দেখিতে পায় না। আদিত্যগত যে তেজ সমুদায় জগৎকে আলোকিত করে, যে তেজ চন্দ্রেতে ও অগ্নিতে অবস্থিত করে, সে তেজ আমারই জানিও। আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় বলে ভূত-সমুদায়কে ধারণ করিয়া আছি, আমিই রসাত্মক সোম হইয়া সমুদায় ওষধি পুষ্ট করিয়া থাকি। আমিই বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহে অবস্থিতি করি, আমি প্রাণ ও অপানবায়ু সহ সংযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি। আমিই সকলের

* বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যানুসারে এখানে গুণ চৈতন্য গুণ। চৈতন্যগুণ আত্মাতে সামর্থ্যাকারে ইন্দ্রিয়াদির স্থিতি স্বীকার করিয়া, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত অর্থ সিদ্ধ হয়।

হৃদয়ে অবস্থিত, আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তদপগম হইয়া থাকে। সকল বেদ দ্বারা আমিই বেদ্য, আমিই বেদকৃৎ, আমিই বেদবিৎ। ইহলোকে ক্ষর এবং অক্ষর দুই পুরুষ বিদ্যমান। সমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলিয়া থাকে। এ ব্যতীত আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়েন, যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে পালন করিতেছেন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরাপেক্ষাও উত্তম, অতএব আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি বিমূঢ়মতি না হইয়া, আমায় এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিয়া, সমগ্রভাবে আমারই ভজনা করিয়া থাকে। হে অনঘ, তোমায় এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম। ইহা বুঝিলে, হে ভারত, মনুষ্য বুদ্ধিযুক্ত এবং কৃতকৃত্য হয়।

দেবাসুরসম্পদ্বিভাগ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দৈবী সম্পদের অভিমুখে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, ভূতগণে দয়া, অলোলুপত্ব, মৃদুত্ব, লজ্জাশীলতা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানিতা হইয়া থাকে। আসুরী সম্পদের অভিমুখে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞানতা হইয়া থাকে। দৈবী সম্পৎ মোক্ষ এবং আসুরী সম্পৎ বন্ধনের জন্য হয়। হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না, তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি। দৈবসৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে, আসুরসৃষ্টি আমার নিকটে শ্রবণ কর। আসুরব্যক্তিগণ প্রবৃত্তিও জানে না, নিবৃত্তিও জানে না, শৌচও জানে না, আচারও জানে না; তাহাদিগের নিকটে সত্য বলিয়া কিছু নাই। তাহারা এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়শূন্য, ঈশ্বরশূন্য, আর কিছু নয়—কামহেতু পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, ইহাদিগের আত্মা মলিন হয়, অল্পমতি হইয়া যায়, ক্রূরকার্য্যসকলের ইহারা অনুষ্ঠান করে; সুতরাং ইহারা বৈরী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল অশুচিব্রত লোক দুষ্পূর কাম আশ্রয়পূর্ব্বক, দম্ভ-মান-ও-মদযুক্ত হয় এবং মোহবশতঃ অসদ্গ্রহাবলম্বনকরতঃ কার্য্য করিয়া

থাকে। ইহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তা আশ্রয় করে, কামোপভোগই ইহাদিগের পরমার্থ এবং ইহা ছাড়া আর কিছু নাই, এই ইহাদিগের নিশ্চয়। ইহারা শত আশাপাশে বদ্ধ, কামক্রোধপরায়ণ, কামভোগার্থ ইহারা অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয় করিতে যত্ন করিয়া থাকে। আজ এই মনোরথ লাভ করিলাম, আবার এই মনোরথ লাভ করিব; এই ধন আছে, আবার এই ধন লাভ করিব; এই শত্রু আমি মারিয়াছি, এই সকল শত্রুকে মারিব; আমি ক্ষমতা-বান্, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান্, সুখী, আমি আঢ্য, কুলীন, আমার সমান আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এইরূপ অজ্ঞানে ইহারা মোহিত। অনেক বিষয়ে ইহাদিগের চিত্ত প্রবিষ্ট, সুতরাং ইহারা বিভ্রান্ত এবং মায়াজালে আবৃত। ইহারা কামভোগে আসক্ত হইয়া, অশুচি নরকে নিপতিত হয়। ইহারা আপনাকেই বড় মনে করে, সুতরাং অনম্র। ধন, মান ও মদসমন্বিত হইয়া, দম্ভে অবিধিপূর্ব্বক, নামমাত্রে যজ্ঞ করিয়া থাকে। ইহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক, [সজ্জনগণের] দোষ-দর্শনকরত, আত্মপরদেহে আমাকেই দ্বেষ করে। এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমদিগকে আমি সংসারে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ়গণ আসুরযোনি লাভ করিয়া, জন্মে জন্মে আমাকে না পাইয়া, তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার এবং আত্মার নাশের হেতু, সুতরাং এই তিনকে পরিত্যাগ করিবে। হে কৌন্তেয়, মনুষ্য এই তিন তমোদ্বার হইতে বিমুক্ত হইয়া, আপনার শ্রেয় আচরণ করিয়া থাকে, তৎপর পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, সে সিদ্ধিও পায় না, সুখও পায় না, পরম গতিও প্রাপ্ত হয় না। এটি করণীয়, এটি অকরণীয়, ইহা স্থির করিবার পক্ষে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রবিধানে কি কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, জানিয়া, তোমার তাহাই করা উচিত।

গুণভেদে শ্রদ্ধাভেদ

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজনা করে, হে কৃষ্ণ, তাহাদের কি প্রকার নিষ্ঠা? সত্ত্ব, রজ, অথবা তম? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে দেহিগণের স্বভাবজাত

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ কর। হে ভারত, অন্তঃকরণের অনুরূপ সকলের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সে তাহাই। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের, রাজস ব্যক্তিগণ যক্ষ রাক্ষসের, তামস ব্যক্তিগণ প্রেতভূতগণের যজনা করিয়া থাকে। দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, আসক্তি ও সাহসিকতাবশতঃ যে সকল লোক অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যাচরণ করে এবং অবিবেকী হইয়া শরীরস্থ ভূতনিচয়কে এবং [তৎসহ] অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুর নিশ্চয় বলিয়া জানিও। ত্রিবিধ আহারও সকলের প্রিয়, যজ্ঞ, তপস্যা, দানও তদ্রূপ। এ সকলের ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, সারত্বে স্থায়ী এবং হৃদ্য, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক জনের প্রিয়। কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য আহার সকল, যাহাতে দুঃখ, শোক ও রোগ উপস্থিত হয়, সেই সকল আহার রাজসগণের অভিলষিত। প্রহরাতীত, নীরস, পর্য্যুসিত, পচাগন্ধযুক্ত, এমন কি উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য ভোজন তামস জনের প্রিয়। এ সকলের আকাঙ্ক্ষাপরিত্যাগপূর্ব্বক, বিধানের আদেশে যজ্ঞকরা কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সেই সাত্ত্বিক। ফলাভিসন্ধান করিয়া, কেবল দম্ভার্থ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিও। বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন শ্রদ্ধাবিরহিত, [ব্রাহ্মণাদিকে] অদত্তান্ন যজ্ঞকে তামস বলিয়া থাকে। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এইগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলে। সত্য, প্রিয়, হিতজনক, অনুদ্বেগকর বাক্য এবং স্বাধ্যায়াভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা কথিত হয়। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস-তপস্যা বলে। কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, একাগ্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধায় যে সকল ব্যক্তি এই ত্রিবিধ তপস্যা করে, তাহাদিগের তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা যায়। সৎকার, মান এবং পূজার জন্য দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয়, তাহা রাজস, এই তপস্যা চঞ্চল এবং অনিশ্চিত। মূঢ়তাবশতঃ দুরাগ্রহে আত্মপীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করা হয়, অথবা অন্যের বিনাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস তপস্যা বলা গিয়া থাকে। দেওয়া কর্ত্তব্য, এ জন্য অনুপকারী ব্যক্তিকে এবং দেশ, কাল ও পাত্রে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

প্রত্যুপকারের জন্ম অথবা ফলের উদ্দেশ করিয়া অতিকষ্টে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে রাজস দান বলে। অসৎকার এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক অনুচিত দেশ কাল পাত্রে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে তামস দান বলে। ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মের এই তিন প্রকারের নির্দ্দেশ। সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এই জন্যই 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়া প্রবৃত্ত হয়; 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ ফলাভিসন্ধান না করিয়া, যজ্ঞ, তপ ও বিবিধ দানক্রিয়া করিয়া থাকে; সদ্ভাব এবং সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রশস্ত কর্ম্মেও সচ্ছব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানেতে যেটি স্থায়িরূপে অবস্থান করে, তাহাকে সৎ বলে; আর সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে যে কর্ম্ম, তাহাকেও সৎ বলিয়া থাকে। হে পার্থ, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে অসৎ বলে; উহা ইহকালেও কিছু নয়, পরকালেও কিছু নয়।

উপসংহার

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে মহাবাহো, কেশিনিসূদন হৃষীকেশ, সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথগ্‌রূপে জানিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কাম্যকর্ম্মত্যাগকে পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ত্যাগ বলেন। কোন কোন পণ্ডিত দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, কোন কোন পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা-কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয়, বলেন। হে ভরত-সত্তম, হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর। ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, এ সকল কর্ত্তব্য। কেন না যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকিগণের পাপমলাপহারক। হে পার্থ, আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া, এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত। নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মত্যাগ তমোগুণসম্ভূত কথিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে দুঃখ হয়, এই বলিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে, যে ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিল বলিয়া, ত্যাগজনিত ফল লাভ করে না। হে অর্জ্জুন, আসক্তি ও ফল ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য জন্য যে বিধিসিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক জানিতে হইবে।

যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, বুদ্ধি স্থিরতালাভ করিয়াছে, সেই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখকর কর্ম্মকেও দ্বেষ করে না, সুখজনক কর্ম্মেও আসক্ত হয় না। শরীরধারী ব্যক্তি কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট, [ইষ্টানিষ্ট] মিশ্র, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। যাহারা ত্যাগী নহে, তাহাদিগের পরলোকে এই ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, সংন্যাসিগণের ইহার কিছুই হয় না। সমুদায় কর্ম্মের সিদ্ধিজন্য সাংখ্যসিদ্ধান্তে এই পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে, ভাল করিয়া তাহা বুঝ। অধিষ্ঠান [শরীর], কর্ত্তা [অহঙ্কার], চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, নানা প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা, এবং পঞ্চম দৈব। ন্যায্য হউক বা অন্যায্য হউক, শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা মানুষ যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার হেতু এই পাঁচটি। যখন সকল কার্য্যে এই পাঁচটি হেতু, তখন যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকেই কর্ত্তা দেখে, সে দুর্ম্মতি অকৃতবুদ্ধির জন্য দেখিতে পায় না। যাহার অহঙ্কারের ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোককে হনন করিয়াও হনন করে না ও বদ্ধ হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ; কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয়। গুণসংখ্যানশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যথাবৎ শ্রবণ কর। জ্ঞানী ব্যক্তি বিভক্ত সর্ব্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বারা এক নির্ব্বিকার অবিভক্ত ভাব দেখিয়া থাকে, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জান। যে জ্ঞান সর্ব্বভূতে পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব পৃথক্ ভাবে অবগত করে, তাহাকে রাজস বলিয়া জান। বিনা প্রমাণে এই একটি কার্য্যই সমগ্র. এইরূপ যাহাতে অভিনিবেশ হয়, যাহাতে যথাভূততত্ত্ব কিছুই নাই, যাহা অতি তুচ্ছ, তাহাকে তামস জ্ঞান বলে। যে কর্ম্ম নিয়মসঙ্গত, আসক্তিরহিত, ফললাভে অভিলাষ না করিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ বিনা অনুষ্ঠিত, সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলা যায়। যে কর্ম্ম কোন কামনার বিষয়লাভের জন্য, অহঙ্কারপূর্ব্বক বহু আয়াসে নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে। ভাবী শুভাশুভ, ক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ অপেক্ষা না করিয়া, মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে। সেই কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা যায়, যে 'আমি করিতেছি' এরূপ বলে না, আসক্তিশূন্য, ধৈর্য্য-ও-উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েতেই নির্ব্বিকার। যে কর্ত্তা আসক্তিযুক্ত,

কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধ, হিংস্রস্বভাব, অশুচি, হর্ষ-ও-শোকযুক্ত, তাহাকে রাজস বলা যায়। সেই কর্ত্তাকে তামস বলা যায়, যে অসমাহিত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরাপমানী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী। হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধারণাও ত্রিবিধ, পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই বুদ্ধি সাত্বিকী, যাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জানে। হে পার্থ, যে বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী। অজ্ঞানাবৃত হইয়া যে বুদ্ধি, হে পার্থ, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, সমুদায় বিষয় বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলে। যে অব্যভিচারিণী ধারণা যোগ দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে নিয়মিত করে, হে পার্থ, তাহাকে সাত্বিকী ধারণা বলে। হে পার্থ, ধর্ম্মার্থকামের প্রসঙ্গবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকলকে যদ্দ্বারা নিয়মিত করা হয়, তাহাই রাজসী ধারণা। দুর্ব্বুদ্ধি জন যদ্দ্বারা স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ ও মমতা পরিত্যাগ করে না, হে পার্থ, তাহাই তামসী ধারণা। হে ভরতর্ষভ, আমার নিকট এখন সেই ত্রিবিধ সুখের কথা শ্রবণ কর, যে সুখে অভ্যাসবশতঃ লোকে আমোদিত হয়, এবং যে সুখে সে দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সুখ অগ্রে বিষের মত, পরিণামে অমৃতোপম, সেই সুখকে সাত্বিক বলে ; এই সুখ আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়যোগে অগ্রে অমৃতোপম, পরিণামে বিষের মত যে সুখ, তাহাকে রাজস সুখ বলে। নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হইতে উপস্থিত হইয়া, অগ্রে এবং পশ্চাতে যে সুখ আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে তামস সুখ বলে। পৃথিবীতে এবং স্বর্গে দেবগণমধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই, যে প্রাকৃতিক এই তিন গুণ হইতে বিমুক্ত। হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ইহাদিগের স্বভাবসম্ভূত গুণ দ্বারা কর্ম্ম সকল বিভক্ত হয়। শম, দম তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই সকল ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শৌর্য্য তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন দান, প্রভুত্ব এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, এই সকল বৈশ্যের কর্ম্ম ; শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম সেবা। আপন আপন কার্য্যনিরত থাকিয়া, মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। আপনার কর্ম্মে রত থাকিয়া, যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া

রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও, তদপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। কেন না যে কর্ম্ম স্বভাববিহিত, তাহা করিয়া লোকের পাপ হয় না। হে কৌন্তেয়, স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিবে না। যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত * হয়, তেমনি সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই দোষে আবৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, নিরহঙ্কার, স্পৃহাশূন্য, সেই ব্যক্তি সংন্যাস দ্বারা পরম-নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, অবধারণ কর। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে আপনাকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদিবিষয়পরিত্যাগ, অনুরাগ-ও-দ্বেষ-পরিহার, শুচি অর্থাৎ কোলাহলাদিবর্জ্জিত দেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন এবং কায়-মন-ও বাক্যসংযমপূর্ব্বক, বৈরাগ্যাশ্রয়করত নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইবে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগকরত, শান্ত ও নির্ম্মম হইয়া, ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া, যোগী প্রসন্ন-চিত্ত হয়, শোক করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না, সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন হইয়া, আমার প্রতি পরা ভক্তি লাভ করে। ভক্তি দ্বারা আমি যা, যে পরিমাণ, তত্ত্বতঃ সে জানিতে পারে; তৎপর তত্ত্বতঃ আমায় জানিয়া, জ্ঞানানন্তর আমাতে প্রবেশ করে। কেবল একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে। চিত্তযোগে সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগাশ্রয়পূর্ব্বক নিরন্তর মচ্চিত্ত হও। মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কারবশতঃ না শোন, বিনষ্ট হইবে। যদি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এরূপ মনে কর, এ নির্ব্বন্ধ তোমার মিথ্যা হইবে; প্রকৃতি তোমায়

* ধূমে আবৃত হয়, এ কথা বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে ধূমে আবৃত থাকে, পরে প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিলে আর ধূম থাকে না, তেমনি প্রথম প্রথম স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষ থাকে, কিন্তু ফল-ও-আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক, ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে, দোষ চলিয়া যায় এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন হইয়া, পরম নৈষ্কর্ম্ম্য উপস্থিত হয়।

[যুদ্ধে] নিয়োগ করিবে। হে কুন্তীতনয়, স্বভাবসম্ভূত স্বকর্ম্মে তুমি বদ্ধ রহিয়াছ ; মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়া তাহা করিবে। হে অর্জ্জুন, সকল ভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন ; তিনি যন্ত্রারূঢ়বৎ তাহাদিগকে জ্ঞানশক্তিযোগে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি, এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিবে। গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই জ্ঞান তোমায় বলিলাম, সম্যক্ প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়া, যেমন ইচ্ছা, তেমনি কর। সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম উৎকৃষ্ট কথা আবার তোমায় বলিতেছি, আমার কথা শোন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যজনা কর, আমাকেই নমস্কার কর ; তুমি আমার প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও ; আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। আমি যাহা তোমায় বলিলাম, ইহা তাহাকে বলিও না, যে তপশ্চরণ করে না, ভক্ত নয়, শুশ্রূষু নয়, এবং আমায় অসূয়া করিয়া থাকে। এই পরম গুহ্য [কথোপকথন] যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণের নিকট বলিবে, সে নিঃসংশয় আমায় ভক্তি করিয়া, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ; সে ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্য মধ্যে আর কেহই আমার প্রিয়ানুষ্ঠানকারী নয়, তদপেক্ষা আর কেহই পৃথিবীতে আমার প্রিয় হইবে না। এই আমাদের ধর্ম্মসম্পর্কীণ কথোপকথন যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞে আমারই যজনা করিবে, এই আমার মত। শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অসূয়াশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, সেও মুক্ত হইয়া পুণ্যানুষ্ঠায়িগণের শুভলোক প্রাপ্ত হইবে। পার্থ, তুমি তো একাগ্রচিত্তে শুনিলে ? ধনঞ্জয়, কেমন তোমার মোহ তো বিনষ্ট হইল ? অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, আমার মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার প্রসাদে স্মৃতি লাভ হইল, এখন আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি, স্থির হইয়াছি ; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব।

সুহৃৎপারবশ্য

শ্রীকৃষ্ণকে যখন রাজা দুর্য্যোধন এবং প্রিয় সুহৃৎ অর্জ্জুন সমরে বরণ করিতে যান, তখন তিনি তাঁহাদিগের সন্নিধানে দুইটি অভীষ্ট উপস্থিত করেন।

এক আত্মসম দশকোটি গোপজাতীয় সৈন্য, আর আপনি স্বয়ম্। সৈন্যগণ সংগ্রামস্থলে সমর করিবে, তিনি সমর করিবেন না, তিনি এই কথা বলেন। অর্জ্জুন দশ কোটি সৈন্য পরিহার করিয়া, তাঁহাকে সারথ্যে বরণ করেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৃষ্ণ এই সারথির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; কিন্তু একান্ত প্রীতিপ্রবণচিত্ত বলিয়া, কয়েক বার তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে অমিততেজা ভীষ্ম শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে একান্ত আকুল করিয়া ফেলেন। অর্জ্জুনকে একান্তবিপদ্‌গ্রস্ত দর্শন করিয়া, কৃষ্ণ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। সাত্যকি পলায়মান রাজগণকে নিবারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলেন, সাত্যকি, যাহারা যাইতেছে, যাউক; যাহারা আছে, তাহারাও যাউক। দেখ, আমি আজ ভীষ্ম-দ্রোণকে সগণ রথ হইতে নিপাতিত করিতেছি। কৌরবগণের মধ্যে কেহ আমার ক্রোধ হইতে বাঁচিয়া যাইবে না। আজ চক্রদ্বারা ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়া, আমি অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবের প্রীতিবর্দ্ধন করিব। এই বলিয়া তিনি চক্র ধারণ করিয়া, লম্ফদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতরণ করিলেন, এবং বেগে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি আসিতেছেন, দেখিয়া ভীষ্ম নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ, আগমন করুন। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি আমায় সমরে এখনি রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করুন। আপনি আমায় বধ করিলে, ইহ পরলোকে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে; তিন লোকে আমার প্রভাব প্রসিদ্ধ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি এই বিনাশের মূল, তুমি আজ দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিবে। যে জন ধর্ম্মপথস্থ সুমন্ত্রী হয়, সে অন্যায়দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ নৃপতিকে নিবারণ করিবে। যদি তাহাতে কোন ফলোদয় না হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কেন না কাল উপস্থিত বলিয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, সে কুলপাংসন। ভীষ্ম এ কথার উত্তর দিলেন, রাজা পরম দেবতা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন বুঝিলেন না, কংসকে যেমন যদুগণ বুঝিয়া হিতার্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তাহারই ক্লেশের জন্য দৈববশাৎ বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে, কে আর হিতশ্রবণ করিবে? এই সময়ে অর্জ্জুন সত্বর রথ হইতে লম্ফদানপূর্ব্বক, নিম্নে পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া,

শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে লইয়াই অগ্রসর হইলেন। এইরূপে দশ পা অগ্রসর হইলে, অর্জ্জুন কৃষ্ণের গতি স্থগিত করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি কোপ প্রতিসংহরণ করুন। আপনি পাণ্ডবগণের গতি, আপনার পুত্র ও সোদরগণের শপথ, যেন আমাদের প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম ছাড়িতে না হয়। যাহাতে আপনার প্রেরণায় কুরুগণের অন্ত প্রাপ্ত হই, তাহাই করুন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় নিশ্চয় শ্রবণ করিয়া, তিনি হৃষ্টমনে রথে গিয়া পুনরায় আরোহণ করিলেন। নবম দিবসের যুদ্ধেও ঠিক এই প্রকার ঘটনা হয়। তিনি অর্জ্জুনকে মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, আর থাকিতে পারেন না, ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য রথ হইতে লম্ফদান করিয়া পড়েন। ভীষ্ম তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করেন, আপনাকে তাঁহার দাসরূপে পরিচয় দিয়া, তাঁহার হস্তে মৃত্যু শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। অর্জ্জুন নিবৃত্ত করিবার সময়ে বলেন, আপনি নিবৃত্ত হউন, আপনি আপনার কথা মিথ্যা করিবেন না। আপনি বলিয়াছিলেন, আমি যুদ্ধ করিব না, যুদ্ধ করিলে আপনাকে যে লোকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার উপরে সমুদায় ভার, আমি পিতামহকে বধ করিব, শস্ত্র, সত্য এবং পুণ্যের শপথ করিতেছি। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া, কিছু না বলিয়া, সক্রোধ রথে গিয়া পুনরায় আরোহণ করিলেন।

ভীষ্মের পরাক্রমে পাণ্ডবসৈন্যসকল বিনাশোন্মুখ হইয়া পড়িল, কিছুতেই যে তিনি পরাজিত হইবেন, এ আশা সকলের মন হইতে দিন দিন অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির আকুল হইয়া, যখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, আপনার এই সকল দুর্জ্জয় বীর শত্রুক্ষয়কারী ভ্রাতৃগণ থাকিতে, আপনি বিষাদ করিবেন না। ভীম ও অর্জ্জুন বায়ু ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, মাদ্রীতনয়দ্বয় ত্রিদশাধিপতির ন্যায় বিক্রমশালী। আমাকেও যুদ্ধে নিয়োগ করুন, আমি সৌহৃদ্যবশতঃ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনি আমায় নিয়োগ করিলে, আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে পারি? অর্জ্জুন যদি বধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সম্মুখে যুদ্ধে ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া হনন করিব। যদি ভীষ্ম হত হইলেই জয় হয়, মনে করেন, তবে আজই আমি একাকী কুরুবৃদ্ধ পিতামহকে বধ করিব। যুদ্ধে আপনি মহেন্দ্রের ন্যায় আমার বিক্রম দেখুন। ভীষ্ম মহাস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিবেন, আমি সেই

অবস্থায় তাঁহাকে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিব। পাণ্ডুপুত্রগণের যে শত্রু, সে আমার শত্রু, তাহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা আপনার, তাঁহারা আমার, যাঁহারা আমার, তাঁহারা আপনার। আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং শিষ্য। আমি তাঁহার জন্য শরীরের মাংস কাটিয়া দিব, ইনিও আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিবেন। আমাদিগের পরস্পরের প্রতিজ্ঞা এই, আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব। তবে পার্থ যে, জনসন্নিধানে ঘোর যুদ্ধকালে "আমি ভীষ্মকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার এ কথা রক্ষা করিতে হইবে। অর্জ্জুন আমায় অনুজ্ঞা করিলে, আমি নিঃসংশয় হইয়া এ কাজ করিতে পারি। অথবা অর্জ্জুনের এ ভার অতি সামান্য, ইনিই সংগ্রামে ভীষ্মকে জয় করিবেন। পার্থ উদ্যম করিলে, অশক্য কার্য্যও করিতে পারেন। সমুদায় দেবগণ যদি দৈত্যদানব সহ মিলিত হইয়া সংগ্রাম করেন, ইনি তাঁহাদিগকে বধ করিবেন; ভীষ্ম আর কোন্ কথা? মহাবীর্য্য ভীষ্ম ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন, তিনি আর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিয়া সাহায্য করিবে, এই যে বলিয়াছ, তাহা তোমার আমার গৌরবরক্ষা করিবার জন্য, মিথ্যা করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। তবে ভীষ্ম সহ যে মন্ত্রণা করিবার কথা ছিল, তাহাই করা যাউক।

অভিমন্যুবধে শোকাতুর অর্জ্জুন যখন জয়দ্রথবধে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং পর দিন বধ করিতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, নিশ্চয় করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিমনা হন। তাঁহার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করিয়া, ঈদৃশ সাহসিকতা প্রকাশ করাতে দুঃখিত এবং কি জানি বা উপহাসাস্পদ হইতে হয়, ভাবিয়া আশঙ্কান্বিত হন। জয়দ্রথকে বধ না করিয়া, যাহাতে সূর্য্য অস্তমিত না হয়, এ জন্য তিনি চিন্তান্বিত হন, এবং রজনীতে সারথি দারুককে রথে অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত করিয়া লইতে আদেশ করেন, কেন না অর্জ্জুনকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিলে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে সাত্যকি সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার হস্তে বিপদ্‌গ্রস্ত হন। কৃষ্ণের নিদেশানুসারে অর্জ্জুন তাহার বাহু ছেদন করেন। সমগ্র দিন যুদ্ধ করিতে করিতে বেলা অবসান হইয়া আইসে, সূর্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে অস্তমিত উদ্যত

হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই দেখিয়া সূর্য্যাবরণজন্ত যোগাবলম্বন করা স্থির করিলেন *। তাঁহার যোগপ্রভাবে অন্ধকার উৎপন্ন হইল, এবং সূর্য্য অস্ত হইল, এইরূপ সকলের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইল †। সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, দেখিবার জন্য জয়দ্রথ যখন মস্তক উত্তোলন করিল, তখন তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহাকে এই বধ করিবার অবসর উপস্থিত। অর্জ্জুন রক্ষক নৃপালগণকে অস্ত্রে বিদ্ধ, বিমুখ ও হত করিয়া, বাণ দ্বারা সিন্ধুপতি জয়দ্রথের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক, শরযোগে শূন্যে রাখিয়া, তাহার পিতার ক্রোড়ে নিঃক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহার পিতার তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ হইল। আখ্যায়িকা এই, জয়দ্রথপিতা তপস্যায় এই বর গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

জয়দ্রথের বধানন্তর, দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণের নিকট শোকপ্রকাশ করিয়া, তনুত্যাগ প্রার্থনা করাতে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হন। তিনি তাই রাত্রিকালে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। এই রজনীযুদ্ধে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ হত হয়। পাণ্ডবসৈন্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ঘটোৎকচকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। ঘটোৎকচ কুরুসৈন্য মধ্যে মহাবিপ্লব সমুপস্থিত করে। পরিশেষে ঘোরবিপদ্ দর্শন করিয়া, কর্ণ একঘ্নীশক্তিযোগে ঘটোৎকচকে বধ করেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ অতীব হর্ষ প্রকাশ করেন, কেন না অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য এই শক্তি রক্ষিত হইয়াছিল, ঘটোৎকচবধে সেই শক্তি নিযুক্ত হওয়াতে, অর্জ্জুন বিপচ্ছূন্য হইলেন।

অসত্যভাষণে প্ররোচনা

মহাবীর দ্রোণ রণে পঞ্চালসৈন্যসমুদায়বধে প্রবৃত্ত হন। এমনই ক্ষয় তিনি

---

* "ন শক্যঃ সৈন্ধবো হন্তুং যত্তো নির্ব্যাজমর্জ্জুন।
যোগমত্র বিধাস্যামি সূর্য্যস্যাবরণং প্রতি॥"
মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ১৪৬ অ, ৬৪ শ্লোক।

† "ততোঽসৃজত্তমঃ কৃষ্ণঃ সূর্য্যস্যাবরণং প্রতি।
যোগী যোগেন সংযুক্তো যোগিনামীশ্বরো হরিঃ॥
সৃষ্টে তমসি কৃষ্ণেন গতোঽস্তমিতি ভাস্করঃ।
ত্বদীয়া জহৃষুর্যোধাঃ পার্থনাশান্নরাধিপ॥"
মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ১৪৬ অ, ৬৮—৬৯ শ্লোক।

উপস্থিত করেন যে, পাণ্ডবগণের মন হইতে জয়াশা তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই ঘোর বিপদ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে বলেন, ইনি যখন ধনু হস্তে লইয়া থাকিবেন, তখন ইন্দ্র সমুদায় দেবগণ সহ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও কিছুতেই ইঁহাকে জয় করিতে পারিবেন না। ইনি যদি ধনু ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে মানুষেরাও ইঁহাকে বধ করিতে পারে। অতএব বলিতেছি, পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া, ইঁহাকে জয় করিতে এমন উপায় করুন, যাহাতে ইনি আমাদিগের সকলকে বধ করিতে না পারেন। আমার মনে হইতেছে, অশ্বত্থামা যুদ্ধে হত হইয়াছে, এই কথা কোন ব্যক্তি ইঁহাকে বলুক। এ কথা অর্জ্জুনের রুচিকর হইল না, আর সকলেরই রুচিকর হইল, যুধিষ্ঠির কষ্টে সায় দিলেন। এইরূপ স্থির হইলে, ভীম মালবাধিপতি ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামানামে প্রসিদ্ধ গজ গদাঘাতে বধ করিলেন। তদনন্তর সলজ্জ ভীমসেন দ্রোণসম্মুখে আসিয়া, মনের ভিতরে অশ্বত্থামা গজ হত হইয়াছে রাখিয়া, মুখে অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, এই কথা বলিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া, আচার্য্যের শরীর প্রথমতঃ ঘর্ম্মার্দ্র হইল, পরে আপনার পুত্রের বল স্মরণ করিয়া, তিনি সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে যে, বীরপ্রধান আচার্য্য দ্রোণকে ক্ষত্রিয়ক্ষয়ে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া, ঋষিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহাকে শস্ত্রত্যাগ করিতে বলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া আর অসৎ বধকার্য্য না করেন, এজন্য দ্রোণ এই কথা শুনিতে পান, যাহারা ব্রহ্মাস্ত্র জানে না, তাহাদিগকে সেই অস্ত্রে বধ করা মহাপাপ, ঈদৃশ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন, তাহার সময় উপস্থিত, যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হউন। ভীমের এবং ঋষিগণের কথা শ্রবণ এবং যুদ্ধার্থ ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত দর্শন করিয়া, তিনি বিমনা হন। এই অবস্থায় তিনি, আপনার পুত্র হত হইয়াছে বা হয় নাই, এ কথা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। আচার্য্যের বিশ্বাস ছিল, যুধিষ্ঠির তিন লোকের ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেও, কখন মিথ্যা বলিবেন না; তাই তিনি আর কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট সত্যকথাশ্রবণানন্তর, আচার্য্য পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ এইটি জানিতে পাইয়া, ব্যথিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, দ্রোণ হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার সত্য হইতে

মিথ্যা বলা শ্রেয়। জীবনের জন্ম মিথ্যা বলিয়া লোক মিথ্যাসংস্পৃষ্ট হয় না। বহুপত্নীক ব্যক্তির পত্নীগণের নিকটে, বিবাহে, গরুর আহার ও যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ-আহরণে এবং ব্রাহ্মণের উপকারার্থ মিথ্যা বলিলে পাতক হয় না *। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভীমসেন আসিয়া বলিলেন, আমি দ্রোণের ইহাই বধোপায় শ্রবণ করিয়া, মালবাধিপতি ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বথামা গজ বধ করিয়াছি; আমি দ্রোণকে অশ্বথামা হত হইয়াছে বলিলাম, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। যদি জয় চান, শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, আপনি তাহারই অনুসরণ করুন। আপনি তিন লোকে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ; আপনি বলিলে, আচার্য্য আর যুদ্ধ করিবেন না। ভীমের কথা শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণবাক্যে প্ররোচিত হইয়া, জয়াসক্ত যুধিষ্ঠির 'অশ্বথামা হত' এই বলিয়া, অস্ফুটভাবে বলিলেন, 'গজ'। কথিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিত না, চতুরঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিত; এই অসত্য কথা বলিবামাত্র, তাঁহার রথের অশ্বগুলি ভূমিস্পৃষ্ট হইল। বস্তুতঃ যুধিষ্ঠির ইতঃপূর্ব্বে পৃথিবীর ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেন, এখন মিথ্যা বলিয়া যে পৃথিবীর জীব হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার মিথ্যাভাষণে আচার্য্যকে একেবারে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তবে তিনি হতবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শস্ত্রত্যাগ যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণে হয় নাই, পশ্চাৎ ভীমের দৃঢ় ভর্ৎসনায় সংঘটিত হইয়াছিল।

বিনেতৃত্ব

মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে অতীব ব্যথিত হইয়া, রণভূমি হইতে অপসৃত হন এবং সেনানিবেশে গিয়া শয়ন করেন। অর্জ্জুন অশ্বথামাকে পরাজিত করিয়া দেখিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির রণস্থলে নাই। ধর্ম্মরাজ কোথায়, মহাবল ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, কর্ণবাণে তিনি অতিমাত্র উৎপীড়িত হইয়াছেন, এই মাত্র জানি। জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না। অর্জ্জুন ভীমসেনকে তাঁহার সংবাদ লইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি

---

* "শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্ত্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে॥" মনু ৮অ, ১০৪ শ্লোক।
"কামিনীষু বিবাহেষু গবাম্ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্॥" ঐ ১১২ শ্লোক।

বলিলেন, তুমি যাও, আমি যদি এখন রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাই, তবে সকলে বলিবে, আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। অর্জ্জুন বলিলেন, সংসপ্তকগণ প্রতিযোদ্ধা উপস্থিত, ইহাদিগকে পরাজিত না করিয়া, আমি কি প্রকারে যাই। ভীম উত্তর দিলেন, আমি সংসপ্তকগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি, তুমি গিয়া মহারাজের সংবাদ লইয়া আইস।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার দেখিতে অভিলাষ হইয়াছে, আপনি সৈন্যগণসম্মুখ হইতে রথ প্রত্যাবর্ত্তিত করুন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রত্যাগত দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে হইল, তাঁহারা কর্ণকে বধ করিয়া, তাঁহাকে আসিয়া বন্দনা করিতেছেন। কিন্তু যখন অর্জ্জুনের প্রত্যুত্তরে জানিলেন যে, এখনও কর্ণ হত হয় নাই, তখন যুধিষ্ঠির নিতান্ত অধীর হইয়া, অর্জ্জুনকে কঠোরবাক্যে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভৎর্সনায় এত দূর অগ্রসর হইলেন যে; তিনি অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবত্যাগপূর্ব্বক উহা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া সারথি হইতে বলিলেন এবং তাঁহার না জন্মান ভাল ছিল বলিয়া, ধিক্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভৎর্সনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার জন্য খড়্গধারণ করিলেন। চিত্তজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি, খড়্গ ধারণ করিলে কেন? তুমি মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছিলে, তিনি কুশলে আছেন, দেখিতে পাইলে। এ আহ্লাদ করিবার সময়, এ কি তোমার মোহ উপস্থিত! কাহাকেও তোমার বধ্য দেখিতেছি না; কাহাকে তুমি বধ করিতে ইচ্ছুক? তোমার কি চিত্তবিভ্রম উপস্থিত? তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গোত্তোলন করিতেছ কেন? কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন সর্পের ন্যায় ঘন ঘন শ্বাসত্যাগপূর্ব্বক, যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি আমায় এই গাণ্ডীব অপরকে দিতে বলিবে, আমি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব। আজ রাজা আপনার সম্মুখে আমায় সেই কথা বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি না, তাঁহাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিব, সত্যের নিকটে অঋণী হইব, আমার শোক ও জ্বালাও চলিয়া যাইবে। এ সময় আপনি কি মনে করিতেছেন, আপনি এ জগতের গতাগত সমুদায় বিষয় জানেন, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, এখন জানিলাম, অর্জুন, বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই, তাই অসময়ে তোমার ক্রোধ সমুপস্থিত। যে ব্যক্তি ধর্মের বিভাগজ্ঞ, সে কখন এরূপ করে না। অকার্য্য ও কার্য্য, কার্য্য ও অকার্য্যগুলির যে একত্র যোগ করে, সে পুরুষাধম। যাহারা ধর্মানুসরণ করিয়া ধর্মের বিষয় বলেন, তাঁহারা উহার সংক্ষেপ ও বিস্তার অবগত। তুমি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত জান না। কার্য্যাকার্য্যনিশ্চয়বিষয়ে স্থির নিশ্চয় কি, যাহারা জানে না, তুমি যেমন মূঢ়তা প্রকাশ করিতেছ, তেমনি তাহারা অবশ হইয়া মূঢ়তা প্রকাশ করে। কোন্‌টি কার্য্য, কোন্‌টি অকার্য্য, সহজে জানিতে পারা যায় না, শাস্ত্রযোগে উহা জানিতে পারা যায়। তুমি কিন্তু শাস্ত্র বোঝ না। তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ যাহাকে ধর্ম বলিয়া রক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহাতে যে প্রাণিবধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অসত্য বলিবে, তবু প্রাণিবধ করিবে না। এমত স্থলে তুমি প্রাকৃত জনের ন্যায় ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজাকে কি প্রকারে বধ করিবে? শত্রুও যখন যুদ্ধ করে না, পরাঙ্মুখ, পলায়মান, শরণাগত, কৃতাঞ্জলি, বিপন্ন বা প্রমত্ত, তাহাকে বধ করা পণ্ডিতেরা অনুমোদন করেন না; এ সকলই তোমার গুরুজনেতে উপস্থিত। তুমি যে ব্রতগ্রহণ করিয়াছ, তাহা বাল্যকালে। এখন তাহারই জন্য মূঢ়তাবশতঃ কাজ করিতে চাহিতেছ? তুমি ধর্মের সূক্ষ্ম গতি অবধারণ না করিয়া, গুরুজনকে বধ করিতে ধাবমান। আমি তোমাকে সেই ধর্মের রহস্য বলিতেছি, যাহা ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর এবং কুন্তী তোমায় বলিবেন। 'সত্য' এ কথাটী উৎকৃষ্ট, সত্য অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। যে ব্যক্তি সত্যানুষ্ঠান করিল, তাহার সত্য অনুষ্ঠিত হইল কি না, এ কথা ঠিক জানা কঠিন। সেই সেই স্থলে সত্য বলা উচিত নয়, অসত্য বলা উচিত যে স্থলে মিথ্যাই সত্য, সত্যই মিথ্যা হইয়া থাকে। যে স্থলে প্রাণাত্যয় উপস্থিত, সে স্থলে, বিবাহে, এবং যেখানে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইবার উপক্রম, সেখানে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। বিবাহকাল, পত্নীগণের প্রীতিরক্ষা, প্রাণাত্যয়, সর্ব্বস্বাপহার, ব্রাহ্মণের উপকার, এই পাঁচটি স্থলে মিথ্যা পাপ নহে, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এ স্থলে মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়। সত্যানুষ্ঠান করিয়া বালকেই মনে করে যে, সত্যানুষ্ঠান করিল; কিন্তু সত্য ও মিথ্যা এ দুইয়ের নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিয়া, তবে ধর্মবিৎ হয়।

কি আশ্চর্য্য, সুদারুণ ব্যক্তিও প্রাজ্ঞ হয় এবং সুমহৎ পুণ্য লাভ করে, যেমন [ব্যাধ] বলাক অন্ধকে বধ করিয়া পুণ্যলাভ করিয়াছিল। আবার কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্মকাম হইয়াও মূঢ় অপণ্ডিত হয় এবং সুমহৎপাপভাজন হয়, যেমন কৌশিকের ঘটিয়াছিল।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই দুইটী আখ্যায়িকা বলিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি সেই দুই আখ্যায়িকা * বলিলেন এবং ধর্ম্মের অর্থ ধারণ, যদ্দ্বারা প্রজা বিধৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, সুতরাং অহিংসাসংযুক্ত যাহা, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা বুঝাইয়া, প্রাণ-রক্ষাদিস্থলে সত্যভঙ্গে পাপ নাই, এইটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, এখন যুধিষ্ঠির বধ্য, ইহা কি তোমার মনে হইতেছে? অর্জ্জুন উত্তর দিলেন, আমাদের যাহাতে হিত হয়, আপনি তাহাই বলিয়া থাকেন। আপনি আমাদের মার মত, পিতার মত, পরম গতি, তাই আপনার কথা উত্তম। তিন লোকে আপনার কিছু অবিদিত নাই, তাই আপনি যথাযথ পরম ধর্ম্ম জানেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অবধ্য, ইহা বুঝিলাম; এখন আমার প্রতিজ্ঞা কিসে রক্ষা পায়, তাহার উপায় বলুন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ এই উপায় বলিয়া দিলেন, মানার্হ ব্যক্তি যখন মানলাভ করেন, তখন তিনি জীবিত; যখন তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়েন, তখন তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত। যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভর্ৎসনা করিলেই, তাঁহার বধ হইবে; কেন না, গুরুজনকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই, তাঁহাকে বধ করা হয়। আগে এইরূপে তাঁহাকে বধ করিয়া, পরে পায়ে ধরিয়া ক্ষমাগ্রহণ করিতে, অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার উপদেশানুসারে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

* এ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা এই, বলাকনামক ব্যাধ এক দিন মৃগয়ায় কোন জন্তু পায় না। একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘ্রাণচক্ষু জন্তু জলপান করিতেছিল, তাহাকে সে বধ করে। এই জন্তু সর্ব্বভূত-বিনাশার্থ তপ করিয়া বর প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মা চক্ষু অন্ধ করিয়া দেন। সেই জন্তুকে ব্যাধ হনন করাতে, সে স্বর্গগামী হয়। আর কৌশিক সর্ব্বাবস্থায় সত্য বলিবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এক দিন এক দল দস্যু কতকগুলি লোকের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই লোকগুলি বনে আসিয়া লুক্কায়িত হয়। দস্যুগণ আসিয়া কৌশিককে তাহাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সত্য বলেন, তাহাতে সেই সকল লোকের দস্যুহস্তে প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই পাপে কৌশিক নিরয়গামী হয়েন।

সারথ্যে নিপুণতা

যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেন যে, প্রতিপক্ষনিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত হইবার নহে, তখনি রথ এমন করিয়া ঘুরাইয়া দিতেন যে, বাণ সকল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, ব্যর্থ হইয়া যাইত। কর্ণ সহ শেষ দিনের সময়ে, অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য, সর্পমুখ রিপুঘ্ন বাণ কর্ণ নিক্ষেপ করেন। এই বাণের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ সেই বাণ আসিতেছে দেখিয়া, পদদ্বারা রথ এমন করিয়া চাপিলেন যে, উহা একেবারে দ্বাদশ অঙ্গুলি মৃত্তিকায় মগ্ন হইয়া গেল, অশ্বগুলি জানুভগ্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। ইহাতে সেই অস্ত্র আসিয়া, অর্জ্জুনের শিরোলগ্ন না হইয়া, তাঁহার দিব্য-কিরীট হরণ করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ সারথ্যকৌশলে অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষা করিয়া, পরিশেষে আপনি বাহুবলে রথ মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন।

ছল-স্বীকার

রাজা দুর্য্যোধন সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করে। সেখানে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ গমন করিয়া, ছলুক্তিতে তাহাকে হ্রদ হইতে উত্তোলন করিলেন। দুর্য্যোধন ভীম সহ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে একান্ত বিশারদ, ন্যায়-যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করার কিছু মাত্র সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভীমের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের ইঙ্গিতানুসারে ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, তাহাকে ভূতলে পাতিত করেন। বলদেব তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, গদাযুদ্ধ দর্শন করিতে-ছিলেন, তিনি এই অন্যায়-যুদ্ধ দর্শন করিয়া, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমের প্রতিজ্ঞা এবং মৈত্রেয়ের অভিশাপের কথা বলিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পরিশেষে তিনি কলিযুগের সমাগম এবং ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া, সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ধর্ম্মের ছল শুনিয়া, বলরামের মনে প্রীতি জন্মিল না। তিনি যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, ধর্ম্মাত্মা দুর্য্যোধন নৃপতিকে অধর্ম্মে বধ করিয়া, পাণ্ডবগণের কপট যোদ্ধৃত্ব পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ থাকিবে। দুর্য্যোধন নিষ্কপট যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইনি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, আপনাকে অমিত্রাগ্নিতে দহন করিয়া, কীর্ত্তিরূপ অবভৃথ লাভ করিলেন। ভীম ভূমি-নিপতিত দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, অচেতন নিপতিত বন্ধুহীন দুর্য্যোধনের মস্তক ভীমসেন পদদ্বারা দলন করিতেছেন, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া, এ অধর্ম্মের কেন অনুমোদন করিতেছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি অনুমোদন করিতেছি না, কিন্তু ভীমের মনের বহু ক্লেশ স্মরণ করিয়া, কিছু বলিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ এতচ্ছ্রবণে অতি কষ্টে বলিলেন, হউক।

দুর্য্যোধনকে নিপতিত দেখিয়া, সকলেই আহ্লাদিত হইয়া, অনেক কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ানুপযোগী কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে শত্রু মরিয়াছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ উগ্রবাক্যে হনন করা সমুচিত নয়। এ নির্লজ্জ পাপাচারী, তখনই হত হইয়াছে, যখন পাপাচারিগণের সঙ্গে মিশিয়া, লোভবশতঃ বন্ধুগণের শাসনাতিক্রম করিয়াছে। বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, ইঁহারা পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবগণের জন্য পিত্রংশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এ দেয় নাই। এখন এ শত্রুই হউক, আর মিত্রই হউক, কাষ্ঠের মত ছিন্ন, ইহার উপরে আর বাক্যবর্ষণে প্রয়োজন কি? ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা অমাত্যজ্ঞাতিবন্ধুসহকারে মরিল, নরপালগণ আসুন, আমরা রথারোহণে চলিয়া যাই। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের এই নিন্দাবাক্য শুনিয়া, ক্রোধে দুই হাতে ভূমির উপরে ভর দিয়া, পশ্চাদ্ভাগের উপরে বসিয়া, কৃষ্ণের দিকে ভ্রূকুটিদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, রে কংসদাসের তনয়, তোর এত লজ্জা হয় না যে, গদাযুদ্ধে অধর্ম্মে আমাকে ভূপাতিত করিয়াছিস্। উরু ভগ্ন করিয়া ভীম আমাকে মারুক, অর্জ্জুনকে এই বিষয় যে মনে করাইয়া দিয়াছিস্, তাহা কি আমি জানি না? যে সকল নরপাল নিষ্কপট যুদ্ধ করিয়াছেন, বিবিধ কপট উপায়ে তাহাদিগকে বধ করাইয়া তোর লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই। প্রতিদিন পিতামহ বহু বীরকে মারিতেছিলেন, শিখণ্ডীকে সম্মুখে লইয়া তাঁহাকে বধ করাইলি। অশ্বত্থামা নামে হস্তী বধ করাইয়া, আচার্য্যকে শস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিলি; তাহা কি আমি জানি না? নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁহাকে বধ করিল, তুই দেখিয়াও নিবারণ করিলি না। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের বধের জন্য যে শক্তি যাচ্ঞা করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ছলপূর্ব্বক ঘটোৎকচে প্রয়োগ করাইয়াছিস্; তোর তুল্য কে আর পাপকারী আছে? ভূরিশ্রবা ছিন্নহস্ত হইয়া প্রায়োপবেশনে ছিলেন তোর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সাত্যকি তাঁহাকে বধ করিয়াছে; কর্ণ যে সময়ে ভূমগ্ন

রথচক্র তুলিতে ব্যগ্র, সেই সময় তাঁহাকে পরাজয় করা হইয়াছে। এ নিশ্চয়, যদি আমার সঙ্গে এবং ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের সঙ্গে নিষ্কপট যুদ্ধ করা হইত, কখন তোর জয় হইত না। তুই অনার্য্য, যে সকল রাজন্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, তাঁহাদিগকে এবং আমাদিগকে কপট পন্থায় বধ করাইয়াছিস্।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তুমি পাপপথাশ্রয় করিয়াছিলে, তাই ভ্রাতা পুত্র বন্ধু সুহৃদ্ ও স্বগণ সহ মরিলে। তোমারই পাপে ভীষ্ম দ্রোণ হত হইলেন। তোমার চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া, কর্ণের মৃত্যু হইল। আমি তোমার নিকটে গিয়া, পাণ্ডবদিগের জন্য পিত্রংশ স্বরাজ্য চাহিলাম, শকুনির পরামর্শে লোভ-বশতঃ দিলে না। তুমি ভীমসেনকে বিষ দিয়াছিলে, পাণ্ডুপুত্রদিগকে জতুগৃহে মাতার সঙ্গে পুড়াইতে যত্ন করিয়াছিলে, দ্যূতক্রীড়ায় রজস্বলা যাজ্ঞসেনীকে ক্লেশ দিয়াছিলে, দুরাত্মা নির্লজ্জ তখনই তুমি বধ্য হইয়াছ। ধর্ম্মরাজ অক্ষ-ক্রীড়ায় নিপুণ নহেন, তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ানিপুণ শকুনি দ্বারা ছলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছিলে; তাই তুমি রণে হত হইলে। তৃণবিন্দুর আশ্রমে মৃগয়ার্থ গমন করিলে, পাপিষ্ঠ জয়দ্রথ দ্বারা কৃষ্ণাকে ক্লেশ দিয়াছিলে এবং এক অভিমন্যুকে বহুরথী দ্বারা বধ করাইয়াছিলে; সেই পাপে রণে হত হইলে। আমরা যে সকল অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তুমি বলিতেছ, তোমারই অতিমাত্র বৈগুণ্যে সে সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি কি বৃহস্পতিশুক্রের উপদেশ শ্রবণ কর নাই? তুমি বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই, তাই হিতবাক্য-শ্রবণ করিলে না। তুমি অতি-প্রবল লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া অকার্য্য সকল করিয়াছিলে, এখন তাহাতে যে বিপাক উপস্থিত, তাহা ভোগ কর।

দুর্য্যোধন উত্তর দিল, আমি বিধিমত অধ্যয়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি, শত্রুগণের মস্তকে আমার স্থান; আমার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যবান্ কে? স্বধর্ম্ম জানিয়া, ক্ষত্রিয়গণের যাহা অভিলষিত, সেই নিধন আমি প্রাপ্ত হইলাম; আমা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যবান্ কে? যে সকল ভোগ দেবগণের উপযুক্ত, মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্লভ, তাদৃশ উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি; আমাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ কে? কৃষ্ণ, আমি সুহৃৎ ও অনুজ-গণকে লইয়া স্বর্গে যাইতেছি; তোমরা হতসঙ্কল্প হইয়া, শোক করিতে করিতে জীবন যাপন কর।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইল, সাধু সাধু ধ্বনি হইল। এতদ্দর্শনে সকলে লজ্জিত হইলেন, ভীষ্মাদির অন্যায় বধ স্মরণ করিয়া, পাণ্ডবগণ একান্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া বলিলেন, দুর্য্যোধন অতি দ্রুত গদাচালনে নিপুণ, তাঁহারা সকলেই মহারথ, তোমরা কখন নিষ্কপট যুদ্ধে ইঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতে না। আমি অনেক উপায়ে, অনেক বার মায়াযোগে তোমাদিগের হিতাভিলাষ করিয়া, ইঁহাদিগকে বধ করাইয়াছি। যদি আমি যুদ্ধে এরূপ ছল আশ্রয় না করিতাম, তোমাদের কোথায় বা বিজয় থাকিত, কোথায় বা রাজ্য থাকিত, কোথায় বা ধন থাকিত? ভীষ্ম প্রভৃতি চারি জন পৃথিবীতে মহাত্মা অতিরথ, স্বয়ং লোকপালগণও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না। এই ধৃতরাষ্ট্রতনয় গতক্লম হইয়া, গদা হস্তে ধারণ করিলে, যমও ইহাকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে অশক্ত। এই যে শত্রুকে মিথ্যা উপায়ে বধ করা হইল, ইহাতে তোমরা কিছু মনে করিও না। অনেক বলবান্ শত্রু মিথ্যা উপায়ে পূর্ব্বে হত হইয়াছে। অসুরঘাতী দেবগণ এবং সাধুগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পথের সকলেই অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা সকলে কৃতকৃত্য হইলাম, এখন সায়াহ্নে এক স্থানে বাস নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্রাম করা যাউক।

গর্ভসংরক্ষণপ্রতিজ্ঞা *

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডুতনয়গণের পঞ্চ পুত্র বধ করাতে, দ্রৌপদী শোকে একান্ত অধীর হইয়া, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলকে দুরক্ষর বাক্যে ভর্ৎসনা করেন। তাঁহার শোকাপনয়ন জন্য, অগ্রে ভীম, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিতে গমন করেন। দ্রোণাত্মজ ব্রহ্মশিরোস্ত্র অবগত আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন †। সে অস্ত্র অর্জ্জুন বিনা আর কেহ

* ভাগবতাদি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে অলৌকিক বর্ণনা আছে, মহাভারতে তাহার কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, এই মাত্র ইহাতে উল্লিখিত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপার বর্ণিত নাই। পরিক্ষিৎ মৃতবৎ জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রযত্নে জীবনলাভ করিয়াছিলেন. তাহাতেই এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

† আচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি প্রীত হইয়া, ব্রহ্মশিরোস্ত্র তাঁহাকে শিক্ষা দেন। পুত্র অশ্বত্থামা ইহা জানিতে পাইয়া, সেই অস্ত্রশিক্ষা করিতে অতীব অধীর হইয়া পড়েন। দ্রোণ তাঁহার পুত্রের চাপল্য জানিতেন, তাই সে অস্ত্র তাঁহাকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

জানিতেন না, তাই তিনি সত্বর অর্জ্জুন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভাগীরথীতীরে গমন করেন। অশ্বত্থামা পৃথিবীকে অপাণ্ডব করিবার উদ্দেশে, মন্ত্রযোগে কাশতৃণ ব্রহ্মশিরোস্ত্র করিয়া প্রহার করেন, অর্জ্জুন সেই অস্ত্রের বিনাশজন্য দ্বিতীয় ব্রহ্ম-শিরোস্ত্র ত্যাগ করেন। উভয় অস্ত্রে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত করাতে, নারদ ও ব্যাস মধ্যবর্ত্তী হন। অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়া অস্ত্র প্রতিসংহরণ করেন, দ্রোণি করেন না, সেই অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হইবে, এইরূপ বলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহার এই উত্তর দেন যে, এক জন ব্রতচারী ব্রাহ্মণ উত্তরাকে বলিয়াছিলেন, কুরুগণ ক্ষয় হইলে তোমার পুত্র হইবে, তাই তাহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে, আজ সে কথা সত্য হইল। অশ্বত্থামা বলেন, এ তোমার পক্ষপাতের কথা, দেখি, তুমি কি প্রকারে তাহার গর্ভরক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথায় এইরূপ উত্তর দেন যে, এ অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি এই বালহত্যাপাপে তিন হাজার বৎসর নানাব্যাধিযুক্ত হইয়া, পূয়শোণিত দুর্গন্ধময় দেহ লইয়া, ঘোরারণ্যে ভ্রমণ করিবে। এই গর্ভ মৃত হইয়া জন্মিয়াও, দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং ষাট বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। আমি এই শস্ত্রাগ্নিদগ্ধ সন্তানকে বাঁচাইব, আমার তপস্যা ও সত্যের বল দর্শন কর। অনন্তর অশ্বত্থামার মস্তকস্থ মণি গ্রহণপূর্ব্বক, পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। সেই অমূল্য মণি পাইয়া দ্রৌপদী আশ্বস্তা হন, এবং তাঁহার অনুরোধে যুধিষ্ঠির মস্তকে উহা ধারণ করেন।

গান্ধারীর অভিশাপ

রণক্ষেত্রে নিপতিত পুত্রপৌত্রদিগকে দর্শন করিয়া, গান্ধারী বহু বিলাপ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিল, তুমি দেখিয়া উপেক্ষা করিলে; তোমার শক্তিমান্ বহু ভৃত্য ছিল, সৈন্য ছিল, তুমি ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে পারিতে, অথচ রক্ষা করিতে যত্ন করিলে না, তুমি ইহার ফলভোগ করিবে। আমি পতিশুশ্রূষা করিয়া যে কিছু তপ-

---

পুত্রের অনুরোধ কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা দেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এ অস্ত্র কখন কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ না করা হয়। সেই প্রতিজ্ঞায় দুঃখিত হইয়া, দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় উপস্থিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মশিরোস্ত্র দিয়া, তাঁহার চক্র লইতে প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাকে চক্র তুলিয়া লইতে বলেন, তুলিতে না পারিয়া, লজ্জিত হইয়া, ধনাদিগ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করেন।

উপার্জ্জন করিয়াছি, সেই তপোবলে তোমায় অভিশাপ দিতেছি, আজ হইতে ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে, তুমি আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া, হতজ্ঞাতি, হতপুত্র, হতামাত্য বনে বিচরণ করিবে এবং সেখানে কুৎসিত উপায়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তোমারও স্ত্রীগণ এইরূপ হতপুত্র, হতজ্ঞাতিবন্ধুবান্ধব হইয়া রোদন করিবে।

তাঁহার অভিশাপ শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বৃষ্ণিগণকে আমি বিনা আর কে বধ করিবে? আমি আপনার ব্রতাচরণ অবগত আছি। যাদবগণকে দেবদানবাদি কেহ বধ করিতে পারিবে না, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডবগণের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং জীবনে নিরাশ হইলেন।

ভীষ্মদর্শন

রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ জন্য শোকে অত্যন্ত অধীর হইলেন। মহর্ষি নারদ ও ব্যাস তাঁহার শোকাপনয়ন জন্য সুবহু যত্ন করিলেন। যুদ্ধে শরীরত্যাগ করিয়া, সকলে স্বর্গগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য শোক অনুচিত, ঈদৃশ অনেক কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও কহিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, মিত্র প্রভৃতির অনুরোধে, তাঁহাকে রাজকর্ম্ম স্বীকার করিতে হইল। যুধিষ্ঠির পুরীতে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ হইলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরিব্রাজকবেশধারী দুর্য্যোধনসখা চার্ব্বাক তাঁহাকে জ্ঞাতি ও গুরুজনবধকারী বলিয়া ভর্ৎসনা করিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ মনে করিয়া দুঃখিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের এইরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সকলে মিলিয়া বধ করিলেন। ইহাতে যুধিষ্ঠির অনুতপ্ত হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিয়া বুঝাইলেন, এই চার্ব্বাক রাক্ষস, ব্রহ্মার বরে ব্রাহ্মণ বিনা অন্য কাহারও বধ্য নয়, তাই ব্রাহ্মণগণ ইহাকে বধ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এবং মৃত জ্ঞাতিবর্গের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনগৃহে বাস করিতেছিলেন, এক দিন ধর্ম্মরাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে ঈষদ্ধাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রজনী

তো সুখে অতিবাহিত হইয়াছে? কেমন জ্ঞান বুদ্ধিতো তোমার নির্ম্মল আছে? তাঁহার প্রশংসাপূর্ব্বক বলিলেন, আমরা তোমারই প্রসাদে রাজ্য লাভ করিলাম, পৃথিবী আমাদের বশে অবস্থিত, আমাদিগের জয় হইল, ধর্ম্ম আমাদিগের অস্খলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানাবস্থিত, তাঁহার কথার কোন উত্তরদান করিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কেন না তিনি জানিতেন যে, তিনি ধ্যানানুষ্ঠানের অতীত হইয়াছেন, নিরন্তর তিনি প্রজ্ঞাতে অবস্থিত *। ধর্ম্মপুত্র অতি বিনয়ে এই ধ্যানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণকে আত্মগোচরে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, শান্তপ্রায় হুতাশনের ন্যায় শরশয্যাগত ভীষ্ম আমায় ধ্যান করিতেছেন, তাই আমার মন তদ্গত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। ভীষ্মের প্রয়াণের পর পৃথিবী চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন করিয়া, রাজধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তখনই রথ সজ্জিত করিয়া, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয়াদি সকলে ভীষ্মের নিকটে উপনীত হইলেন। যাইবার বেলা পথে পাঁচটি হ্রদ দেখাইয়া, যামদগ্ন্য রামের বিক্রম ও তাঁহার বৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন। সকলে ভীষ্মকে সাদর সম্ভাষণ ও প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বলিলেন, পূর্ব্বে যেমন আপনার সমুদায় জ্ঞান বিমল ছিল, এখনতো তেমনই আছে? বুদ্ধি তো আপনার ব্যাকুল হয় নাই? শরাভিঘাত জন্য দুঃখে তো আপনার গাত্রব্যথা উপস্থিত হয় নাই? মানসদুঃখ হইতেও শারীরিক দুঃখ বলবত্তর। আপনার এ ইচ্ছামৃত্যু পিতা শান্তনুর বর হইতে, আমার জন্য নয়। অতিসূক্ষ্ম শল্য দেহে প্রবিষ্ট হইলেও ব্যথা জন্মায়, এতগুলি শরের আঘাতে আপনার চিত্তের অবস্থা কি বলিব? না, আপনার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে নাই, আপনি প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়ের উপদেষ্টা, আপনি দেবগণের মধ্যেও সুসমর্থ। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, যাহা হইয়াছে, হইবে, হইতেছে, সে সমুদায় আপনার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূতগণের সংহার এবং ধর্ম্মের

---

* চতুর্থং ধ্যানমার্গং ত্বমালম্ব্য পুরুষর্ষভ।
অপক্রান্তো যতো দেবস্তেন মে বিস্মিতং মনঃ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৪৬ অ, ২ শ্লোক।

ফলোদয় আপনি জানেন। আপনি ধর্ম্মময় অমূল্য রত্ন। আপনি ঊর্দ্ধরেতা, আপনায় যেন দেখিতেছি, আপনি স্ত্রীসহস্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া, অত্যন্ত সমৃদ্ধ-রাজ্যে অবস্থিত। সত্যধর্ম্মা, ধর্ম্মৈকতৎপর, মহাবীর্য্য, বীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম বিনা, তিন লোকের মধ্যে আর কেহ, শরশয্যাশায়ী হইয়া, তপঃপ্রভাবে স্বভাবোৎপন্ন মৃত্যু নিবারণ করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই নাই। সত্যে, তপস্যায়, দানে, যজ্ঞস্থানে, ধনুর্ব্বেদে, বেদে, আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে অনৃশংস, শুচি, দান্ত, সর্ব্বভূতহিতে রত, তৎসদৃশ মহারথ আর কাহাকেও শুনি নাই। আপনি দেবতাদি সকলকে একরথে জয় করিতে পারেন। আপনি বসুগণ মধ্যে বাসবসদৃশ, আপনাকে বিপ্রগণ নবম বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি গুণে অনবম (অনবর)। আমি জানি, আপনি দেবগণমধ্যেও শক্তিতে বিখ্যাত। এ পৃথিবীতে মনুষ্যগণমধ্যে আপনার মত গুণযুক্ত আমি দেখিও নাই, শুনিও নাই। আপনি সমুদায় গুণে দেবগণকেও অতিক্রম করেন। আপনি তপস্যায় চরাচর সৃষ্টি করিতে পারেন, উত্তম অনুত্তম গুণে আত্মলোক সৃজন করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রের জ্ঞাতিক্ষয়ে পরিতাপ সমুপস্থিত, ইঁহার শোক আপনি অপনয়ন করুন। চতুর্ব্বর্ণের যে ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, সে সমুদায় আপনি জানেন। চতুর্ব্বিদ্যা, চতুর্হোত্র, যোগ ও সাংখ্যে যে নিত্য ধর্ম্ম নিয়মিত হইয়াছে, তৎসহকারে চতুর্ব্বর্ণবিহিত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হয় না। প্রতিলোমপ্রসূত বর্ণ এবং দেশ জাতি কুলধর্ম্মের লক্ষণ, বেদোক্ত ও শিষ্টাচার-সম্মত ধর্ম্ম আপনার বিদিত। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, এ সকলই আপনার মনে অবস্থিত। যে কোন বিষয়ে সংশয় সমুপস্থিত হয়, তাহার সংশয়চ্ছেদনে আপনি বিনা আর কেহ নাই। পাণ্ডুপুত্রের মনের শোক আপনি অপনয়ন করুন, আপনার মত উত্তমবুদ্ধি লোকেরাই মনুষ্যের শান্তির জন্য হইয়া থাকেন।

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশীর্যুক্ত করিয়া, যুধিষ্ঠিরের শোকাপনয়ন জন্য উপদেশদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্ম উত্তর করিলেন, আপনি বাক্‌পতি, আপনার সম্মুখে আমি কি বলিব? আমার সমুদায় শরীর শরাভিঘাতে জর্জ্জর, আমার গাত্র অবসন্ন, বুদ্ধি অস্থির, আমার বলিবার প্রতিভা চলিয়া গিয়াছে। বিষানল-

সম শর দ্বারা নিপীড়িত হইয়া বল যেন আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ বাহির হইবার জন্য সত্বর, মর্ম্মস্থানে সন্তাপ উপস্থিত, আমি ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। দুর্ব্বলভাবশতঃ আমার কথা জড়াইয়া আসিতেছে, আমার কথা বলিতে উৎসাহ হইতেছে না, আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। দিক্, আকাশ, মেদিনী এ সকলের জ্ঞান আমার কিছুই নাই। কেবল আপনার বীর্য্যে বাঁচিয়া আছি। ধর্ম্মরাজের যাহাতে হিত হয়, আপনি বলুন। আপনি থাকিতে, গুরু থাকিতে, শিষ্য কি বলিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার প্রসাদে আপনার গ্লানিও থাকিবে না, মূর্চ্ছাও থাকিবে না, দাহও থাকিবে না, ব্যথাও থাকিবে না, ক্ষুধাও থাকিবে না, পিপাসাও থাকিবে না। সমুদায় জ্ঞান আপনাতে প্রতিভাত হইবে, বুদ্ধির বিচ্ছেদ হইবেনা, আপনার মন রজস্তমোবিরহিত হইয়া নিত্য সত্বস্থ থাকিবে। যে সকল ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থযুক্ত বিষয় চিন্তা করিবেন, তাহাতে আপনার বুদ্ধি অগ্রগামিণী হইবে। আপনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, চতুর্ব্বিধ ভূতগণকে দেখিবেন। যে প্রজাসমূহ সংসারে আসিতেছে, জ্ঞানচক্ষুতে তাহাদিগকে নির্ম্মল জলে মৎস্তের ন্যায় ঠিক দেখিতে পাইবেন।

পর দিন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, সুখেতো রজনী অতিবাহিত হইয়াছে? কেমন সুস্পষ্টলক্ষণা বুদ্ধি তো আপনার উপস্থিত হইয়াছে? কেমন আপনার জ্ঞান সমুদায়তো প্রতিভাত হইয়াছে? এখনতো আপনার হৃদয়ে গ্লানি নাই, মনতো ব্যাকুল নয়? ভীষ্ম উত্তর দিলেন, দাহ, মোহ, শ্রম, ক্লান্তি, গ্লানি, ব্যথা আপনার প্রসাদে সমুদায় গিয়াছে। এখন ভূত, ভবিষ্যৎ এবং যাহা হইতেছে, সমুদায় করতলস্থ ফলের ন্যায় দেখিতেছি। যাহা যাহা বক্তব্য, আমি বলিব; আপনার প্রসাদে আমার মনে শুভ বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। আপনার অনুধ্যানে আমি যুবার ন্যায় হইয়াছি, আপনার প্রসাদে শ্রেয় যাহা, তাহা আমি বলিতে সমর্থ। আপনি কেন স্বয়ং পাণ্ডুপুত্রকে যাহা শ্রেয়, তাহা বলিতেছেন না; আপনার এ বিষয়ে কি বলিবার আছে, বলুন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথায় এইরূপ উত্তর দিলেন যে, চন্দ্রকে চন্দ্র বলিলে যেমন কোন বিস্ময়ের কারণ নাই, তেমনি তিনি যশঃপূর্ণ হইলে আর কি বিস্ময়ের ব্যাপার। ভীষ্মের যশ বর্দ্ধিত হয়, চিরস্থায়ী থাকে, এই জন্য তাঁহাকে তিনি বিপুল বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যাহা পাণ্ডুতনয়কে

বলিবেন, তাহা বেদপ্রবাদের ন্যায় পৃথিবীতে থাকিবে। জন্ম প্রভৃতি কেহ তাঁহাতে পাপ দেখে নাই, তিনি সমুদায় ধর্ম্মের বিষয় অবগত, অতএব তিনি ধর্ম্মোপদেশ দান করুন।

দ্বারকাগমন

মহামতি ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মবিষয়ে সবিস্তার উপদেশ দান করিয়া, যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলে, তাঁহাকে লইয়া যুধিষ্ঠির গঙ্গাতীরে উঠিয়াই, ব্যাকুলচিত্তে ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় ভীমসেন তাঁহাকে ধরিলেন এবং পুত্রশোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া, রাজকার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অত্যন্ত শোক করিলে, সেই শোক পিতৃপুরুষ-গণকে সন্তপ্ত করে। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা, এই সকলের অনুষ্ঠান করুন, আপনার শোক করা কিছুতেই শোভা পায় না। আপনি সমুদায় জানেন, রাজধর্ম্মাদি সমুদায়ই ভীষ্ম, ব্যাস ও নারদের মুখে অবগত হইয়াছেন। আপনার কখন মূঢ়গণের অনুসরণ করা উচিত নয়, পিতৃপিতামহগণের অনুসরণ করিয়া, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন। ক্ষত্রিয়গণ যশে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, এ যুদ্ধে বীরগণ মধ্যে কেহতো যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া নিহত হয় নাই। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, শোক ত্যাগ করুন; যাঁহারা রণে হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তো আর দেখিতে পাইবেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তাঁহার কিছুতেই শান্তি হইতেছে না। যদি তিনি অনুমতি করেন, তবে তিনি বনে যাইতে প্রস্তুত। কি করিলে তাঁহার মন শুদ্ধ হইতে পারে, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল বর্ণনা করিয়া, সর্ব্বোপরি অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রশংসাপূর্ব্বক, ব্যাস তাঁহাকে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন।

ব্যাসের বচনাবসানে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন, যাহা কিছু অসরল, তাহাই মৃত্যুর কারণ, যাহা কিছু সরল, তাহাই ব্রহ্মবাদ। ইহাই জ্ঞানের বিষয়, প্রলাপে কি করিবে? আপনার কর্ম্মও স্থৈর্য্যলাভ করে নাই, শত্রুও পরাজিত হয় নাই। আপনার নিজের শরীরে যে শত্রু বাস করিতেছে, তাহা কেন আপনি বুঝিতেছেন না। এই বলিয়া তিনি ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের

আখ্যায়িকাযোগে *, শত্রু আত্মশরীরে কি প্রকারে লুক্কায়িত থাকে, বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ব্যাধির উল্লেখ করিয়া, শীত উষ্ণ বায়ুর সাম্যে স্বাস্থ্য, অসাম্যে ব্যাধি, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যে সুস্থাবস্থা, তাহাদিগের অসাম্যে মানস ব্যাধি, শীত দ্বারা উষ্ণ, উষ্ণ দ্বারা শীত, হর্ষ দ্বারা শোক, শোক দ্বারা হর্ষের উপশম, দুঃখকালে সুখস্মরণ, সুখকালে দুঃখস্মরণ, এইরূপ ব্যাধি ও তাহার উপশমোপায় সযৌক্তিক দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার ভীষ্মাদি সহ সমর হইয়াছে, এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত, যাহা কেবল আত্মমনের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। বাহিরের ত্যাগ কিছুই নয়। যদি অন্তরে লোভ রহিল, তবে সে ত্যাগ নিষ্ফল। 'আমার' এই কথা মৃত্যু, 'আমার নয়' এই কথা ব্রহ্ম। (ম-ভা, অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৩অ, ৩ শ্লোক) মৃত্যু ও ব্রহ্মলাভ এই দুই কথার উপরে নির্ভর করে। যাহার মমতা নাই, তাহার সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়াও কিছু হয় না; যাহার মমতা আছে, বনে ফলমূলাহার করিয়াও মৃত্যুর মুখে সে স্থিতি করে। কামাত্মা লোক নিন্দিত, কিন্তু এ সংসারে অকাম প্রবৃত্তি সম্ভবে না। যে কোন কার্য্য কেন অনুষ্ঠিত হউক না, তাহার মধ্যে কাম † প্রবিষ্ট থাকিবেই। অতএব তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, সেই কামকে ধর্ম্মে পরিণত করুন। (অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৩অ, ৬—২০ শ্লোক) যাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইবেন না, তাঁহাদিগের জন্য শোক করিয়া কি হইবে।

যুধিষ্ঠির শোক পরিহার করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

---

* বৃত্র প্রথমতঃ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইলে, তাহা হইতে সমুদায় গন্ধ অপহৃত হয়। সেখানে তাহার প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপ করিলে জলে প্রবেশ করে। তাহাতে জলের রস অপহৃত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক, সেই সেই ভূতের বিষয় হরণ করে। বজ্রনিঃক্ষেপে এই সমুদায় হইতে নিঃসৃত হইয়া একেবারে ইন্দ্রেতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাতে ইন্দ্র মোহপ্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠ রথন্তরসামগানে প্রবুদ্ধ করিলে, তৎপর তিনি বৃত্রকে বধ করেন। (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ১১শ অধ্যায়)

† এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে একটী গাথা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, মানুষ যে কোন উপায়ে কেন কাম পরিহার করিতে যত্ন করুক না, কাম সেই উপায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ধৃতি, তপস্যা, মোক্ষ সকলের মধ্যেই কাম গিয়া অনুপ্রবিষ্ট হয়। মনে হয়, মোক্ষে আর কামের প্রবেশ হইবে কি প্রকারে? কিন্তু মোক্ষানুরাগের মধ্যে কাম প্রবিষ্ট হইয়া হাস্যে নৃত্যে পরিণত হয়। ব্রহ্মদর্শনে হাস্য নৃত্য কামকৃত ব্যাপার ভিন্ন আর কি?

বনপর্ব্বতাদিবিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ-পূর্ব্বক, সেখানে যুদ্ধাদির কথায় আমোদে কালহরণ করিতে লাগিলেন। এক দিন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখন এখানকার কর্ত্তব্য সমুদায় নিঃশেষ হইল, আর এখানে থাকিয়া কোন প্রয়োজন নাই। বলদেবপ্রভৃতিকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় তিনি গমন করিতে ইচ্ছুক; তিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনিও তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গমন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া, তিনি দ্বারকায় যাইবেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, যুদ্ধকালে আপনি সৌহৃদ্যবশতঃ আমায় যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সে সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি দ্বারকায় যাইবেন, আমার সেই কথা শুনিবার একান্ত কৌতূহল সমুপস্থিত। অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, আমি তোমায় গুহ্য সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম শুনাইয়াছিলাম এবং নিত্য লোক প্রদর্শন করিয়াছিলাম। অল্পবুদ্ধিবশতঃ তুমি তাহা গ্রহণ কর নাই, এটি আমার অত্যন্ত অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছে। আর তো আমার পুনরায় সে স্মৃতি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয় তুমি শ্রদ্ধাশূন্য দুর্ব্বুদ্ধি, আর তো আমি তেমন নিঃশেষরূপে বলিতে পারিব না। ব্রহ্মপদ জানিবার পক্ষে সে ধর্ম্ম যে পর্য্যাপ্ত ছিল। আর তো তেমন করিয়া পুনরায় সম্পূর্ণরূপে বলিতে সমর্থ হইব না। আমি যে যোগযুক্ত হইয়া, সেই সেই পরম বেদ বলিয়াছিলাম। সেই বিষয়ে তবে প্রাচীন ইতিহাস বলিব *। যেরূপ

* শ্রাবিতস্ত্বং ময়া গুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনম্।
ধর্ম্মং স্বরূপিণং পার্থ সর্ব্বলোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥
অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্যত্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম্।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি॥
নূনমশ্রদ্দধানোঽসি দুর্ম্মেধা হ্যসি পাণ্ডব।
ন চ শক্যং পুনর্ব্বক্তুমশেষেণ ধনঞ্জয়॥
স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ॥
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসন্তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্॥

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা ১৬ অ, ৯—১৩ শ্লোক।

বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তুমি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিবে, সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও গুরুশিষ্যরূপে আখ্যায়িকার বিষয় করিয়া, দুই জন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী, গুরু ও শিষ্যের আখ্যায়িকাবলম্বনপূর্ব্বক, আত্মতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, পাপ পুণ্য ফলের অপরিহার্য্যত্ব, কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান, বনে গমন না করিয়াও বনে গমন, নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও গৃহধর্ম্ম-পালন, ব্রতাচরণ, প্রকৃতিতত্ত্ব, যতিবানপ্রস্থাচার, ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন। বর্ণনানন্তর বলিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, এই অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সম্যক্ আচরণ কর। এই ধর্ম্ম আচরণ করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবে। যুদ্ধসময়ে তোমায় এই সকল কথা বলিয়াছিলাম, ইহাতে তুমি মনঃস্থাপন কর। আমার পিতাকে অনেক দিন দেখি নাই, তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হইয়াছে। এখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দ্বারকায় যাইতে চাই। এই বলিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথারোহণ করিয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। সেখানে সকলকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, রজনীতে অবস্থানকরত, পর দিন রাজা যুধিষ্ঠির ও পিতৃষসার অনুমতি লইয়া, ভগিনী সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। পথে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হইয়াছে কি না, মুনিবর জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তি হয় নাই, কুরুকুলধ্বংস হইয়াছে শুনিয়া, ঋষি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং সামর্থ্যসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ শান্তি-স্থাপন করেন নাই বলিয়া, তাঁহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, এবং আমার অনুনয় গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিতেছি, শুনিয়া আমায় শাপমুক্ত করুন। অল্প-তপস্যার লোক আমায় কখন পরাভব করিতে পারে না; আমি ইচ্ছা করি না যে, আপনার তপস্যার বিনাশ হয়। আপনি কুমারব্রহ্মচারী, বহুকষ্টে তপ অর্জ্জন করিয়াছেন; আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনার তপস্যার ব্যয় হয়। অনন্তর তাঁহার নিকটে অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, তাঁহার ঐশ্বররূপদর্শনে অভিলাষজ্ঞাপন করাতে, তাঁহাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। উতঙ্ক মরুভূমিতে জললাভের বর তাঁহার নিকটে গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রবিহার *

দ্বারকায় গমন করিয়া, কিছু দিন পরে, শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সমুদায় যদুগণ, সস্ত্রীক, সপরিবার, এমন কি যাদবগণের ক্রীড়ানারীগণকে † পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া সমুদ্রবিহারে গমন করেন। সেখানে জলক্রীড়ানন্তর বিচিত্র নৌকানিচয়ে সকলে আরোহণ করেন। এই সকল নৌকা অতিবিস্তীর্ণ এবং উদ্যানাদিতে পরিশোভিত ছিল। যে নৌকায় বলদেব সপত্নীক বিহার করিতেছিলেন, সেই নৌকায় সকলে প্রমোদার্থ সমবেত হইলেন। বলদেব ও রেবতীকে নমস্কার করিয়া, সঙ্গীতনিপুণা নারীগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিদ্যোতক সঙ্গীত-সকল গীত হইতে লাগিল। নৃত্যগীতদর্শনশ্রবণে মদমত্ত বলদেব অতীব আমোদ লাভ করিয়া, স্বপত্নী রেবতীর সঙ্গে হাতে তাল দিয়া দিয়া নৃত্য

---

* এই ঘটনা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়, তাহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। সমুদ্রবিহারকালে সঙ্গীতনিপুণা নারীগণ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিখ্যাপনার্থ যে সকল সঙ্গীত করে, তন্মধ্যে সৌভযানভঙ্গের উল্লেখ আছে। ইহাতে সাম্ববধ হইবার অনেক দিন পরে সমুদ্রবিহার হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যখন বনে গমন করেন, সেই সময়ে সাম্ববধ হয়। বনবাসকালে অর্জ্জুন যে কখন দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় চলিয়া আইসেন এবং অর্জ্জুনকে আমোদপ্রমোদের জন্য দ্বারকায় যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। এই সমুদ্রবিহারে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার একত্র নৃত্য বর্ণিত আছে। ইহাতে এ ঘটনা এ স্থলে নিবেশোপযোগী সহজে প্রতীত হয় বলিয়াই, এখানে নিবিষ্ট হইল।

† যাদবগণের মধ্যে স্ত্রী লইয়া বিরোধ সমুপস্থিত না হয়, এ জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বারনারীগণের নিবাস স্থির করিয়া দেন।

"দৈত্যাধিবাসং নির্জ্জিত্য যদুভির্দৃঢ়বিক্রমৈঃ।
বেশ্যা নিবেশিতা বীর দ্বারবত্যাং সহস্রশঃ॥
সামান্যাস্তাঃ কুমারাণাং ক্রীড়ানার্য্যো মহাত্মনাম্।
ইচ্ছাভোগ্যা গুণৈরেব রাজন্যা বেশযোষিতঃ॥
স্থিতিরেষা হি ভৈমানাং কৃতা কৃষ্ণেন ধীমতা।
স্ত্রীনিমিত্তং ভবেদ্বৈরং মা যদূনামিতি প্রভো॥"

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৮ অ, ৮—১০ শ্লোক।

এ নীতিশৈথিল্য এখনও এ দেশের স্বাধীন নৃপালগণের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

করিতে * প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া, আনন্দিত-মনে বলদেবের হর্ষবর্দ্ধনার্থ, সত্যার সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সমুদ্রযাত্রার জন্য অর্জ্জুন আগমন করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণ ও সুভদ্রার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণপুত্র, বলদেবপুত্র, অক্রূরাদি সকলেই এই নৃত্যের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে মহর্ষি নারদ ছিলেন, তিনি ইঁহাদের মধ্যগত হইয়া, নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া, সকলকে হাসাইতে লাগিলেন। এইরূপ রাসক্রীড়ায় আমোদ লাভ করিয়া, রাসাবসানে কৃষ্ণ মহর্ষি নারদের হাত ধরিয়া সমুদ্রে প৷ড়লেন, সত্যভামা ও অর্জ্জুনও তাঁহার সঙ্গে পড়িলেন। সাত্যকিকে তিনি বলিলেন, অঙ্গনাগণ সহ জলক্রীড়া হউক, আমি অর্দ্ধেকের নেতা হই, রেবতী সহ বলদেব অর্দ্ধেকের নেতা হউন। সকলে মিলিত হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, বারবধূগণ সঙ্গীত ও বাদ্যে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহাদিগের আমোদ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। জলবিহারান্তে সকলে সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পানভোজনাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর বিশেষ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইয়া, নারদ বীণা, কৃষ্ণ হল্লীষক, অর্জ্জুন বংশী এবং অন্যান্য সকলে মৃদঙ্গ বাদ্য করিতে লাগিলেন। এই আমোদপ্রমোদের সময়ে ছিদ্রান্বেষী নিকুম্ভনামক দৈত্য দ্বারকাস্থ ভানুর কন্যা ভানুমতীকে হরণ করে। নিকুম্ভভ্রাতা বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে প্রদ্যুম্ন হরণ ও বজ্রনাভকে বধ করিয়াছিলেন, সেই শত্রুতাবশতঃ নিকুম্ভ ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিকুম্ভ কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, কেহ তাহাকে বধ বা অবরোধ করিতে সমর্থ হন না। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া, অর্জ্জুনপ্রদ্যুম্ন-সহকারে যুদ্ধার্থ গমন করেন এবং নিকুম্ভকে বধ করিয়া, কন্যা ভানুমতীর বিবাহ পাণ্ডুতনয় সহদেবের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেন।

পরিক্ষিৎ-জন্ম

পাণ্ডুতনয়গণ ভূগর্ভনিহিত-ধনানয়নজন্য হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধযজ্ঞের সময় উপস্থিত জানিয়া, হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। এই সময়ে অভিমন্যুপুত্র পরিক্ষিতের জন্ম হয়। পুত্র জন্মিল, এই সংবাদে যেমন আনন্দধ্বনি উপস্থিত হইল, অমনি উহা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল।

* নৃত্য মৃদু মধুর নয়, উল্লম্ফন। বর্ত্তমান কালের 'বলের' সঙ্গে এ নৃত্যের সাদৃশ্য আছে।

এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ যুযুধান সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, কুন্তী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; তিনি অতি সকরুণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব, তুমি আমাদিগের গতি, তুমি আমাদিগের আশ্রয়স্থান, আমাদের এ কুল তোমারই অধীন। হে যদুপ্রবীর, তোমার ভাগিনেয়ের পুত্র, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক হত হইয়া, মৃতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি ইহাকে জীবিত করিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; দেখ, সে মৃতাবস্থায় জন্মিয়াছে। উত্তরা, সুভদ্রা, দ্রৌপদী, আমায় এবং পঞ্চ পাণ্ডুতনয়কে তুমি পরিত্রাণ কর। এই সন্তানে প্রাণ সমাগত হইলে, আমাদের সকলেরই তৎসহ প্রাণ সমাগত হইবে, কুলের পিণ্ডচ্ছেদবারণ হইবে, তোমার প্রিয়তম ভাগিনেয় অভিমন্যুর অতিপ্রিয় কার্য্য তুমি সাধন করিবে। অভিমন্যু জীবিতকালে উত্তরাকে বলিয়াছিল, তোমার পুত্র আমার মাতুলকুলে গমন করিয়া অস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা করিবে। আজ এই কুলের কল্যাণসাধন কর, এ জন্য তোমার নিকটে বিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি। সুভদ্রা ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া, নিতান্ত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বহু বিলাপানন্তর তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, মৃত সন্তানের জীবনদান প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অনুনয় বিনয় শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া, সকলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল। তিনি সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন। বিরাটতনয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আর্ত্তস্বরে বহু বাক্য-বিন্যাস করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থাদর্শনে কুন্তী প্রভৃতি নারীগণ ক্রন্দনে সমুদায় গৃহ পূর্ণ করিলেন। বিরাটতনয়া চেতনালাভ করিয়া, মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি ধর্ম্মজ্ঞের পুত্র হইয়াও ধর্ম্ম বুঝিতেছ না। সম্মুখে বৃষ্ণিপ্রবর সমুপস্থিত, তুমি তাঁহার অভিবাদন করিতেছ না। যাও, পুত্র, তোমার পিতার নিকটে গিয়া এই হতভাগিনীর কথা গিয়া বল, আমি পতিপুত্রবিহীনা হইয়া, কি প্রকার কল্যাণে বঞ্চিত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। অথবা আমিও শীঘ্রই ধর্ম্মরাজের অনুমতি লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব, অথবা বিষভক্ষণ করিব। হে পুত্র, উত্থান কর, তোমার শোকার্ত্তা প্রপিতামহী, আর্য্যা পাঞ্চালী একান্ত

আকুল। আর্য্যা সুভদ্রাকে দেখ; তোমার সম্মুখে লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত, তাঁহার মুখাবলোকন কর। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, উত্তরা ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র হরণ করিলেন, এবং উত্তরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে উত্তরে, ঐ কথা মিথ্যা হইবার নহে, এই দেখ, সকলের সমক্ষে আমি ইহাকে জীবিত করিতেছি। যে সকল স্থলে মিথ্যা বলিতে বাধা নাই, সে স্থলেও আমি কখন মিথ্যা বলি নাই, কখন যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হই নাই, সে জন্য এ জীবিত হউক। ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণগণ আমার যেমন প্রিয়, অভিমন্যুর মৃত্যু হওয়াতে এই সন্তান আমার তেমনি প্রিয়, অতএব এ জীবিত হউক। আমি কখন সুহৃৎ অর্জ্জুনের সঙ্গে বিরোধ কি জানি না, সেই সত্যের জন্য এই মৃতশিশু জীবিত হউক। আমাতে সত্য ও ধর্ম্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত এই অভিমন্যুর মৃতজাত সন্তান জীবিত হউক। কংস ও কেশীকে আমি ধর্ম্মার্থ হনন করিয়াছি, সেই সত্যের জন্য এই বালক জীবিত হউক। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা বলিলে, শিশু আস্তে আস্তে নড়িতে লাগিল এবং ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিল। সমুদায় কুল ক্ষয় হইয়া গিয়া, অভিমন্যুর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম পরিক্ষিৎ রাখিলেন। যখন পরিক্ষিতের একমাস বয়স, তখন পাণ্ডুতনয়গণ বহুরত্ন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমনকরত, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যদুকুল-ধ্বংস

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল যখন ষড়্‌বিংশ বর্ষ হইল, সেই সময়ে বৃষ্ণিকুলধ্বংস হয়। এ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা এই যে, শারণ প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য, শাম্বকে স্ত্রী সাজাইয়া, তাঁহাদিগের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, এই স্ত্রী বভ্রুর বনিতা, বভ্রু পুত্রলাভার্থী। বলুন, ইনি কি সন্তান প্রসব করিবেন? এতচ্ছ্রবণে ঋষিগণ কুপিত হইয়া বলেন, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বিনাশ জন্য মুষল প্রসব করিবে। এই অভিশাপানুসারে শাম্ব মুষলপ্রসব করে, সেই মুষল চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং নগরে নৃপতি আহুক, কৃষ্ণ, বলদেব ও বভ্রুর নামে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়, আজ হইতে বৃষ্ণি ও

অন্ধককুলে কেহ মদ্যপান করিতে পারিবেন না। নগরবাসিগণ মধ্যে যদি কেহ মদ্যপান করে, সবান্ধব তাহাকে শূলারোহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে দ্বারকায় বহু উৎপাত উপস্থিত হইল। কথিত আছে যে, অলঙ্কার ছত্র রথাদি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে লাগিল। সকলের সমক্ষে কৃষ্ণের চক্র, রথ, অশ্ব, ধ্বজ অন্তর্হিত হইল। চারিদিক্ হইতে কেবল তীর্থযাত্রা কর, তীর্থযাত্রা কর, এই অপ্সরধ্বনি উত্থিত হইল। কৃষ্ণ ও অন্ধকবংশীয়গণ তীর্থযাত্রা করিতে অভিলাষী হইলেন। প্রভূত আহার্য্যসামগ্রী আদি সঙ্গে লইয়া, যদুবংশীয় বীরগণ প্রভাসে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সকলে সমুদ্রকূলে বসতি স্থাপন করিলে, উদ্ধব সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কি দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইবে জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে * প্রস্থান হইতে বিরত করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই বলরাম, কৃতবর্ম্মা, সাত কি, গদ ও বভ্রু মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত্যকি মদমত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে অবমানকরত উপহাস করিয়া বলিলেন, তোমার মত কে এমন ক্ষত্রিয় আছে যে, নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে বধ করিবে; তুমি যাহা করিয়াছ, যাদবগণ কিছুতেই তাহার অনুমোদন করেন না। এই কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্নও অবমাননাসূচক কথা কহিলেন। কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অবজ্ঞাপূর্ণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশকরত বলিলেন, ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছিন্ন হইলে সে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল, তাহাকে কেন নৃশংসাচারে বধ করা হইল? এতচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তির্য্যক্ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন। কৃতবর্ম্মা যে সত্রাজিতের স্যমন্তকমণি হরণ করিয়াছিলেন, সাত্যকি সেই কথা কৃষ্ণকে শুনাইলেন। সত্যভামা সেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রকোপিত করিতে যত্ন করিলেন। সাত্যকি ক্রোধে উত্থিত হইয়া বলিলেন, আজ ইহাকে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর অনুসরণ করাইতেছি; আজ ইহার আয়ু ও যশ উভয়ই নিঃশেষ হইয়াছে। এই বলিয়া সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (১১ স্ক) উদ্ধবকে যেগোপদেশ দান করার বিষয় যে উল্লিখিত আছে, মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের যে সকল উপদেশ লিখিত আছে, তন্মধ্যে অনেক নূতন কথাও আছে; তবে বলিতে হইবে, এ সকল গীতার অনুযায়ী, এবং তদ্ভুক্ত।

খড়্গদ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। এই সময়ে সাত্যকি ও অন্যান্ত যাদবগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বারণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তিনি নিবারণ করিবেন কি, ভোজ ও অন্ধকগণ আসিয়া সকলে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, ইহাদিগের কাল সমুপস্থিত, সুতরাং তিনি আর ক্রোধ করিলেন না। সকলেই মদে মত্ত হইয়াছে, জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, উচ্ছিষ্ট পাত্রে সাত্যকিকে তাহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সাত্যকিকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, রুক্মিণীনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইতে গেলেন। সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন উভয়ে মিলিত হইয়া অনেককে বধ করিলেন, পরিশেষে তাঁহারা হত হইলেন। সাত্যকি ও আত্মজকে হত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে এরকামুষ্টি লইয়া, যাহারা সম্মুখে ছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি সকলে এরকামুষ্টি গ্রহণ করিয়া, পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। মদান্ধতাবশতঃ সঙ্কুল যুদ্ধে পিতা পুত্রকে মারিল, পুত্র পিতাকে মারিল। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদ ইহাদিগকে হত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশেষরূপে সকলকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বভ্রু ও দারুক বলিলেন, ভগবন্, আপনি অনেককে হত করিলেন, নিবৃত্ত হউন; বলদেব কোথায় গিয়াছেন, তাঁহাকে অন্বেষণ করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ, বভ্রু ও দারুক গিয়া দেখেন যে, বলদেব এক বৃক্ষেতে বসিয়া চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন। তখন দারুককে কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি গিয়া পাণ্ডবতনয় অর্জ্জুনকে সংবাদ দাও যে, ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে, তিনি এখানে শীঘ্র আসুন। দারুক ভগ্নান্তঃকরণে রথে আরোহণ করিয়া হস্তিনাপুরে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ বভ্রুকে বলিলেন, বিত্তলোভে দস্যুগণ আসিয়া দ্বারকা আক্রমণ করিবে, তুমি গিয়া স্ত্রীগণকে রক্ষা কর। বভ্রু তাঁহার নিকটে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে ব্যাধমুক্ত বাণ আসিয়া তাঁহাকে বধ করিল। এতদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন, আপনি এখানে আমার প্রতীক্ষা করুন, আমি গিয়া স্ত্রীগণকে জ্ঞাতিগণের রক্ষাধীনে রাখিয়া আসি। তদনন্তর তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়া পিতাকে বলিলেন, ধনঞ্জয়ের আগমন পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের রক্ষা করুন, ভ্রাতা বলদেব বনে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সেখানে যাই। যদুগণবিরহিত

দ্বারকাপুরীর দিকে আর আমি তাকাইতে পারিতেছি না। আমি বনে গিয়া বলদেব সহ তপস্যাচরণ করি। এই বলিয়া তিনি পিতাকে বন্দনা করিয়া চলিলেন. অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের ঘোর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। সেই শব্দ শুনিয়া, তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দ্বারকায় অর্জ্জুন আসিতেছেন, তিনি আসিয়া তোমাদের দুঃখমোচন করিবেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, বলদেব যোগে তনুত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি শূন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং গান্ধারীর অভিশাপ এবং দুর্ব্বাসার বাক্য * স্মরণ করিয়া মনে করিলেন, অন্ধক, বৃষ্ণি ও কুরুকুল ক্ষয় হইয়াছে, এখন আমার চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত। তখন তিনি ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া, মহাযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যোগে রহিয়াছেন, এই সময়ে জরানামক ব্যাধ আসিয়া, মৃগভ্রমে অন্তরাল হইতে বাণ নিক্ষেপ করিল। সেই বাণ আসিয়া তাঁহার চরণতল ভেদ করিল। জরা আসিয়া দেখে যে, সে একজন যোগযুক্ত মহাপুরুষকে বাণবিদ্ধ করিয়াছে। সে এই দেখিয়া, তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কলেবর ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দারুক গিয়া যদুগণের ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করিলে, পাণ্ডবগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া, একেবারে সমুদায় শ্রীভ্রষ্ট অবলোকন করিলেন। অর্জ্জুনকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ ঘোররবে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আর কিছুরই দিকে তাকাইতে পারিলেন না। সত্যা, সত্যভামা, রুক্মিণী আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় গিয়া মাতুল বসুদেবকে শয়নাবস্থায় দেখিলেন। তিনি এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, উঠিয়া যে আলিঙ্গন করিবেন, সে সামর্থ্যও নাই। বসুদেব পুত্র, পৌত্র. দৌহিত্র ও জ্ঞাতিগণের কথা বলিয়া, কতই রোদন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন দ্বারকা ত্যাগ করিলে, উহা সমুদ্রপ্লাবিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, অর্জ্জুনকে অবগত করিলেন। পার্থ সভাস্থলে গিয়া আদেশ করিলেন, সাত দিনের মধ্যে তিনি

* এটি পরে ধর্ম্মের বিষয় বলিবার সময়ে লিখিত হইবে। গান্ধারীর অভিশাপস্থলে ষড়্‌ত্রিংশ বৎসর লিখিত হইয়াছে, এখানে ষড়্‌বিংশ বৎসর দেখিতে পাওয়া যায়। হয় পূর্ব্বে, নয় পরে পাঠান্তর হইয়াছে।

সকলকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিবেন, সকলে যাইবার উদ্যোগ করুন। অর্জ্জুন শোকাকুল হইয়া সে রজনী কৃষ্ণের গৃহে যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতে বসুদেব পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। অন্তঃপুরে মহারোদনধ্বনি উত্থিত হইল। বসুদেবপত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা পতির সহগমন করিলেন। অনন্তর রাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করাইয়া আনিয়া, দাহ করা হইলে, সকলের প্রেতকার্য্য সমাধা করিয়া, সপ্তম দিনে অর্জ্জুন বৃষ্ণিবংশীয় কুলস্ত্রীগণ ও ধন রত্ন লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনিও যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সমুদ্রও আসিয়া দ্বারকাভূমি গ্রাস করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সকলে ভীত হইয়া সত্বর তাঁহার অনুগমন করিল। তিনি পঞ্চনদে আসিয়া পটমণ্ডপ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে একা পার্থ এতগুলি স্ত্রী লইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া দস্যু আভীরগণের লোভ হইল। তাহারা সকলে যষ্টিধারণ করিয়া আসিয়া আক্রমণ করিল। তাহারা ঘোররবে আসিয়া বৃষ্ণিগণমধ্যে নিপতিত হইলে, চারিদিকে লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিলেন, কিছুতেই তাহারা ভীত হইল না। তিনি গাণ্ডীবে জ্যারোপ করিতে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার বলক্ষয় হইয়াছে, অতি কষ্টে জ্যারোপ করিলেন; কিন্তু এমনই বিস্মৃতি হইয়াছে যে, অস্ত্রচিন্তা করিতে গিয়া, অস্ত্র সকল তাঁহার মনে উদিত হইল না। এ দিকে আভীরগণ স্ত্রীসকলের হরণে প্রবৃত্ত হইল, সঙ্গের সৈন্যগণ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তিনি পরিশেষে অস্ত্রনিয়োগ করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার অস্ত্রনিচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। পরিশেষে ধনুষ্কোটিতে দস্যুগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই আর স্ত্রীলুণ্ঠন নিবারণ করিতে পারিলেন না। হতাবশেষ যাঁহারা রহিলেন, ম্রিয়মাণ অবস্থায় তাঁহাদিগকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। হার্দ্দিকের পুত্রকে মার্ত্তিকাবতনগরে এবং বীরহীন স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালকগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে, সাত্যকিপুত্রকে সরস্বতীপ্রদেশে বসতি দান করিলেন। কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব দান করিলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, জাম্ববতী, ইঁহারা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। সত্যভামা এবং অন্যান্য কৃষ্ণের প্রিয়পত্নীগণ তপস্যার্থ হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া কলাপগ্রামে গেলেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হংস ও ডিম্ভক হত হয়। এ বৃত্তান্ত অনেক গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, ইহা মূলে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু মহাভারতে যখন হংস ও ডিম্ভকের উল্লেখ আছে, তখন সংক্ষেপে এ বৃত্তান্তটি পরিশিষ্টে নিবদ্ধ করা সমুচিত। বৃত্তান্তটি এই, শাল্বপ্রদেশে ব্রহ্মদত্ত নামা রাজা ছিলেন, তিনি শঙ্করের আরাধনা করিয়া দুই পত্নীতে দুই পুত্র লাভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম হংস এবং কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক রাখা হয়। এই দুই পুত্র শঙ্করের বরলাভ করিয়া, অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। একদা তাহারা মৃগয়াতে গমন করিয়া, পরিশ্রান্তাবস্থায় সরোবরকূলে গমন করে; তথা হইতে রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সৈন্যদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, মুনিগণের নিকটে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়া মুনিগণকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করে যে, তাহারা তাহাদিগের পিতাকে রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত করিবে, তাঁহারা যেন যজ্ঞে গমন করেন। সেখান হইতে তাহারা পুষ্করের উত্তর তীরে দুর্ব্বাসার আশ্রমে গমন করে। সেখানে ঋষিগণকে কৌপীনাচ্ছাদনে আবৃত দেখিয়া, গৃহস্থাশ্রমপরিত্যাগজন্য তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে দুর্ব্বাসা তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন, হংস ও ডিম্ভক ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তিনি সেই সকল ভগ্ন সামগ্রী লইয়া, দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখান। শ্রীকৃষ্ণ হংস ও ডিম্ভককে অচিরে বধ করিবেন বলিয়া, মহর্ষি দুর্ব্বাসার হৃদয়ের ব্যথাপনয়ন করেন। এ দিকে হংস ও ডিম্ভক রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট লবণ শুল্ক চাহিয়া পাঠায়। তাহাদের এই সাহসিক ব্যাপারে সকলে আশ্চর্য্য হন এবং কোথায় তাহারা যুদ্ধ করিবে, তাহার নির্ণয়ার্থ সাত্যকিকে দৌত্যে প্রেরণ করেন। সাত্যকি গিয়া পুষ্করকে যুদ্ধস্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়া আইসেন। পুষ্করে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া, পরিশেষে সেখান হইতে গোবর্দ্ধনে গিয়া সমর নিঃশেষ হয়। হংসকে বধ করিবার জন্য কৃষ্ণ বৈষ্ণবাস্ত্রযোজনা করাতে, সে ভয়ে রথ হইতে লম্ফদানপূর্ব্বক ভূতলে পড়িয়া যমুনার দিকে ধাবিত হয়, কৃষ্ণ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ান। সে ভয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তিনিও তাহার উপরে গিয়া পড়িয়া, পদাঘাতে তাহাকে বধ করেন। ডিম্ভক ভ্রাতার বধ শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধপরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনায় গিয়া পড়ে, এবং উন্মগ্ন নিমগ্ন হইয়া ভ্রাতার বহুবিধ অন্বেষণ করে।

তাহাকে কিছুতেই না পাইয়া, বহুবিলাপানন্তর, স্বয়ং জিহ্বা উৎপাটন করিয়া মরিয়া যায়।

এইটী ব্যতীত আর একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এটী একটি অলৌকিক ব্যাপার। একজন ব্রাহ্মণের পত্নী সন্তানপ্রসব করিলে, সূতিকাগৃহ হইতে সেই সন্তান অপহৃত হইত; কে লইয়া যায়, কেহই অবধারণ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণীর প্রসবসময় উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ সন্তানরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া, কৃষ্ণের নিকটে আগমন করেন। অর্জ্জুন এই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সন্তানরক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। প্রসবদিনে প্রসবগৃহ শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা করিতে তিনি প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সন্তানরক্ষায় কৃতকার্য্য হন না, সন্তান পূর্ব্ববৎ অপহৃত হয়। তিনি লজ্জিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা নিবেদন করাতে, তিনি অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া, মৃতপুত্রগণকে আনয়ন করিতে গমন করেন। যাইতে যাইতে এক ঘোরান্ধকার স্থানে প্রবিষ্ট হন, সেখানে চক্রের জ্যোতিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই লোকে প্রবেশ করেন, যেখানে পুরুষবিগ্রহ অবস্থিত। অর্জ্জুন রথে রহিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মণের চারিটি সন্তান প্রতিগ্রহণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করেন। এই পুরুষবিগ্রহ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে কেন হরণ করেন, তাহার কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ পুরুষবিগ্রহ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কার্য্য এখন শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা আর কেন পৃথিবীতে অবস্থিতি করেন, শীঘ্র সেই পুরুষলোকে গমন করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউন। পুরুষবিগ্রহ তাঁহাদিগকে স্বসন্নিধানে লইয়া গিয়া, এই কথা কহিবেন বলিয়া, তিনি ব্রাহ্মণপুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন

অনুক্রম

শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে যত দূর সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা নিবদ্ধ হইল। এখন তাঁহার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমতের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সাংখ্য ও যোগ এই সকলের অনুমোদিত ধর্ম্মই নূতন ভাবে জগতে প্রচার করিয়াছেন। এক জন ব্যক্তি সকলগুলি মত কখন একত্র করিতে পারেন না, যদি সমুদায়কে একসূত্রে গ্রথিত করিতে সমর্থ না হন। সমুদায়গুলি একত্র গ্রথিত করিতে একটি যোগসূত্র চাই, যে যোগসূত্রটি পৃথিবীর লোকের নিকট অবিদিত। যিনি সেই কার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত, তিনিই তাহার আবিষ্কর্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবিধ মতকে এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত করিতে যত্ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্য ঈদৃশ একটি যোগসূত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন পথ ভারতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই পথ ভক্তিপথ *।

* কৃষ্ণ ভক্তিপথের আবিষ্কর্ত্তা কি না, এ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এ সংশয়ের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩৩৬ অ) মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ, তত্রত্য লোকদিগের বৃত্তান্ত, উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে অনেক পণ্ডিত এই অনুমান করেন যে, সিরিয়ান্ নষ্টিক খৃষ্টবাদিগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া, নারদ ভক্তিতত্ত্ব এ দেশে প্রচলিত করিয়াছেন। সুতরাং গীতাতে যে ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহা অন্ততঃ উহারই প্রতিচ্ছায়া। মহাভারত গ্রন্থ তত আধুনিক না হউক, ঐ সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে তাঁহাদের কোন সন্দেহ নাই। নারদের শ্বেতদ্বীপগমনের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া, যাহা তাঁহাদের প্রতীত হয়, তাহাতে খৃষ্টের ৪০০ বৎসর মধ্যে, ন্যূনকল্পে ৩২৫ বৎসর পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

শাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসার জন্য এক শত সূত্র লিখিয়াছেন। এই সূত্রগুলি গীতাবলম্বনে লিখিত। শাণ্ডিল্য একমাত্র ভক্তির পক্ষপাতী বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের

বিশেষ সমালোচনার পর আমরা এ বিষয়ে কোন্ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা পাঠকগণকে অবগত করা আমাদের কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ দেখিতে হইতেছে, ভারতবর্ষের সাধকগণ সাইবেরিয়া নষ্টিক সম্প্রদায়ের নিকটে গমন করিয়াছিলেন কি না? যদিও মহাভারতে নারদের শ্বেতদ্বীপগমনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি ঐ শ্বেতদ্বীপসম্বন্ধে নানাস্থানে যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে শ্বেতদ্বীপ সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রদর্শন করে কি না, তৎসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ। মেরুর উপরিভাগের বিস্তার ৩২ সহস্র যোজন (দ্বাত্রিংশ-মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ, বিষ্ণু পু, ২অং, ২অ, ৮ শ্লোক)। যে ষোড়শ সহস্র যোজন ভূতলে প্রবিষ্ট, তাহারই উপরিভাগ লক্ষ্য করিয়া, এই ৩২ সহস্র যোজন বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; কেন না ভূমণ্ডলকে পদ্ম এবং মেরুকে তাহার কর্ণিকারূপে বর্ণন করিয়া, উপরিভাগে ৩২ সহস্র যোজন, মূলে ১৬ সহস্র যোজন এবং ভূতলে ১৬ সহস্র যোজন বিস্তৃত স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষীরোদধির উত্তরে মেরুর উপরিভাগে ৩২ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ শ্বেতদ্বীপ, এরূপ বলাতে, চতুর্দ্দশসহস্রযোজনবিস্তীর্ণ ব্রহ্মলোককে উহা আপনার অন্তর্ভূত করিতেছে। ব্রহ্মা যখন অনিরুদ্ধের বিলাস (ক্ষুদ্রাংশ), তখন ব্রহ্মলোক অনিরুদ্ধাধিষ্ঠিত শ্বেতদ্বীপের অন্তর্ভূত হওয়া অবশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ক্ষীরোদধি কোথায়? বৃহৎ সংহিতায় যেখানে মধ্যদেশের বর্ণনা আছে, সেখানে "প্রাগ্‌জ্যোতিষ লৌহিত্য-ক্ষীরোদসমুদ্র পুরুষাদাঃ" এইরূপ লেখা আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসামপ্রদেশ, লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র নদ (কালিকা পুরাণ), পুরুষাদ একটি দেশ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও পুরুষাদ ইহারই মধ্যবর্ত্তী ক্ষীরোদসমুদ্র। পুরুষাদ এই শব্দে প্রতীত হয়, এখানকার লোকেরা মনুষ্যখাদক ছিল। ভারতেও যখন পুরুষমেধ নরমেধ প্রচলিত ছিল, তখন প্রাচীনকালে আসামপ্রদেশের অতীত ভূমিতে তাদৃশ ব্যক্তিগণের বাস ছিল, ইহা আর অসম্ভব কি? শ্বেতদ্বীপ কি এই পুরুষাদ প্রদেশ? ইহার যখন কোন প্রমাণ নাই, বরং মেরুর উপরিভাগে শ্বেতদ্বীপের স্থিতি বর্ণিত আছে, তখন সে দেশের সহিত ইহার কোন সংস্রব কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং সূর্য্যের উদয়াস্ত-প্রদর্শন জন্য মানসসরোবরকে সীমা করিয়া, ব্রহ্মলোকের দশদিক্‌স্থিত ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পুরী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রকে (সম্ভবতঃ বঙ্গোপ-সাগরকে) সীমা করিয়া, শ্বেতদ্বীপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত কল্পনা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্বেতদ্বীপাধিপতিকে দর্শন করিবার জন্য নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন যেখানে বর্ণিত আছে, সেখানে স্বামী লিখিয়াছেন, 'তদীশ্বরং তত্রত্যং মামেবানিরুদ্ধমূর্ত্তিম্ (১০স্ক, ৮৭অ, ৬শ্লোক)।' সুতরাং তাঁহার মতে শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। মহাভারতের শ্বেতদ্বীপগমনাধ্যায়েও ইহাই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। কেন না উহাতে 'প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ।

সমুদায় মতের সামঞ্জস্যসম্পাদনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তিনি তাঁহাকে একমাত্র ভক্তিপথের প্রবর্ত্তকরূপে ধর্ম্মজগতে উপস্থিত করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা' (শা-পর্ব্ব, ৩৩৯ অ, ৭১—৭২ শ্লো) ইত্যাদি বলিয়া, সমুদায় সৃষ্টি ও অবতারোৎপত্তি এই অনিরুদ্ধ হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সর্ব্ববর্ণাদি অনুরঞ্জিত বিশ্ব ('স্তোত্রং জগৌ স বিশ্বায়' শা-পর্ব্ব, ৩৩৮অ, ৩ শ্লো)। কাল সকলকে লেহন করে, শ্বেতদ্বীপবাসিগণ সেই কালকে লেহন করিতেছেন (শা-পর্ব্ব, ৩৩৫ অ, ১১ শ্লো) অর্থাৎ তাঁহারা কালের অধীন নহেন ইত্যাদি বর্ণনা-স্থলে, 'ইউকেরাইষ্ট' কল্পনা করা যুক্ত নহে। যাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন, তাঁহাদের সেরূপ কল্পনার মূল 'নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ' (শা-পর্ব্ব, ৩৩১ অ, ৪৩ শ্লো) এ স্থলে পূর্ব্বজশব্দের ব্যবহার। বেদে ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্যত্র ব্রহ্মা দতে পূর্ব্বজ শব্দের ব্যবহার আছে; সুতরাং এ পূর্ব্বজ শব্দ খৃষ্টের প্রতি ব্যবহৃত first-begotten শব্দের অনুবাদ নহে। যদি এখানে অনিরুদ্ধের প্রতি পূর্ব্বজ শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া, বাসুদেবের প্রতি ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে তৎপ্রতি অন্য কোন স্থলে পূর্ব্বজ শব্দের ব্যবহার নাই, এই যুক্তিতে, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে এই ব্যবহার গৃহীত হইয়াছে, কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইত; কিন্তু তাহা যখন সিদ্ধ হইতেছে না, তখন কাললেহনস্থলে কাললেহন নহে, খৃষ্টকে লইয়া 'ইউকেরাইষ্ট' অনুষ্ঠান শ্বেতদ্বীপাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত। এই অধ্যায়ে সাংখ্যবিরোধী মত আছে, বেদান্তের সহিতও সে মত মিলে না অতএব বিদেশ হইতে ঐ মত গৃহীত, এ কথা বলাও ঠিক নয়। 'তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণম্' (শা-পর্ব্ব, ৩৩৪ অ, ২৯ শ্লো) এস্থলে 'সদপি কারণব্যাপারাদভিব্যজ্যতে' এই নিয়মে, উৎপত্তিশব্দে অভিব্যক্তি বুঝায়। বিজ্ঞানভিক্ষু পরম্পরায় পুরুষের কারণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, এস্থলের বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং এদেশীয়েরা নাষ্টিক বা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, শ্বেতদ্বীপগমনবর্ণন অথবা নূতন মতের সমাগমকল্পনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না। নষ্টিক সম্প্রদায় যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এরূপ স্থলে আমাদিগকে এইটুকু প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইল যে, গীতাতে যে ভক্তিপথ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রাচীন উপাদানসম্মত, তৎসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণখৃষ্টের একত্র মিলন কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ভক্তিপথ ছিল না, হঠাৎ উহা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, অথবা যদিও ছিল, একপ ছিল না, অতএব উহা বিদেশ হইতে সমাগত, এ অনুমান যে শাস্ত্রীয় আলোচনায় দাঁড়ায় না, ইহাই আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বেদ, বেদান্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জল একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। যে সূত্রে তিনি এই গুলিকে একীভূত করিলেন, সে সূত্র ভক্তি। তত্তদ্‌গ্রন্থে এই ভক্তির যদি কোন নিদর্শন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে হঠাৎ ভক্তি কোথা হইতে আসিল, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত। অতএব

নূতন যোগসূত্রে সমুদায়গুলি মত ও পথ একত্র আবদ্ধ করিতে গিয়া, সেই যোগসূত্র একটি নূতন মত ও পথ হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই, এবং এই পথ

প্রথমতঃ দেখা সমুচিত, বেদে ভক্তির কোন উল্লেখ আছে কি না? ৮ম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে ১১ ঋকে ভক্তিশব্দের উল্লেখ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইদা হি ব উপস্তুতিমিদা বামস্য ভক্তয়ে।
উপ বো বিশ্ববেদসো নমস্যুরাঁ অসৃক্ষ্যন্যামিব॥"

সায়নাচার্য্য 'ভক্তয়ে, সংভজনায়' এই অর্থ করিয়া, তৎপর আবার 'লাভায়েত্যর্থঃ' লিখিয়া অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন; ইহাতে অনুমান হইতে পারে, ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র ভজ ধাতুর প্রয়োগ লাভার্থেই হইয়াছে, ভজনার্থে নহে। এরূপ অনুমান ভ্রম। ভজধাতুর ঘঞ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণরূপে ভজনীয়ার্থে বহুস্থলে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত রহিয়াছে। এ প্রয়োগ এত সাধারণ যে, তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। ঘঞ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন ভজ ধাতুর পদটি কালে অন্য অর্থে আবদ্ধ হইয়া পড়াতে, 'ভজনীয়' শব্দ পরসময়ে তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান্ ও ভগবতী শব্দের প্রাচুর্য্য, ঋগ্বেদে এ দুই শব্দের প্রয়োগ অল্প হইলেও, নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে ঋগ্বেদে এ শব্দের প্রয়োগ কেবল ধনবত্তা বা ঐশ্বর্য্যবত্তা অর্থে, পুরাণে এ শব্দের প্রয়োগ বৈরাগ্যাদি ঐশ্বর্য্যঘটিত।

ভক্তি, রূপান্তরে ভজনীয়, এ দুই শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া গেল; ভক্ত শব্দ কি ঋগ্বেদে নাই? আছে বৈ কি। ১০ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তে ৯ ঋকে আমরা দেখিতে পাই,—

"যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে।
প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ॥"

এখানে সায়ন দেবভক্তের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন, 'দেবভক্তং স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চ দেবানাং সংভক্তারং সেবিতারম্।' ভক্তিতে সেবার্থেই ভজ ধাতুর প্রয়োগ। ঋগ্বেদে প্রেম বা প্রীতি শব্দ নাই, প্রিয় ও প্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গীতাতেও এইরূপই শব্দব্যবহার। ভক্তিতে দেবানুগ্রহ সর্ব্বপ্রধান। 'একো দেবত্রা দয়সে হি মর্ত্তান্' (৭ম, ২৩ সূ, ৫ ঋ) দেবতাগণের মধ্যে তুমিই একমাত্র অনুগ্রহ করিয়া থাক (দয়তিরনুকম্পার্থঃ—সায়ন)। এরূপ বহুল প্রয়োগ ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। একান্ত অনুগত ব্যক্তির যোগ (অপ্রাপ্ত পাওয়া) ও ক্ষেম (তাহা রক্ষা করা) ভগবান্ স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন, গীতায় (৯।২২) ইহার উল্লেখ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ঋগ্বেদে যোগক্ষেমবহনের কথা অনেক স্থলে আছে। ভক্তিশাস্ত্র অবতারবাদের উপরে স্থাপিত। অবতারবাদ কি ঋগ্‌বেদে আছে? আমরা অবতারবাদের মধ্যে আবেশাবতার মানিয়া থাকি, এবং ইহাই যথার্থ অবতারবাদ। ঋগ্‌বেদে ঈদৃশ অবতারবাদ বিলক্ষণ আছে, প্রমাণস্বরূপ ঋগ্‌বেদের ৭ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের ১ ঋক্‌টী এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

ভক্তি-পথ, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু এ পথ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পথকে পরিহার করে নাই, ভগবৎসাক্ষাৎকারে সমুদায়কে আপনার সঙ্গে এক করিয়া

"অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্।
সখা সুশেব এধি নঃ॥"

'হে রোগনাশক, বাস্তোষ্পতি (গৃহপালক দেব), তুমি নানাবিধরূপে আবিষ্ট হইয়া আমাদের সুখকর হও।' এখানে আবেশসম্বন্ধে সায়ন এই নিরুক্তটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'যদ্যদ্রূপং কাময়ন্তে তত্তদ্দেবা বিশন্তি' দেবগণ যে যে রূপ অভিলাষ করেন, সেই সেই রূপে আবিষ্ট হন। 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।' ভাগবত (১০স্ক, ২অ, ১১ শ্লো) এই কথা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঠিক ঋগ্‌বেদের অনুরূপ নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধকে দেবতার আবির্ভাববর্ণন ঋগ্‌বেদে অতিসাধারণ।

এখন দেখা যাউক, বেদের পর বেদান্তে ভক্তির কোন নিদর্শন আছে কি না? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্তিম শ্লোকে (৬।২৩) যদিও ভক্তিশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথাপি উহাকে আমরা প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিতে চাই না। কেন না যখন অন্যান্য প্রাচীন বেদান্তগ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার নাই, তখন কোন একখানি উপনিষদে চরমে একবার ভক্তিশব্দের উল্লেখ থাকিলে, উহা সন্দিগ্ধ মনে হয়। বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর যে অন্যান্য উপনিষৎ হইতে আধুনিক, তাহার প্রমাণ এ উপনিষদের মধ্যেই বিলক্ষণ আছে। বেদান্তগুলি জ্ঞানপ্রধান। ঋগ্‌বেদে জ্ঞানশব্দের অভাব। 'জ্ঞান' এই শব্দটি না থাকিলেও, ভাবতঃ উহার প্রয়োগ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যদি ভাবতঃ বা শব্দান্তরে উহার প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলেই পরসময়ের ক্রমবিকাশে উহা পরিস্ফুট হইবে, ইহা বিলক্ষণ আশা করা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদে কর্ম্মানুষ্ঠান সহ উপাসনার রীতি ছিল, এই রীতি রূপান্তরিত হইয়া বেদান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকত্ব এই রূপান্তরের কারণ। উহাতে উপাসনাব্যাপার আছে বলিয়া, উপনিষদে ভক্তি অন্তর্ভূত আছে, এ কথা বলিলে অনেকের মনস্তুষ্টি হইবে না। বেদান্ত যদি পরমাত্মাকে প্রিয়ভাবে দর্শন করিয়া, উপাসনা করিবার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর এ সম্বন্ধে সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না। 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' বৃহদারণ্যকে (১।৪।৮) যখন এইরূপ উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরমাত্মাই যে প্রিয়, ইহা উহাতে সর্ব্বথা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমন কি, পরমাত্মাকে মধু (অতি সুমধুর) (বৃহ, ২।৫।১২) বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন বেদান্তে ভক্তির অভাব, কি প্রকারে বলিতে পারা যায়? বেদের সহিত বেদান্তের এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সম্মিলনসাধন করিবেন, ইহা আর একটা আশ্চর্য্য বিষয় কি? বৃহদারণ্যক (৪।৩।২১) যখন বলিয়াছেন, 'তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।' তখন ভক্তির অতি উচ্চ অঙ্গে

রাখিয়াছে, এটি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে, শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ও গৌরব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাঁহার এই মহত্ত্ব দেখাইতে গেলে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতগুলিকে কিরূপে একত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

বৈদিক মত

কর্ম্ম

সমুদায় মতকে একীভূত করিতে গেলে, সেই মতের সারভূত বিষয় গ্রহণ করিয়া, অসারাংশ পরিহার করা প্রয়োজন, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক মতের কি সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, সেটি বলিলেই, পরিত্যক্তাংশ বলিবার আর প্রয়োজন হইবে না। বৈদিক মতে যজ্ঞ প্রধান, যজ্ঞ বিনা বেদের আর কিছু মুখ্য বিষয় নাই। বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞনিরত, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইলে, যজ্ঞস্বীকার না করিলে, কিছুই চলে না। এদিকে বেদান্তবাদিগণ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের প্রতি খড়্গহস্ত। তাঁহারা এই সকল যজ্ঞকে কেবল অবিদ্যার খেলা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা নহে, যত দূর পারেন, উপহাস করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কেবল বেদান্তবাদী হইতেন, যজ্ঞের কথা তুলিতেন না। তিনি এক দিকে যেমন বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, তেমনি বৈদান্তিক ঋষিগণের গভীর ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানাপন্ন। এই জ্ঞান তিনি বৈদিক মতের উচ্ছেদজন্য নিয়োগ না করিয়া, বৈদিক মতের সারোদ্ধারের জন্য নিয়োগ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যজ্ঞ আর কিছুই নহে, ফলাকাঙ্ক্ষায় বাহ্য উপকরণে দেবগণের তুষ্টিসাধনের জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান। বৈদিক ঋষিগণ সকল প্রকার ক্রিয়াকে যজ্ঞের অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন, এটি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একান্ত অনুকূল ব্যাপার হইয়াছিল। তিনি অনায়াসে জগৎকে বুঝাইলেন, "যে কর্ম্ম দ্বারা

যে বেদান্ত আরোহণ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে সেই নিগূঢ় বৈদান্তিক ভক্তিকে বাহির করিয়া দেখাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষেরই প্রয়োজন ছিল।

ভক্তিবিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের কি প্রকারে নিয়োগ হইয়াছে, পরে মূলেই নিবদ্ধ আছে। সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবিবেক জ্ঞানমার্গসিদ্ধ হইলেও, প্রকৃতি ও জীবের নিত্যত্বে উহা ভক্তির পরিপুষ্টিসাধক। পাতঞ্জল তো স্পষ্টই "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ১। ২৩;" "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ২। ১।" এই দুই সূত্রে ঈশ্বরে কর্ম্মাপণরূপ ভক্তিবিশেষ স্পষ্ট নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ঈদৃশ যোগ যে গীতায় প্রধান, তাহা আর কে না স্বীকার করিবেন? অবশ্য অসমুচ্চয়বাদিগণের কথা স্বতন্ত্র।

যজ্ঞ হয় না, সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে (গীতা ৩।৯)।" তিনি দেখিলেন, এ জগৎ উদ্যমপূর্ণ, প্রকৃতিমধ্যে নিরন্তর ক্রিয়া চলিতেছে *, এই ক্রিয়াতেই সকলের স্থিতি, কেহই ক্রিয়া বিনা এক নিমেষও জীবনধারণ করিতে পারে না। যদি সেই ক্রিয়া অপরিহার্য্যই হইল, তবে তাহা ধর্ম্মানুগত করিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা উহা যোগের বিঘ্নকর হইবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি স্বার্থসাধনের জন্য হয়, ঈশ্বরভিন্ন অন্য ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা মুক্তির কারণ না হইয়া, বন্ধনের হেতু হইবে; সুতরাং তিনি সমুদায় অনুষ্ঠেয় ব্যাপার ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাধন করিতে উপদেশ দিলেন। কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাধিত হইলেও, তবু কর্ম্ম এবং ঈশ্বর এ দুইয়ের পার্থক্যবশতঃ, কর্ম্ম ব্রহ্মদর্শনরূপ সাক্ষাৎ যোগের অন্তরায় হইবে, এ জন্য তিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সমুদায় উপাদানে ঈশোপনিষদের (১ শ্লোক) অনুরূপ ঈশ্বরাবির্ভাবদর্শনের উপায়োদ্ভাবন করিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি বৈদিক ঋষিগণের মূলভাব আরও বিশেষরূপে আত্মস্থ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের যজ্ঞীয় সমুদায় দ্রব্যেতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠানাবলোকন করিতেন, ইনি একমাত্র পরব্রহ্মকে সেই স্থলে দর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়া, বেদ ও বেদান্ত উভয়কে একসূত্রে গ্রথিত করিলেন। এই ব্যাপার বেদান্তোচিত ভাবের অনুরূপ হইল; কেন না বেদান্তমধ্যে যে সকল বেদান্ত প্রাচীন, উহারা প্রাকৃতিক সমুদায় ব্যাপারকে যজ্ঞকল্পনা করিয়া, বেদের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবে ব্রহ্মের সহিত যোগনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভাবনী শক্তির বিশেষ পরিচয়।

অধিকারিভেদ

"যে সকল কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ হয় না, সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে" এ কথার অর্থ কি? যজ্ঞশব্দের অর্থ দেবযাজনা, যাজনার অর্থ অর্চ্চনা। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা যজ্ঞ দ্বারা সাধিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহারা যে নরলোকের উপকারসাধনের জন্য বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তাহাদিগের আজীব নিষ্পন্ন করিতেন, এ কথা তিনি মান্য করিতেন। উপকার প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিনিময়ে কিছু না করা অত্যন্ত অধর্ম্ম; সুতরাং দেবগণের নিকটে উপকার পাইয়া, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা

* ১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। এ জন্য তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে তিনি সাধারণ জনগণের কুসংস্কারে আপনাকে বদ্ধ রাখেন নাই। তিনি দেবগণকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারাও মনুষ্যবৎ সত্বাদি-গুণের অধীন, ইহা তিনি জানিতেন। যে সকল লোক গুণাতীত ধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা আপনাদিগকে দেবযাজনায় কখন আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা একেবারে পরমাত্মাকে অধিকার করিয়া সমুদায় কার্য্য করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাহার করিবার কিছু নাই (গীতা ৩।১৭)।" তবে কি ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্মশূন্য হইবেন ? কর্ম্মশূন্য হওয়া কি কখন সম্ভব ? যে ব্যক্তি এই প্রকারে পরিতৃপ্ত, তাঁহার মতে "কর্ম্ম করিবারও তাহার কোন প্রয়োজন নাই, না করিবারও কোন প্রয়োজন নাই (গীতা ৩।১৮)।" যদি কর্ম্ম করিলেও হয়, না করিলেও হয়, তবে তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন ? "অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান (গীতা ৩।১৯)" করিবেন। এরূপ করিয়া কি তিনি পরমাত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইবেন না ? না, হইবেন না, কেন না পুরাকালে জনকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। তবে কি তিনি আত্মতৃপ্ত হইয়া, সাধারণ লোকের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ? কখনই নহে। তিনি অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে সমুদায় কর্ম্ম ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট রাখিয়া, প্রকৃতিসম্ভূত ক্রিয়াসমুদায়ের কর্ত্তা আমি নই জানিয়া, উহা নিষ্পন্ন করিবেন। ইহাতে এই লাভ হইবে যে, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করিবেন না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যবিমুখ হন, অজ্ঞ লোকেরা তাঁহার ক্রিয়াবিমুখত্বের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ করিতে না পারিয়া, উচ্ছৃঙ্খলাচার হইবে, এজন্য তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান সমুচিত, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অভিমত।

পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ

শ্রীকৃষ্ণ এক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কর্ম্ম আবদ্ধ রাখেন নাই। ক্রমিক উন্নতিতে যে সকল নূতন অনুষ্ঠান সাধকসমাজে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সমুদয়কে তিনি যজ্ঞের অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন। আহারপানাদি ইন্দ্রিয়ক্রিয়া, আহারসংযম, তপস্যা, দান, বেদাধ্যয়ন, আত্মসংযমাদি সকলই তাঁহার মতে

যজ্ঞ। সাধকগণ আপনাদিগের জীবনের অবস্থানুসারে যে কোনটির অনুষ্ঠান করুন, তাহাতেই তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। অনেকে বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণনামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত এ বিষয়ে তাঁহার পথপ্রদর্শন করিয়াছে; কিন্তু কে না অবগত আছেন যে, তৎপ্রদর্শিত পথ বহুমুখে ধাবিত, যোগের অননুকূল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সুবহু চেষ্টায়ও একসূত্রে গ্রথিত করা দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ সেই যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যদ্দ্বারা যজ্ঞসম্বন্ধে মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন প্রকারের কর্ম্ম হউক না কেন, উহা বন্ধনের কারণ হইতে পারে, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই কর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপ কৌশলাবলম্বন করিতে হইবে, তাহার তিনি ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কৌশলটি বুঝিবার পূর্ব্বে, কর্ম্মের গতি অগ্রে বা কি ছিল, পরে বা কি হইয়াছে, এইটি আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। এ একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়া, অতি পূর্ব্ব হইতে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে যে, কর্ম্মের ফল অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তাহার তদনুসারে ফললাভ হইবে। সর্ব্বত্র বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা কেন নিবদ্ধ হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণই বা কেন বলিয়াছেন যে, বেদের সমুদায় অনুষ্ঠান সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ লইয়া, সাধককে সেই তিন গুণের অতীত হইতে হইবে? সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ দেবগণের, রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষাদির এবং তমঃপ্রধান লোকেরা ভূতপ্রেতাদির যাজনা করিয়া থাকে। যাঁহারা যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞপ্রণালী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দেবযক্ষভূতযাজনা বিলক্ষণ নিবিষ্ট রহিয়াছে। যাহারা দেবযাজনা করে, তাহারা ক্ষয়িষ্ণু দেবলোকে গমন করে, এবং পুনরায় ভোগান্তে তাহাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। বৈদিক সময়ে ভোগান্তে এখানে আসিতে হয়, এ কথা ছিল না, বেদান্তের সময়ে এ কথা উঠিয়াছে। যখন আত্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তখন ঋষিগণ জানিলেন যে, গতায়াতের মূল সাকার রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ চলিয়া গেল, এখন তাঁহারা নিরবয়ব আত্মার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মে চির অধিবাস করিবেন *। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের

* স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অনুগীতায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। •

"ততঃ কদাচিন্নির্ব্বেদান্নিরাকারাশ্রিতেন চ।
লোকতন্ত্রং পরিত্যক্তুং দুঃখার্ত্তেন ভৃশং ময়া॥

অনিবার্য্য ফলে একান্ত বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তিনি জানিতেন, কর্ম্ম আপনি কোন ফলদান করিতে পারে না, আমাদের নিজ নিজ কামনাই ফলের হেতু। সুতরাং তিনি দেখিলেন, এই কামনা যদি ঈশ্বরাভিমুখান হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ক্ষয়িষ্ণু ফল আর থাকিবে না, কর্ম্ম জীবকে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে। সুতরাং তিনি নিষ্কাম অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন অন্যকামনাবর্জ্জিত হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি জানিতেন, কাম অপরিহার্য্য, মোক্ষেতেও উহা আনন্দসম্ভোগের অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে; তাই তিনি ঈশ্বরকামনাকেই নিষ্কাম বলিয়া প্রচার করিলেন। এখানে সৎকার্য্য করিয়া স্বর্গে যাইব, ঈদৃশ উৎসাহ, অথবা দুষ্কার্য্য করিয়া নরকস্থ হইব, ঈদৃশ ভয় রহিল না; কর্ম্ম একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, দৃষ্টিতে রহিলেন কেবল এক ঈশ্বর। এইরূপে ঈশ্বরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া, যে ব্যক্তি স্বভাববিহিত কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া, ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট জানিয়া, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে চিত্ত সমান রাখিয়া অনুষ্ঠান করে, সেই চতুর, সেই যোগী, সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে অপূর্ব্ব কৌশলাবলম্বন করিল, যে কৌশলে সে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করিল না, কর্ম্মজন্য তাহার বন্ধন হইল না, অনায়াসে সে কর্ম্মপ্রণালী দিয়া ঈশ্বর সহ চিরসংযুক্ত হইল।

সমন্বয়

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই দেখা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ও অন্যান্য বিবিধ কর্ম্মকে কি প্রকারে উচ্চ ভূমিতে আনয়ন করিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ কার্য্য করিবার

লোকেঽস্মিন্নন্বভূয়াহমিমং মার্গমনুষ্ঠিতঃ।
ততঃ সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা প্রসাদাদাত্মনো ময়া॥
নাহং পুনরিহাগন্তা লোকানালোকয়াম্যহম্।
আসিদ্ধেরাপ্রজাসর্গাদাত্মনোঽপি গতিঃ শুভা॥
উপলব্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথেয়ং সিদ্ধিরুত্তমা।
ইতঃ পরং গমিষ্যামি ততঃ পরতরং পুনঃ॥
ব্রহ্মণঃ পদমব্যক্তং মা তেঽভূদত্র সংশয়ঃ।
নাহং পুনরিহাগন্তা মর্ত্ত্যলোকং পরন্তপ॥"

অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা ১৬ অ, ৩৮—৪২।

পক্ষে একটি মূলসূত্র তিনি আপনার জীবনের মূলে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার আপনার সমুদায় জীবন নিয়মিত হইয়াছিল। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি এই মহাব্যাপার আত্মজীবনের আলোকে জগতের নিকটে প্রকাশ করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। সে মূলসূত্রটি এই, "নদীসকল সমুদ্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কখন বেলা উল্লঙ্ঘন করে না, পুনরায় নূতন জল আসিয়া উহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কামনার বিষয় সমুদায় যাহাতে প্রবেশ করে, অথচ বিকারী হয় না, সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে, ভোগকামনাশীল নহে (গীতা ২।৭০)।" দেহ ইন্দ্রিয় মন ইহারা স্বভাবের প্রেরণায় নিয়ত কার্য্য করিবেই, কিন্তু ইহাদিগের ক্রিয়ায় আত্মা যদি অবিকারী থাকে, তাহা হইলে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগের উহারা অন্তরায় হয় না। তিনি বাল্যকাল হইতে আপনার জীবনে এইটি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, স্বভাববিহিত কার্য্য সকল করিয়াও তাঁহার আত্মার প্রশান্তভাব যায় না। তাঁহার এই স্বাভাবিক ভাব অপরের জীবনে কি প্রকারে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহাই তাঁহার সমুদায় জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি দেখিলেন যে, লোক-সকল বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত। এই সমুদায় কার্য্যের সঙ্গে তাহাদিগের সুখের অভিলাষ সুদৃঢ়রূপে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই সকল অভিলাষে তাহাদিগের মন নিতান্ত অস্থির, কখন তাহাদিগকে শান্ত হইতে দেয় না। তিনিও কর্ম্ম করেন, তাহারাও কর্ম্ম করে, অথচ তিনিই বা কেন শান্তমনা, তাহারাই বা কেন অশান্তমনা, ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি আত্মরতি আত্মতৃপ্ত, তাহারা আত্মা কি জানে না, কেবল দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং তাহাদিগের মনকে আত্মার দিকে আকর্ষণ করিতে যত্ন করিলেন এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সঙ্গে আপনি যে প্রকার অসংশ্লিষ্ট, সেই প্রকার অপর সকলে যাহাতে হইতে পারে, তাহার উপায় আপনার জীবনের আলোকে বিনিঃসৃত করিলেন। তাই বৈদিক কর্ম্ম এবং বৈদান্তিক আত্মতত্ত্ব দুই তাঁহাতে মিশিয়া এক হইয়া গেল।

বৈদান্তিক মত

আত্মতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও, বৈদিক ধর্ম্মে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার প্রথম হইতে আত্মদৃষ্টি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এত দূর

প্রবল ছিল যে, তিনি প্রকৃতির পক্ষপাতীই সমধিক ছিলেন, কি আত্মার পক্ষপাতীই সমধিক ছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। বস্তুতঃ কথা এই যে, তাঁহাতে এই দুই দিক্ প্রথম হইতে সুসমঞ্জসভাবে কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ সকলেরই চক্ষুর্গোচর হইয়াছে। বালস্বভাবসুলভ আমোদ প্রমোদে তিনি সহজে লিপ্ত হইতেন, অথচ সকল হইতে আপনাকে এমনই স্বতন্ত্র রাখিতেন যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বাল্যকালেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি চেনে না, বোঝে না, সে সাধারণ ব্যক্তিগণের দলে মিশিয়া, তাহাদিগের মত হইয়া যায়, তাহার কোন আর বৈশেষ্য থাকে না। সাধারণ লোকশ্রেণী হইতে যিনিই শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার আত্মদৃষ্টি প্রবল। প্রকৃতির আকর্ষণে পরিচালিত হয় সকলেই, কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে সেই আকর্ষণের ঊর্দ্ধে আপনাকে সর্ব্বদা রাখা, ইহা সকলের দ্বারা সাধিত হয় না। যে ব্যক্তিতে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ নাই, কেবল আত্মদৃষ্টি প্রবল, সে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে আপনাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র রাখে, কাহার সঙ্গে মিশে না; সে এক প্রকার অহঙ্কৃত লোক বলিয়া প্রতিবেশীর নিকট পরিচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এ দোষ কেহ আরোপ করিতে পারে নাই, তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মদৃষ্টি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাই সকল সময়ে সকল কার্য্যের মূলে গিয়া প্রবেশ করিবার সামর্থ্য তিনি বাল্যকালেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গোপগণকে গিরিযজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করাতে, তাঁহার এই সামর্থ্য প্রকাশ পায়। এই সামর্থ্যই বেদান্তের মূল। আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাসে প্রণোদিত হইয়া বেদের সূক্ত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে বিচার নাই, তর্ক নাই, কেবল হৃদয়গ্রাহী কবিত্ব। বেদের আত্মতত্ত্ব এবং বেদান্তের আত্মতত্ত্বে কত প্রভেদ! বেদ বলিলেন, দুই সুন্দর পাখী পরস্পর পরস্পরের সখা, এক বৃক্ষে একত্র বাস করেন, এক জন সুস্বাদু ফল ভোজন করে, আর এক জন কিছু ভোজন না করিয়া কেবল তাহাকে অবলোকন করেন *। তত্ত্বটি উচ্চ বটে, কিন্তু হৃদয়ের

---

* ঋগ্বেদ ১ম, ১৬৪ সূ, ২০ ঋক্। এটি জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব প্রকাশ করে কি না, সন্দেহের বিষয়। ঊর্দ্ধে সবিতা, অধোতে অগ্নি, সবিতা কেবল দর্শন করেন, অগ্নি ভোগ করেন,

প্রণালী দিয়া সুমিষ্ট কবিতায় বিনিঃসৃত, কবিত্ববর্জ্জিত গভীর চিন্তায় নীরস মূলতত্ত্বরূপে প্রকাশিত নহে। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বৈদিক কবিত্বে সংস্পৃষ্ট ছিল, তাহা না হইলে তিনি প্রাকৃতিক শোভাবিশিষ্ট গোবর্দ্ধনকে কেন অর্চ্চনা করিতে বলিলেন? তবে এই সকল অনুষ্ঠান কেন হয়, তাহার মূল তিনি সেই বাল্যকালেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। যাহার দ্বারা যাহার জীবিকালাভ হয়, সে তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এই যে মূলনিষ্কর্ষণ, ইহা বেদান্তসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহার বাল্যকাল হইতে কবিত্বের সঙ্গে যে চিন্তাশীলতার যোগ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি পরসময়ে ধর্ম্মরাজ্যে মহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছেন।

বেদান্ত ক্রমে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম, এই তিন ভাগে সমুদায় বিচার্য্য বিষয় স্থির করিয়া, প্রথমতঃ ভূতগণ, তৎপর ভূতাধিষ্ঠিত দেবগণ এবং দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আত্মতত্ত্বে গিয়া উহা উপস্থিত হইয়াছে। স্থূল ভূতগণের বিষয় বিচার করিয়া, তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থির করা হইয়াছে। এই ভূতগণ কিছু করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের পরিচালন জন্য দেবতার প্রয়োজন। কিন্তু সেই দেবতাগণ আবার প্রাণ মন চিত্ত ও হৃদয়যুক্ত না হইলে কিছু করিতে পারেন না, সুতরাং প্রাণাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমুদায় শ্রেষ্ঠ; তাই বেদান্ত বৈদিক দেবগণকে অধঃকরণ করিয়া, প্রাণাদিকে বাড়াইয়াছে। বৈদান্তিক ঋষিগণের প্রণালী দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আত্মতত্ত্বে গিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছে, বলা যাইতেছে না; তিনি একেবারে তাঁহাদিগের মূলতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এই দেহ হইতে দেহীকে স্বতন্ত্র করিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন, এবং দেহের পরিবর্ত্তন মধ্যে দেহী নিত্য অপরিবর্ত্তিত থাকে, এই তত্ত্বটি তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ

পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। এই মণ্ডলে, এই সূক্তে আরও এমন সমুদায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, যাহাতে বেদান্তবাদিগণ যে অর্থে এই ঋক্‌টী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। "অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব" ইত্যাদি ঋকে আত্মতত্ত্ব সুস্পষ্ট ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি উপরি উদ্ধৃত ঋক্‌টাকে জীবাত্মপরমাত্মতত্ত্বদ্যোতকরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। বেদান্ত যে ভাবে এই ঋক্‌টী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি উহা সে ভাবে কেনই না গ্রহণ করিবেন না?

করিয়াছেন। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি অবস্থা দেহের, দেহীর নহে, এই সত্যের উপরে তিনি এত দূর ঝোঁক দিয়াছিলেন যে, ক্ষাত্রোচিত বধকর্ম্মকে এই মূলসূত্রের উপরে স্থাপন করিয়া, ক্ষত্রিয়ের শত্রুবধজন্ম পাপকে তিনি একেবারে উড়াইয়া না দিন, লঘু করিয়াছিলেন। স্বার্থবিরহিত হইয়া, কেবল অধর্ম্মনির্ম্মূলনার্থ, ধর্ম্মের পক্ষ-সমর্থন যেখানে এই বধকর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, সেখানে তিনি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ কার্য্যকে পাপ বলিয়া গণ্য করা দূরে থাকুক, পুণ্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মতত্ত্বসম্পর্কীয় মতসম্বন্ধে, তাঁহার একটী কথা তুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা কি ছিল। "আমি কখন ছিলাম না, তা নয়; তুমি কখন ছিলে না, তা নয়; এই রাজন্তবর্গ ছিল না, তা নয়; ইহার পর আমরা সকলে থাকিব না, তা নয় (গীতা ২।১২)।" আত্মা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে, বেদান্তসিদ্ধ এই মত আমরা এ স্থলে দেখিতে পাইতেছি। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিবর্ত্তন নাই, এ সকল এই কথারই ব্যাখ্যান ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে অনাত্মবাদী ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না; বলিতে কি, তাঁহার সময়ে সকল প্রকারের মতভেদ ও সংশয়বাদ প্রচলিত ছিল। সে সময়ে কেবল বিরোধ, কেবল বিসংবাদ। দেহান্তে স্থিতি হইবে, কেহ বলিতেন; কেহ বলিতেন, দেহান্তে কে আর স্থিতি করিবে? কেহ সকল বিষয়ে সংশয়ী, কেহ নিঃসংশয়ী ছিলেন; কেহ সমুদায়কে অনিত্য মনে করিতেন, কেহ নিত্য মনে করিতেন; কেহ মনে করিতেন, কিছুই নাই, সকলই এক মহৎ অনস্তিত্ব। কেহ অদ্বৈত, কেহ দ্বৈত, কেহ দ্বৈতাদ্বৈত মানিতেন; কেহ মানিতেন, ব্রাহ্মণেরা দেবতা ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী, কেহ বা তাহা মানিতেন না। কেহ অভেদ, কেহ ভেদ, কেহ বহুত্ব মানিতেন। কেহ দেশ কাল আছে বলিতেন, কেহ বলিতেন, দেশ কাল বলিয়া কিছুই নাই। কেহ জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেন, কেহ মস্তক মুণ্ডন করিয়া নগ্নবেশে বিচরণ করিতেন। কেহ অস্নাত থাকিতেন, কেহ ত্রিসবন স্নান করিতেন। কেহ আহার করিতেন, কেহ অনশন থাকিতেন। কেহ কর্ম্মের প্রশংসা করিতেন, কেহ শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ মোক্ষের প্রশংসা করিতেন, কেহ ভোগের প্রশংসা করিতেন। কেহ ধন চাহিতেন, কেহ নির্ধনত্ব চাহিতেন। কেহ বলিতেন, উপাস্তসাধন আছে,

কেহ বলিতেন, উপাস্যসাধন বলিয়া কিছুই নাই। কেহ অহিংসারত ছিলেন, কেহ হিংসারত ছিলেন। কেহ কেহ পুণ্য-ও-কীর্তিনিরত ছিলেন, কেহ বলিতেন, পুণ্য ও কীর্তি কিছুই নাই। কেহ সদ্ভাবরত ছিলেন, কেহ সংশয়িত অবস্থায় জীবনযাপন করিতেন। কেহ দুঃখ চাহিতেন, কেহ সুখ চাহিতেন, কেহ ধ্যানে রত থাকিতেন। কেহ যজ্ঞ, কেহ দান, কেহ তপস্যা, কেহ স্বাধ্যায়, কেহ জ্ঞান, কেহ সন্ন্যাস, কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিতেন। কেহ ভূতগণের চিন্তা করিতেন; কেহ যাহা কিছু সকলেরই প্রশংসা করিতেন, অপরে কিছুরই প্রশংসা করিতেন না *। এই বিবিধ প্রকারের মতভেদের মধ্যে, তিনি সকল প্রকারের মতকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন এবং আত্মার মহত্ত্ব এবং গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বেদান্তের সমাদর বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

---

* "ঊর্দ্ধং দেহাদ্বদন্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে।
কেচিৎ সংশয়িতং সর্ব্বং নিঃসংশয়মথাপরে॥
অনিত্যং নিত্যমিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যপি চাপরে।
একরূপং দ্বিধেত্যেকে ব্যামিশ্রমিতি চাপরে॥
মন্যন্তে ব্রাহ্মণা দেবা ব্রহ্মজ্ঞাস্তত্ত্ববাদিনঃ।
একমেকে পৃথক চান্যে বহুত্বমপি চাপরে॥
দেশকালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে।
জটাজিনধরাশ্চান্যে মুণ্ডাঃ কেচিদসংবৃতাঃ॥
অস্নানং কেচিদিচ্ছন্তি স্নানমপ্যপরে জনাঃ।
আহারং কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চানশনে রতাঃ॥
কর্ম্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি প্রশান্তিং চাপরে জনাঃ।
কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ভোগান্ পৃথগ্বিধান্॥
ধনানি কেচিদিচ্ছন্তি নির্ধনত্বমথাপরে।
উপাস্যসাধনস্ত্বেকে নৈতদস্তীতি চাপরে॥
অহিংসানিরতাশ্চান্যে কেচিদ্ধিংসাপরায়ণাঃ।
পুণ্যেন যশসা চান্যে নৈতদস্তীতি চাপরে॥
সদ্ভাবনিরতাশ্চান্যে কেচিৎ সংশয়িতে স্থিতাঃ।
দুঃখাদন্যে সুখাদন্যে ধ্যানমিত্যপরে জনাঃ॥
যজ্ঞমিত্যপরে বিপ্রাঃ প্রদানমিতি চাপরে।
তপস্ত্বন্যে প্রশংসন্তি স্বাধ্যায়মপরে জনাঃ॥

অহংবাদ

বেদান্তে আত্মার প্রাধান্য, ইহা সকলেই জানেন। বেদান্তকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বলিলে কিছু অন্যায় হয় না। প্রাকৃতিক চিন্তা হইতে মন নিঃসৃত হইয়া, যখন ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, সেই সময়ে বেদান্তের অভ্যুদয়। বেদান্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে অল্পে অল্পে ভিতরে গিয়া, সর্ব্বশেষে আত্মায় সমুপস্থিত হইয়াছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই পঞ্চকোষের বিচার বেদান্তে প্রসিদ্ধ। অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, এই চারিটির ভিতরে আত্মার অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া, পরে যখন সাধক আনন্দে আত্মার অধিষ্ঠান অবলোকন করিলেন, তখন তিনি কৃতার্থ হইলেন এবং আপনাকে আনন্দময় ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রথমোৎপন্ন, দেবতাগণের পূর্ব্ব, প্রাণিগণের অমৃতত্ব আমাতে অবস্থিত", "আমি সমুদায় বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াছি (তৈত্তী, ভৃগুবল্লী ১০।৫)।" যখন সাধক এই প্রকার নিমগ্নাবস্থায় আপনাকে এবং পরব্রহ্মকে আনন্দে একীভূত অনুভব করিলেন, তখন তাঁহার সমুদায় ভয় অপনীত হইল। এই আনন্দময় ঈশ্বর হইতে আপনাকে "অল্প একটু ভিন্ন করিলে তাঁহার ভয় সমুপস্থিত হয়।" এই জন্য উপদেষ্টৃমাত্রেই "অহং" শব্দ ঈশ্বরবাচক করিয়া, আপনাকে উড়াইয়া দিয়া, "আমায় যে পূজা করে" "আমায় যে চিন্তা করে" ইত্যাদিরূপে উপদেশ দান করিতেন *। এই ব্যবহার সার্ব্বত্রিক ছিল বলিয়া, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস এ

জ্ঞানং সন্ন্যাসমিত্যেকে স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ।
সংক্ষমেকে প্রশংসন্তি ন সর্ব্বমিতি চাপরে ॥"

অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা ৪৯ অ, ২—১৩ শ্লোক।

* কপিল, ঋষভ প্রভৃতি উপদেষ্টৃগণমাত্রেই এইরূপ অভেদ-দৃষ্টিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। মাতার কথা দূরে, কপিল তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন,

"গচ্ছ কামং ময়া পৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা।
জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥
মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্।
আত্মন্যেবাত্মনা বীক্ষ্য বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি ॥"

ভাগবত, ৩ স্ক, ২৪ অ, ৩৭—৩৮ শ্লোক।

আমাতে কর্ম্মার্পণ করিয়া মৃত্যুজয় কর, আমাকে ভজনা কর, আমিই সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ পরমাত্মা, আত্মাতে আমায় দর্শন করিয়া শোকশূন্য হইবে, অভয়লাভ করিবে, এ কথাগুলি কপিল পিতাকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন।

বিষয়ে সূত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদিগণকেও এ ভাব স্বীকার করিতে হইয়াছে *।

ঋষভ তাঁহার পুত্রগণকে উপদেশকালে বলিয়াছেন,

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎস্থ ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥"

ভাগবত ৫ স্ক, ৫ অ, ৩ শ্লোক।

তাহারা সাধু, যাহারা, আমি যে ঈশ্বর, আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়াছে—একথা বলিয়া ঋষভ আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্ন করিয়াছেন। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, তাঁহাতে প্রীতি না হইলে মুক্তি হয় না, এ কথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই ;—

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।"

ভাগবত, ৫স্ক, ৫অ, ৬ শ্লোক।

* "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।" ১।১।৩০।

"স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেব পরং ব্রহ্মেত্যার্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি স্ম"—শঙ্করঃ।

"উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বাত্মত্বেনোপদেশোঽয়ং...শাস্ত্রেণ স্বাত্মদৃষ্টিকৃতঃ"—রামানুজঃ।

"অহং ব্রহ্মাঽস্মি মামুপাস্বেতি ব্রহ্মদৃষ্ট্যা উপদেশঃ। তথাহি কৃষ্ণাদয়োঽপ্যর্জ্জুনাদীন্ প্রত্যুপদিষ্টবন্তঃ"—শ্রীকণ্ঠঃ।

শাস্ত্রমন্তর্যামী "সম্বিচ্ছাস্ত্রং পরং পদম্" ইতি হি ভাগবতে। "তত্তন্নাম্নোচ্যতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বশাস্ত্রস্য হেতুতঃ। ন ক্বাপি কিঞ্চিন্নামাস্তি তমৃতে পুরুষোত্তমম্ ॥" ইতি চ পাদ্মে। "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদিবৎ।—মধ্বঃ।

"উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু। ১।৩।১৯।"

"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদ্যুত্তরবচনাজ্জীব ইতি চেৎ ন, তত্র হি পরমেশ্বরপ্রসাদাবির্ভূতস্বরূপ উচ্যতে। যৎ প্রসাদাৎ স মুক্তো ভবতি স ভগবান্ পূর্ব্বোক্তঃ।—মধ্বঃ।

"জীবস্যৈব আত্মত্বেন পরমাত্মোপদেশোঽয়ম্"—নিম্বার্কীয়াঃ,
"ব্রহ্মাবেশাদুপদেশঃ" ইতি—বিষ্ণুস্বাম্যনুসারী বল্লভঃ।

"সোঽয়ং স্বোপদেশঃ কৃতঃ স শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈব সম্ভবতি"—বলদেবঃ।

জীবগোস্বামিকৃত সর্ব্বসংবাদিনীগ্রন্থে এই দুই সূত্রসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ;—

"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেবাদিবৎ" ইত্যত্র তু ব্যাখ্যেয়ম্ "প্রাণো বা অহমস্মি পুরুষঃ" ইত্যাদিকং যৎ স্বস্য পরমেশ্বরত্বমিবোপদিষ্টমিন্দ্রেণ তত্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদ্যভেদপ্রতিপাদকশাস্ত্রদৃষ্ট্যা সম্ভবতি, চিদাকারসাম্যেনৈক্যাৎ, ক্বচিদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাত্রোরেকশব্দপ্রত্যয়াভ্যাং বা, শরীরশরীরিণোর্বা, যথৈব বামদেব উবাচ "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি।

"উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" ইতি অত্রাপীয়ং ব্যাখ্যা। * * * আবির্ভূতস্বরূপস্তু জীবস্তত্রোচ্যতে, মুক্তৌ পরমেশ্বরপ্রসাদেন তৎসাধারণ্যপ্রায়াবির্ভাবাত্তস্য 'পরমসাম্যমুপৈতি' ইতি শ্রুতেঃ।"

উপদেষ্টৃমাত্রকে ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া উপদেশ দান করিতে হইত সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বিশ্বাস ছিল যে, তিনি নিরন্তর ব্রহ্মেতেই স্থিত ছিলেন, কখন তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতা অর্জ্জুনকে বলেন, তখন তিনি যোগে ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া বলিয়াছিলেন, অনুগীতা-কথনের সময়ে যেন সেরূপ অবস্থায় তিনি বলেন নাই, ইহা তাঁহার কথার ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে এই প্রকাশ পায় যে, তিনি ঈশ্বর সহ অভেদভাবে নিয়ত স্থিত ছিলেন। এইরূপে স্থিতিই বেদান্তের চরম তাৎপর্য্য। ইহাকেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বলিত। শ্রীমদ্ভাগবত যে ভক্তিগ্রন্থ, ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহারও অন্তিম সিদ্ধান্ত, অহংভাবে ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে অবস্থিতি। শুকদেব রাজা পরিক্ষিতকে এই ভাবে (১২স্ক, ৫অ, ১১—১৩ শ্লোক) স্থিতি করিয়া কলেবরত্যাগ করিতে উপদেশদান করিয়াছিলেন। এই ভাগবতেই ব্রহ্মাবির্ভাববশতঃ উপদেষ্টাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিবার বিধি আছে। এই অহংভাবসিদ্ধির জন্য অহংগ্রহ উপাসনা-পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। অহংগ্রহ উপাসনা—আমি আর আমার ইষ্ট এক, এইটি সাধনের জন্য "আমিই সেই" এইরূপ চিন্তা। সমুদায় বেদান্তের সার এই একত্ব, এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে পারগমন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিবার কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না। উত্তরগীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অর্জ্জুনকে এই অহংভাবে স্থিতি * উপদেশ দিয়াছেন। উত্তরগীতার প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য বিষয়ে কোন কথা না তুলিয়া, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়, এ উপদেশ কিছু তাঁহার মত-

---

স চ পরমাত্মা হরিরস্মদর্থো বোধ্যঃ। 'অহমাত্মা গুড়াকেশে'ত্যাদিধাত্মাহমর্থয়োরভেদ-স্মরণাৎ। 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে'ত্যাদি শ্রুতৌ প্রধানমহদহঙ্কারাদিসৃষ্টেঃ প্রাগেব তৎসত্ত্বপ্রত্যয়াৎ প্রাকৃতত্বং তস্য পরাস্তম্। 'তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মী'তিশ্রুতৌ 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্' ইতি স্মৃতৌ চ।—বেদান্তস্যমন্তকঃ—২য় কিরণ।

"যদেবেহেত্যাদৌ ব্রহ্মাবির্ভাবেষু ভেদগ্রাহী নিন্দ্যতে।"

বেদান্তস্যমন্তকঃ—৩য় কিরণ।

* "অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েদেকাগ্রমনসা সকৃৎ।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্॥"

উত্তরগীতা, ২ অ, ৩৭ শ্লোক।

বিরোধী নহে। তিনি আপনি যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যেটিকে তিনি চরম প্রাপ্যাবস্থা মনে করিতেন, তৎসম্বন্ধে আপনার প্রিয় শিষ্যকে, যে সময়ে হউক, কেনই বা উপদেশ দিবেন না ?

সমন্বয়

উপনিষৎসকলের আত্মতত্ত্ব এবং অহমে আত্মা ও পরমাত্মার একত্ব, বেদান্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণ সারভূত বিষয় বলিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা দেখিতে পাওয়া গেল। এখন দেখা উচিত, কোন্ সূত্রে তিনি বেদ ও বেদান্তবিহিত ধর্ম্মকে একসূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। তিনি আত্মাকে বেদান্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া, সেই আত্মাকে সর্ব্বত্র এক অখণ্ডরূপে অবলোকন করিলেন। আমি, তুমি, সে, এ ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানতানিবন্ধন, আত্মার সম্বন্ধে আমরা সকলে এক, আবার এই আত্মাও পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যখন অহংভাব উপস্থিত হইল, সেই অহম্ অন্তর বাহির দুইকে একসূত্রে গ্রথিত করিল। "যোগাভ্যাসে যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদায় দেখে, তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না, সে আমার নিকটে অদর্শন হয় না (গীতা ৬।২৯—৩০)।" যোগজনিত এই জ্ঞানকেই তিনি সমুদায় বাহ্যানুষ্ঠান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। আমাতে সমুদায় ভূতগণ, সমুদায় ভূতগণকে লইয়া আমি ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর আমাতে এবং সমুদায় ভূতগণেতে, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কি আছে? "এক জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় (গীতা ৪।৩৩)।" "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন, * * * যে জ্ঞানে তুমি সমুদায় ভূতগণকে আপনাতে এবং আমাতে দর্শন করিবে (গীতা ৪।৩৪—৩৫)।" কেবল আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন, বা তৎসহ অভিন্নভাবে স্থিতি বেদান্তসম্মত পথ; কিন্তু আবার যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখা গেল, তখন বেদান্ত সহ বেদ মিলিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এক আত্মা ও পরমাত্মার অন্তরে বাহিরে স্থিতি স্থাপন করিয়া, বেদ ও বেদান্তকে সমন্বিত করিয়াছেন।

পৌরাণিক মত

পৌরাণিক মতের ভিত্তি

প্রসিদ্ধ পুরাণ সমুদায় ব্যাসবিরচিত বলিয়া বিদিত। ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের কেবল সমকালিক নহেন, কিন্তু বলিতে গেলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, মহাভারত রচনা করিয়াছেন, সম্ভব মত পুরাণনিচয় লিখিয়াছেন। যদি পুরাণ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাসবিরচিত হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন পৌরাণিক মত নূতন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পুরাণনিচয়ের জন্মদাতা, এটি লৌকিক ভ্রান্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ব্বেও বেদ বেদান্তাদির ন্যায় পুরাণ ও ইতিহাস ছিল, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা সকলেই জানেন। পুরাণশাস্ত্র ভগবানের লীলাপ্রদর্শনজন্য নিবদ্ধ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে ভগবানের লীলা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অধিক দূর যাইতে হয় না, এক রামায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যকুলে ভগবানের আবির্ভাব বা জন্ম হইয়া নরলোকে তৎকর্ত্তৃক কার্য্যসাধন কি প্রকার বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ বিষ্ণুর অবতার। অধার্ম্মিক দুরাত্মা অথবা অপরাজেয় বিক্রমশালী দেবদ্বেষী পুরুষকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণুর বা নারায়ণের অবতরণ হয়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আগমনের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য শিব বা বিষ্ণুর উপদেষ্টরূপে অবতরণ, এ তো অতিসাধারণ। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ যে নরনারায়ণ ঋষির অবতার, তাঁহারা ইঁহাদিগের আগমনের বহুদিন পূর্ব্বে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবতারবাদই পুরাণের ভিত্তিভূমি। ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহার এমনই সংস্করণ করিয়াছেন যে, মনে হয়, যেন তাঁহা হইতেই ইহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতরণের তিনটি কারণ বিন্যস্ত করিয়াছেন, (১) সাধুগণের পরিত্রাণ, (২) দুষ্ক্রিয়াসক্তগণের বিনাশ, (৩) ধর্ম্মসংস্থাপন। এই তিন কারণকে আবার তিনি একটি কারণে পরিণত করিয়াছেন, সে কারণটি ধর্ম্মসংরক্ষণ। ধর্ম্ম নিত্যকাল জনসমাজের কল্যাণবর্দ্ধনের জন্য আছেন, যখনই

এই ধর্ম্মের কোন প্রকারে গ্লানি সমুপস্থিত হয়, তখনই ভগবানের বিশেষ আবি র্ভাবের প্রয়োজন হয়, এই আবির্ভাবই অবতরণ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ এই পৌরাণিক মতকে এমনই এক প্রশস্ত ভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, ইহাতে বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ তিন এক হইয়া গিয়াছে। ইনি অন্তরে বাহিরে ভগবানের আবির্ভাবপ্রদর্শনের উপায় এমনই সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে ইনি সমুদায় ধর্ম্মসংস্থাপকগণের অগ্রগণ্য। পুরাণের সহিত যে নূতন পথ সংযুক্ত হইয়াছে, এই আবিষ্কার তাহার মূল আশ্রয়।

ঈশ্বরের বিভূতি

সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সমান আবির্ভাব কখন অনুভূত হয় না। কোথাও বা তাঁহাকে সুস্পষ্ট, কোথাও বা ঈষদ্ব্যক্ত, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের মত এই যে, ভগবান্ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমুদায় জগতে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অব্যক্ত মূর্ত্তির আরাধনা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কষ্টসাধ্য, কেন না তাহারা দেহধারী, দৈহিক ইন্দ্রিয়যোগে নিরন্তর সাকার বস্তু দর্শন করিয়া করিয়া, তাহাদিগের এমনই অভ্যাস হইয়াছে যে, সাকার ভিন্ন আর কিছু তাহারা সহজে ধারণার বিষয় করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির সাকারে নিরাকার দর্শনের অভ্যাস যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য উপায়োদ্ভাবন প্রয়োজন, এবং সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বে জগতের মধ্যে ঈশ্বরকে ধারণা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উদ্ভাবিত উপায়কে সাধারণভূমিতে অবতারণ করিয়া বিস্তৃতক্ষেত্রব্যাপী করিয়া তোলা, এবং সকলের আয়ত্তাধীন করা, ইহা সামান্য উদ্ভাবনব্যাপার নহে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকমাত্রেই পূর্ব্বাবিষ্কৃত উপকরণ সমুদায় লইয়া, সেইগুলিকে নূতন সংযোগে সংযুক্ত করিয়া, একটি নূতন ব্যাপার করিয়া তুলেন, ইহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। তাঁহাদের হাতে কিছুই বিনষ্ট হয় না, নূতন আকার ও নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ আপনি ব্যক্তাব্যক্ত জগৎকে ধারণার বিষয় করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে; কিন্তু এই বিশ্বের সমুদায় পদার্থে কি প্রকারে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন করিতে হইবে, ইহার উপায় তিনি করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবদাবির্ভাবদর্শনের এই মূল সূত্র

বাহির করিলেন, "যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জান (গীতা ১০।৪১)।" এ তো বলিলেন, যাহাদিগেতে সুস্পষ্ট ঈশ্বরের শক্ত্যাদির বিকাশ আছে, তৎসম্বন্ধে। যে স্থলে ঈষদ্ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন, সেখানে কি দেখিতে হইবে? ভগবানের অস্তিত্বে তাহাদিগকে অস্তিত্ববান্ দেখিতে হইবে। অন্ততঃ তাঁহার সত্তামাত্রও তাহারা প্রকাশ করে। তাই তিনি বিভূতিসংগ্রহার্থ বলিলেন, "চরাচরে এমন ভূত নাই, যাহা আমা বিনা হইতে পারে (গীতা ১০।৩৯)।"

এই ঈশ্বরের বিভূতির সঙ্গে ভক্তিমীমাংসাসূত্রকার শাণ্ডিল্যের মতের ঐক্যানৈক্য এখানে দেখা প্রয়োজন। তাঁহার মতে, এই অদ্বিতীয় বিশ্বই ভজনীয়, কেন না এ সমুদায় তাঁহারই স্বরূপ *। অব্যক্ত ঈশ্বর বিশ্বেতে ব্যক্ত, সুতরাং ব্যক্তভাবে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে গেলে, সমুদায় জগতের সহিত সত্তা ও জ্ঞানে ভগবানকে অন্বিত দেখিয়া, তাঁহার অর্চ্চনা করা প্রয়োজন। এ মত যে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত, উপরে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। এ তো গেল সমষ্টিতে গ্রহণ। এক একটি অবতারে ভগবানের প্রতি ভক্তিও শাণ্ডিল্যের অভিমত। যে সকলেতে ভগবানের প্রাদুর্ভাব আছে, তাহাতে ভক্তি করিবে, কেন না গীতায় লিখিত আছে, "যে যে ভক্ত আমার যে যে তনু (মূর্ত্তি) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগকে সেই তনুসম্পর্কীয় অচলা শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকি (গীতা ৭।২১ ")+। শাণ্ডিল্যমতে বিভূতিগণেতে ভক্তিসমর্পণ করিলে ঈশ্বরে ভক্তি করা হয় না, কেন না বিভূতিগুলি সামান্যপ্রাণি-ভিন্ন আর কিছুই নহে ‡। বিভূতিসকলেতে কেন ঈশ্বরদৃষ্টি করা হইবে,

* ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ। ৮৫।

† তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষ্বপি সা। ৪৯।

‡ প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু। ৫০। বিভূতিগুলি প্রাণিভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা বলিয়া শাণ্ডিল্য ভূতগণসহ ঈশ্বরের নিরতিশয় ভেদপ্রদর্শন করিয়াছেন ; ইহা দ্বৈতবাদের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। বেদান্ত ভেদদর্শনের একেবারে অনুকূল নহে, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে মনঃপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শনানুমোদন করিয়া, বেদান্ত যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের উপায়োদ্ভাবন করিয়াছেন, তৎসহ শাণ্ডিল্যের বিরোধ উপস্থিত। অমাত্য কখন রাজা নহেন, কিন্তু, তথাপি তাঁহাতে রাজাকে দর্শন করিতে পারা যায়। বেদান্তবাদিগণের এ যুক্তি শাণ্ডিল্য যদি বিভূতিসম্বন্ধে নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকিত না।

না, তাহাদিগকে শুদ্ধ প্রাণী বলিয়া কেন গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কারণ শাণ্ডিল্য এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বিভূতিনিচয়মধ্যে রাজা ও দ্যূত উল্লিখিত আছে, অথচ রাজসেবা ও দ্যূতসেবা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ *। যদি এ দুইয়েতে ঈশ্বরদৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রে কখন এ উভয়ের সেবা নিষেধ করিত না। রাজসেবা করিতে গিয়া চিত্ত বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, ঈশ্বর হইতে মন অপহৃত হয়, এজন্য রাজাকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখন অর্চ্চনা করিতে পারা যায় না, এ এক কথা, আর তাঁহাতে ঈশ্বরের শ্রীসম্পত্তেজ দর্শন করা, এ অন্য কথা। অর্জ্জুন ঈশ্বরচিন্তার সাহায্যের জন্য বিভূতিগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই উদ্দেশ্যে প্রধান বিভূতিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য একেবারে বিভূতিগুলিকে উড়াইয়া দিয়া, ঠিক যে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসরণ করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি সমষ্টিতে সমুদায় জগৎ গ্রহণ করিয়া, উহাকে অর্চ্চনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এক এক জন বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বরদৃষ্টিতে অর্চ্চনা করিতেও বিধি দিয়াছেন, তখন ব্যষ্টিমধ্যে যদি একেবারে ঈশ্বরদর্শন না হয়, সমষ্টিমধ্যে কি প্রকারে ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে, এ কথা তিনি ভাবেন নাই, আশ্চর্য্য। যেখানে মহত্ত্বগৌরববলবীর্য্যজ্ঞানাদি প্রকাশ পায়, সেখানে মন যদি ঈশ্বরকে সেই সকলের মধ্যে দেখিতে না পায় তাহা হইলে ভক্তি কখন পরিপুষ্ট হইতে পারে না। কারণ ভক্তি, ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও শ্রীসৌন্দর্য্যাদি আছে, ইহা স্বীকার করে না। যেখানেই ঐ সকল আছে, সেখানেই সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়, তাহার প্রিয়তম ঐ ঐ স্বরূপে আবির্ভূত। এই প্রকারে সমুদায় জগতের সৌন্দর্য্যাদি তাহাকে তাহার অনুরাগের বস্তু ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে, কিছুতেই এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে দেয় না। সেই সেই বস্তু যদি ভক্তের চিত্তকে গ্রস্ত করিয়া আর অগ্রসর হইতে না দেয়, তাহা হইলে চিত্ত ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হয়, শাণ্ডিল্য ইহা দেখিয়াই, বিভূতিগুলিতে ভক্তি বারণ করিয়াছেন। তিনি বিষয়টির এক দিক্ দেখিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই, তাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্যক্ ঐক্য হয় নাই। কোন একটি বিভূতিতে চিত্ত আবদ্ধ না থাকে, এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অল্প সাবধান

* দ্যূতরাজসেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ। ৫১।

ছিলেন না। এই সাবধানতাবশতই তিনি সর্ব্বশেষে বলিয়াছিলেন, "অথবা তোমার এ সকল বহু বিষয় জানিবার কি প্রয়োজন, আমিই একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি (গীতা ১০।৪২)।" যিনি ব্যাপিত্বভিন্ন ঈশ্বরচিন্তার অনুমোদন করেন নাই, তিনি যে একটী বিভূতিতে চিত্তস্থাপন করিয়া, অন্যত্র হইতে উহাকে বিরত করিতে উপদেশ দিবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর? "একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি", এ কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শাণ্ডিল্যনির্দ্দিষ্ট ভজনায় যে কেবল স্থূলদর্শিগণের চিত্তবিমোহনমাত্র, ইহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন *।

অবতারবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অবতারবাদকে সুদৃঢ় করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহার জন্ম নাই, তাঁহার জন্ম হইল, এ দোষের বা কি প্রকারে তিনি অপনয়ন করিয়াছেন, দেখা সমুচিত। তিনি বলিতেছেন, "আমি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও, আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি [গীতা ৪।৬]।" এখানে জন্মরহিত হইয়াও জন্ম, এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। যদি বলা যায় যে, তিনি জন্মিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার আপনার স্বরূপবিচ্যুত হইলেন না; অপরে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তিনি আত্মমায়াকে আত্মবশে রাখিয়া জন্মেন, ইহাতেও জন্মজন্য দোষ অপনীত হয় না। বিশেষতঃ তিনি ইহার পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত এ কথার বিরোধ সমুপস্থিত হয়। "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে। আমি অব্যয় ও অনুত্তম, এই পরম ভাব না জানাতেই, এরূপ করিয়া থাকে [গীতা ৭।২৪]।" আবার বলিতেছেন "আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পাইয়া, মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে [গীতা ৯।১১]।" যদি মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করা হইল, তবে কি আর অব্যক্ত ঈশ্বর ব্যক্ত হইলেন না? যদি ব্যক্ত মূর্ত্তিই ধারণ করিলেন, তবে আর এ কথা বলা কেন, "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।" এ সকল বিসংবাদপূর্ণ কথার মীমাংসা স্বয়ং

* "—বিরাড়্বিগ্রহং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।"

ভাগবত ১০ স্ক ৪৩ অ. ১৪ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছেন। "মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে" একথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন, "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগদ্‌ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি [গীতা ৯।৪]।" কি ভাবে ? নির্লিপ্ত ভাবে। যদি সর্ব্বত্র অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত, তবে মনুষ্যেতেও সেই ভাবে ব্যাপ্ত। যদি কোন ব্যক্তিতে তাঁহার বিশেষ কোন স্বরূপ অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়, তবে তিনি কোথাও হইতে আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্ব হইতে তিনি সেখানেই ছিলেন। তবে যে জন্মাদি বলা, সে কেবল অধিষ্ঠানভূমির শুদ্ধসত্ত্বত্ব, ঈশ্বরাবির্ভাবাভিব্যক্তির জন্য উপযোগিত্ব তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া। অব্যক্তরূপে ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন; তিনি যেন ছিলেন না, সম্প্রতি ব্যক্ত হইলেন, এইরূপ লোকে মনে করে বলিয়া, তিনি বলিয়াছেন, "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।" তিনি পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন; অবতরণ কেবল আধারবিশেষে প্রস্ফুটরূপে জনচক্ষুর্গোচর হওয়া মাত্র। মহাত্মা চৈতন্যের অনুগামিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসাই করিয়াছেন *। তনু, রূপ বা কলেবরাদি শব্দ ঈশ্বরের অভিব্যক্তিসম্বন্ধে যে ব্যবহৃত হয়, কেবল ভূভারহরণ-দেবাদিপ্রতিপালনাভিলাষব্যঞ্জক ভাবাশ্রয় করিয়া উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকারগণ ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন †। বলিতে হইবে, তাঁহারা এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করিয়াছেন।

---

* "জীববজ্জন্মাভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতো জন্ম উচ্যতে। তথাচ শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃততন্ত্রভাগবতবচনম্ 'অহেয়মনুপাদেয়ং যদ্রূপং নিত্যমব্যয়ম্। স এবাপেক্ষরূপস্য ব্যক্তিমেব জনার্দ্দনঃ। অগৃহ্লাদ্যাস্বজস্বেতি কৃষ্ণরামাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া ॥' ইত্যাদি।" —শ্রীমৎসনাতনগোস্বামী। (১০স্ক, ২অ, ১৩ শ্লোক)

(মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যসন্নিহিতো হরিঃ—ভা, ১০ স্ক, ১ অ, ১৯ শ্লো) নিত্যসন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান এবাবির্ভূয় প্রপঞ্চগোচরীভবতি ন তু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতম্।"—শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

† তদনুরূপকলেবরশব্দৈরত্র শ্রীভগবতো ভূভারজিহীর্ষালক্ষণো দেবাদিপিপালয়িষালক্ষণশ্চ ভাব এবোচ্যতে। যথা তৃতীয়ে বিংশতিতমে তচ্ছব্দৈর্ব্রহ্মণো ভাব এবোক্তঃ। যদি তত্রৈব তথা ব্যাখ্যেয়ং তদা সুতরামেব শ্রীভগবতীতি।—কৃষ্ণসন্দর্ভঃ।

(বিমুক্তাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ"—ভা, ৩ স্ক, ২০ অ, ২৮ শ্লো) ব্রহ্মা তাং তনুং

অবতারগণেতে ভক্তিনিয়োগ করিলেই ঈশ্বরেতে ভক্তি সিদ্ধ হয়, শাণ্ডিল্য এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বিভূতিমধ্যে উল্লেখ করাতে, শাণ্ডিল্য একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাসুদেবকে বিভূতিমধ্যে গণ্য করা সমুচিত নয়। কেন না আকারমাত্রে * তিনি বাসুদেব ছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ পরব্রহ্ম, কেন না শাস্ত্রে তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন †। তবে যে তিনি আপনাকে বিভূতিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, সে কেবল বৃষ্ণিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতাপ্রদর্শনজন্য ‡। অন্যান্য অবতারসম্বন্ধেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে §। শাণ্ডিল্যের এই মতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিল আছে কি না, দেখা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম সহ অভিন্নভাবে স্থিতি করিয়া, 'আমায় ভজনা কর' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইহা যে উপদেষ্টৃমাত্রের ব্যবহার, যিনি প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে বিভূতিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া, কি ইহাই প্রদর্শন করেন নাই যে, অন্যান্য পদার্থে ও জীবে যে প্রকার শক্তিজ্ঞানাদিতে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাঁহাতেও তাহাই। তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্যাপী জ্ঞান ভিন্ন একটি আধারে ব্রহ্মকে আবদ্ধ রাখা কথন অনুমোদন করেন নাই। তিনি আত্মভাবে বা ব্রহ্ম সহ অভিন্নভাবে কোথাও আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, এক ব্যাপিত্বভাব আশ্রয় করিয়া বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদায় দেখে, তাহার নিকটে আমি অদর্শন হই না (গীতা ৬।৩০)।" "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে, আমি অব্যয় ও অনুত্তম, এই পরম ভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে;" "আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরমভাব জানিতে না পাইয়া, মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, মূঢ়েরা আমায় অবজ্ঞা করে;" এই দুই স্থলে যে পরম ভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এ পরম ভাব কি? 'অব্যয়ত্ব' 'অনুপমত্ব'

বিমুমোচ—সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাবপরিত্যাগো বিবক্ষিতঃ, গ্রহণঞ্চ তত্তদ্ভাবাপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্—স্বামী।

* বাসুদেবেঽপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ। ৫২।

† প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ। ৫৩।

‡ বৃষ্ণিষু শ্রৈষ্ঠ্যেন তৎ। ৫৪।

§ এবং প্রসিদ্ধেষু চ। ৫৫।

'ভূতগণের অধীশ্বরত্ব'। এতদপেক্ষাও আরও স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদায় ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি ভূতগণে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছেন না, এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর (গীতা ৯।৪—৫)।" ইহার দ্বারা এই বলা হইল, আমায় ব্যাপকরূপে সর্ব্বত্র দর্শন কর, কিন্তু দেহাদি কিছুরই সঙ্গে আমায় এক করিও না, তদতীত অব্যক্তমূর্ত্তিতে আমায় অবলোকন কর। তবে সম্মুখে যে তিনি বাসুদেব হইয়া অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে তিনি কি বলিতেছেন? "সমুদায় বাসুদেব, এরূপ (জ্ঞানযুক্ত) মহাত্মা সুদুর্ল্লভ (গীতা ৭।১৯)।" ইহার মর্ম্ম এই, যদি বাসুদেব বলিয়া জানিতে চাও, সমুদায় বিশ্বব্যাপী বলিয়া জান *। শ্রীকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত পুরাণকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পরাশর-প্রভৃতি এই জন্যই কলা, অংশ, অংশাংশ বা কেশমাত্রাদি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, কোন অবতারের উল্লেখ করেন নাই †।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত এই সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মতে সমুদায় বিশ্ব শ্রীহরির শরীর,

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১স্ক, ২অ, ৩৯ শ্লোক।

এই বিশ্বরূপ সমগ্র শরীরে ভগবান্‌কে দর্শন করা অভিপ্রেত, কোন একটি অংশে নয়, এজন্য পিতা বসুদেব যখন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি একা তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া, ব্যাপকরূপে সমুদায় জগতে এক হইয়া বহুতে অবস্থিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন,

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্॥
আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি॥"

ভাগবত ১০ স্ক, ৮৫ অ, ২১—২২ শ্লোক।

† কলা, অংশ, অংশাংশ, কেশ প্রভৃতি শব্দ বিনা কোথাও কোন অবতারের কথা পুরাণে লিখিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও এ নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। "এতে

ভক্তি

যাঁহারা বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাই-

চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (১স্ক, ৩অ, ২৮ শ্লোক) ভাগবতের এই বাক্যের উপরে সমধিক ভর দিয়া গোস্বামিগণ, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যেখানে কলা অংশাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অর্থান্তর ঘটাইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কোথাও সমাসের আশ্রয় গ্রহণ, কোথাও সহ শব্দ উহ্য করিয়া তাঁহারা স্বসিদ্ধান্তস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বচনপ্রমাণে কেশশব্দে কিরণ বা শক্তি নিষ্পন্ন করিয়া, কেশের কেশত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এই পক্ষস্থাপনের সবিশেষ যত্ন হইয়াছে। অনেক করিয়াও এ যত্ন সিদ্ধ হয় নাই। কেন হয় নাই, একটি দৃষ্টান্ত তুলিলেই যথেষ্ট হইবে। "অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি" এখানে অর্থ করা হইয়াছে, "অংশেন সর্ব্বাংশেন সহৈবেত্যর্থঃ" সমুদায় অংশ সহকারে আসিয়া তাঁহারা বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে 'সহ' শব্দ উহ্য করা হইয়াছে, ইহাতে ক্ষতি নাই। তৎপর "তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥" এ স্থলে 'আগত' শব্দটিকে বিশেষণ না করিয়া, ক্রিয়াস্থলে গ্রহণ করত, 'কৃষ্ণৌ' শব্দটিকে উহার কর্ম্মপদ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ নিষ্পন্ন হইল যে, নর ও নারায়ণরূপ অংশ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া ব্যাকরণে দোষ পড়িল না বটে, কিন্তু মহাভারতের সুস্পষ্ট বাক্যের সঙ্গে ইহার বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। "পিতামহনিয়োগাদ্ধি যো যোগাৎ গামধারয়ৎ। যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ। তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্ম্মণোঽন্তে বিবেশ হ॥" (স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ৫ অ, ২৩ শ্লোক) এখানে তাঁহার (নারায়ণের) অংশ স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে অংশশব্দ তৃতীয়ান্ত নাই যে, সহ শব্দ উহ্য করিয়া অর্থান্তর ঘটান যাইবে। সুতরাং নারায়ণের অংশ বাসুদেব কর্ম্মান্তে তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন, এ অর্থ না করিয়া আর চারা নাই। যদি এরূপ হইল, তবে নারায়ণের অংশ কৃষ্ণই আসিয়া অন্তে নারায়ণে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। যদি বলা হয়, কেবল প্রবেশ করিলেন, এইরূপ লিখিত আছে, 'তাঁহাতে' এ শব্দ তো নাই। 'তাঁহাতে' প্রকরণবশাৎ এ শব্দ লাভ হইতেছে, কারণ কে কাহাতে প্রবেশ করিলেন, তাহা প্রদর্শনার্থ এই প্রকরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এ স্থলে ঠিক অর্থ কি, বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়; যাঁহারা এস্থলে অপরে কি অর্থ করিয়াছেন, দেখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ৬৭ সর্গের ৩১ শ্লোকের রামানুজীয় টীকা দেখিবেন। যথার্থ কথা এই, আবেশ বা অংশেতেও পূর্ণতাদৃষ্টিতে "স্বয়ং" শব্দ ব্যবহৃত হয়। রাজ্ঞ্য পরঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু বলিয়াছেন, "তচ্ছরীরেঽহমংশেন স্বয়মেবাবতীর্য্য তানশেষানসুরান্নিহনিষ্যামি" (বিষ্ণুপুরাণ ৪অং, ২অ, ৯শ্লো) এখানে "স্বয়ং" শব্দও আছে, "অংশেন" শব্দও আছে; বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে "অংশেন" শব্দে, সমুদায় অংশ সহকারে। কার্য্যকালে

য়াছেন, বেদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদে * উহা কোথাও পাওয়া যায় না; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্ব্বশেষের শ্লোকটিতে (৬।২৩) ভক্তিশব্দ আছে, কিন্তু এই উপনিষৎখানি সাংখ্য-ও-যোগ-দর্শনের পরে নিবদ্ধ; সুতরাং এ উপনিষৎ যে শ্রীকৃষ্ণের পরে নহে, তাহার প্রমাণ কি †? এই ভক্তিপথ নূতন বলিয়া উদ্ধবের মনে সংশয় উৎপন্ন হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন, এই পথ অনাদিকালসিদ্ধ, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি উহার পুনরুদ্ধার করিলেন মাত্র। আমরা আরম্ভে (২১১পৃষ্ঠের) টিপ্পনীতে দেখিয়াছি, বেদে লুক্কায়িতভাবে ভক্তি-পথ ছিল। বেদ সহ বেদান্তের সমন্বয় করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত ভক্তিকে একটি পথে পরিণত করিলেন, ইহাই তাঁহার মহত্ব। ভক্তি যে আবহমান কাল ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যবশতঃ লোকে

দেখিতে পাওয়া যায়, পরঞ্জয়ে বলাবিভাবমাত্র হইয়াছিল (অচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতঃ)। ভাগবতের ৮ম স্কন্ধে যে স্থলে বামনাবতারের বিষয় বর্ণিত আছে, সেখানে ভগবদবতরণের যথার্থ তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বিবৃত রহিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সন্তানগণের সম্বন্ধে পিতৃমাতৃগুণপ্রাপ্তি যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের হিতকামনায় ব্রতাচরণ করেন। এই ব্রতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, "ত্বয়ার্চ্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ। স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্ গোপ্তাহস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ॥" (১৭ অ, ১৩ শ্লোক) এখানে দেখা যাইতেছে, কশ্যপের তপস্যাশ্রয় করিয়া নিজাংশে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ভগবান্ ইহাই বলিতেছেন। এই পর্য্যন্ত নহে, "উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্। মাঞ্চ ভাবয়তী পত্যাবেবং রূপমবস্থিতম্ (১৪ শ্লোক)॥" পতিতে ভগবদ্দর্শন, ইহাও ভগবদংশাব-তরণের একটি হেতু। জনকও আপনাতে ভগবদাবির্ভাব অনুভব করিবেন, ইহা দ্বিতীয় অবতরণের কারণ—"প্রবিষ্টমাত্মনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ (অবুধ্যত)। সোহদিত্যাং বীর্য্যমাধত্ত তপসা চিরসম্ভৃতম্। সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথাহনিলঃ (১৭।১৮ শ্লোক)॥" শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে বসুদেবের চিত্তে অংশভাগে ভগবানের প্রবেশ এবং সেই অংশ আহিত হইয়া দেবকীর উহা ধারণ, এ কথার প্রকৃত অর্থ কি, অষ্টম স্কন্ধের এই অংশ সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। ঈশা প্রভৃতির জন্মের যে অলৌকিকত্ব বর্ণন, তাহাও এতন্মূলক।

* তাপনী বলিয়া প্রসিদ্ধ উপনিষৎগুলিতে ভক্তি শব্দ আছে, সেগুলি সুস্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পরে লিখিত।

† ছান্দোগ্য উপনিষৎ ভাষা প্রভৃতিতে অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু এখানি যে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পরে না হউক, অন্ততঃ সমসাময়িক, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এ বিষয় পরে বিবেচ্য।

অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখনই ভক্তি ছিল। কিন্তু তখন উহা অস্ফুট ছিল, * শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ব্যক্ত করিয়া নূতন পথের আবিষ্কর্ত্তা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চারি প্রকার ভক্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থপ্রার্থী, এবং জ্ঞানী। শাণ্ডিল্য পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটিকে গৌণ ভক্তি এবং শেষটিকে মুখ্য ভক্তি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন †। ভয়জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া অথবা জ্ঞানার্থ ঈশ্বরের ভজনা করা, অথবা ইহপরলোকে ঈশ্বরভিন্ন অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা-বশতঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হওয়া, এ যে মুখ্য ভক্তি নয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই বলিয়াছেন, "তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ নিত্যযোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ (গীতা ৭।১৭)।" তবে অন্য তিন ব্যক্তিকেও যে তিনি 'সুকৃতী' ও 'উদার' বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাহাদিগের যখন অন্য দিকে গতি না হইয়া, যে কোন প্রকারে হউক, ঈশ্বরের দিকে মতি ফিরিয়াছে, তখন তাহাদিগের সদ্গতি হইবার উপায় হইয়াছে। তাহারা ভজনা করিতে করিতে যখন তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে, তখন আর তাহাদিগের তাঁহাকে ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকিবে না। এই জন্য দুরাচার ব্যক্তি যদি ভগবদ্ভজনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে কৃষ্ণ অনুরোধ করিয়াছেন; কেন না সে এই উপায়ে "শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, নিত্য শান্তি লাভ করে (গীতা ৯।৩১)।" ঈশ্বরের ভজনা করিলে, তাহার কখন বিনাশ হয় না, এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সুদৃঢ় বিশ্বাসী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই ভক্তি কি? ভক্তিশাস্ত্রের অর্থ ভজনা, এই ভজনা ভাবসমন্বিত হওয়া চাই। "আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতেরা ইহা জানিয়া, ভাবযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করে (গীতা ১০।৮)।" এই ভাবযুক্ততা

---

* "দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

ভাগবত, ৩ স্ক, ২৫ অ, ২৯—৩০ শ্লোক।

এস্থলে ভক্তিকে মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ঠিক কথা। ভক্তি মানসবৃত্তিরূপে মনুষ্যে চিরকালই ছিল, আবিষ্কার কেবল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক।

† গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্। ৭২।

গাঢ় অনুরাগ, কেন না তৎপরেই কথিত হইয়াছে, "আমাতে তাহাদিগের চিত্ত, আমাতে তাহাদিগের প্রাণ প্রবিষ্ট ; তাহারা পরস্পর আমার বিষয় বুঝায়, আমার কথা কীর্ত্তন করে, প্রতিদিন এইরূপ করিয়া পরিতুষ্ট হয়, আমোদিত হয় (গীতা ১০।৯)।" কেবল ঈশ্বরকে লইয়া সময়যাপন, তাঁহাতেই আমোদ, ইহা ঈশ্বরেতে পরমানুরাগ ভিন্ন আর কি ? শাণ্ডিল্য এই জন্যই ভক্তিকে ঈশ্বরানুরাগ * বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেখানে অনুরাগ নাই, বরং বিদ্বেষ আছে, সেখানে ভক্তি-শব্দের + কোন কালে ব্যবহার হয় না। তবে দ্বেষ করিতে গিয়া, চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিয়া যায়, সে অন্য কথা। বিদ্বেষপরায়ণগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামান্য নয়। "ইহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক, [সজ্জনগণের] দোষদর্শনকরত আত্মপরদেহে আমাকেই দ্বেষ করে। এই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমদিগকে সংসারে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি (গীতা ১৬।১৮—১৯)।"

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ অথবা ইহা কোন উপায়ে সমুৎপন্ন হয়, ভক্তিশাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্‌কে সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিতে পাইলেই, তাঁহাকে ভজনা করিতে প্রবৃত্তি হয়। এই ভজনপ্রবৃত্তিই ভক্তি। "যে ব্যক্তি বিমূঢ়মতি না হইয়া, আমায় এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সর্ব্ববিধজ্ঞানলাভ করিয়া, সমগ্রভাবে আমারই ভজনা করিয়া থাকে (গীতা ১৫।১৯)।" শ্রীকৃষ্ণের মতে এই ভক্তি সামান্য নয়, কেন না ভক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব সহজে সাধকের হৃদয়ঙ্গম হয়। "ভক্তি দ্বারা আমি যা, যে পরিমাণ, তত্ত্বতঃ জানিতে পারে ; তৎপর‡ তত্ত্বতঃ আমায় জানিয়া, জ্ঞানানন্তর আমাতে প্রবেশ করে (গীতা ১৮।৫৫)।" শাণ্ডিল্য জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়, ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বা জ্ঞানসাপেক্ষ বা ক্রিয়াসাধ্য, এই সকল বিচার উত্থাপন করিয়া, জ্ঞান ও কর্ম্মকে অধঃকরণ করিয়া, ভক্তিকে

* সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। ২।

+ দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ। ৬।

‡ মূলস্থ 'ততঃ' এই শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র 'তৎপর' দেখিতে পাওয়া যায়। এক রামানুজ-ভাষ্যে 'ততঃ' এই সর্ব্বনাম দ্বারা ভক্তিশব্দ এস্থলে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ দাঁড়ায়, "ভক্তি দ্বারা আমি যা, যে পরিমাণ, তত্ত্বতঃ জানিতে পারে। তত্ত্বতঃ আমায় জানিয়া, জ্ঞানানন্তর ভক্তিতে আমাতে প্রবেশ করে।"

সর্ব্বোপরি স্থানদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এ তিনকে এমনই পরস্পরের অন্তরঙ্গ করিয়াছেন যে, ঠিক তাঁহার মতে চলিলে, এ তিনের কোন একটিকেই লঘু করিবার উপায় নাই। "বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধারণাযোগে আপনাকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদিবিষয়পরিত্যাগ, অনুরাগ-ও-দ্বেষপরিহার, শুচি দেশে অবস্থান, লঘু আহার ভোজন এবং কায়, মন ও বাক্য সংযমপূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয়করত, নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ হইবে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগকরত, শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া, ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া যায়। ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়, শোক করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না, সমুদায় ভূতেতে সমত্ব উপস্থিত হইয়া, আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করে (গীতা ১৮। ৫১—৫৪)।" তৎপর যখন ভক্তি লাভ হইল, তখন সেই ভক্তিতে ভগবান্‌কে বিশেষরূপে অবগত হইয়া, ভক্ত তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। এখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান, যোগাদির অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্ম, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়সংযমাদি সকলই আছে। এ সকল না হইলে, ভগবানের প্রতি স্থিরা ভক্তি হওয়া সুদূরপরাহত। যদি হয়, সে ভক্ত্যাভ্যাস, যথার্থ ভক্তি নহে *।

"ভক্তি দ্বারা * * আমায় জানিয়া, জ্ঞানানন্তর আমায় প্রবেশ করে" এই কথায় বা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য হয়, শাণ্ডিল্য এই ভয়ে বিচার উত্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে ব্যক্তিতে ভক্তি উপস্থিত, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান অগ্রে হইয়াছিল বলিয়াই ভক্তি সমুপস্থিত। এখন যে 'জ্ঞানানন্তর ঈশ্বরে প্রবেশ করে' এ কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, জ্ঞান সুদৃঢ় হইয়া ভক্তি সুদৃঢ় হয়, ভক্তি সুদৃঢ় হইয়া ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে †। বস্তুতঃ কথা এই, জ্ঞান ভক্তির পোষক, আবার ভক্তি জ্ঞানের পোষক। ইহা কে না জানেন যে, ঈশ্বরকে যত জানা যায়, তত তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়ে; আবার যত ভক্তি বাড়ে, তত তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞান পূর্ব্বে গূঢ় ছিল, তাহা প্রকাশ

---

* "ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং শ্রবণং তথা॥" প্রীতিসন্দর্ভধৃত।

† ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ। ১৫।
প্রাগুক্তঞ্চ। ১৬।

পায়। শ্রীকৃষ্ণ এইটি প্রদর্শনজন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে দার্শনিক বিচারের বিষয় করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য * শ্রবণ করিয়া, শাণ্ডিল্য যে জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগকে লঘু করিয়া, ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চসিংহাসন দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃষ্ণের একীভূত করিবার ভাব হৃদয়ঙ্গম না করা হইতে সমুপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তপস্বিগণ হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের ও কর্ম্মীদিগের হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব, অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। সমুদায় যোগিমধ্যে যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করে, সেই আমার মতে যোগযুক্তগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৬—৪৭)।" ইঁহার এই কথার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, এইটি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সাধকগণের সমুদায় সাধন ও অনুষ্ঠান কি জন্য, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া, এই অংশ তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ-ভিন্ন, তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম এ সকলের আর কিছুই উদ্দেশ্য নাই। যদি সেই যোগই না হইল, তাহা হইলে এ সমুদায় নিষ্ফল। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠতা তিনি অর্জ্জুনহৃদয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু অনুরাগবিহীন যোগী অতিকৃপা-পাত্র। তাঁহার সময়ে ঈদৃশ যোগী অনেক ছিল, তাই তিনি তাদৃক্ যোগিগণকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়া, অনুরাগযুক্ত যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা কেবল এই প্রতীত হইতেছে যে, তপস্যা, কর্ম্ম ও জ্ঞানে যোগী হইয়া যেন সাধক ঈশ্বরানুরক্ত হয়েন। যখন সাধক ঈশ্বরানুরক্ত যোগী হইলেন, তখন তাঁহার তপস্যা কর্ম্ম জ্ঞান বাড়িল বৈ কমিল না। অনুরাগী যেমন অনুরাগের পাত্রের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে, সে যেমন অনুজ্ঞাপালক, মর্ম্মজ্ঞ এবং স্বরূপজ্ঞ হয়, এমন আর কে হইয়া থাকে? শাণ্ডিল্য অর্জ্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তর হইতে † আপনার মতপরিপোষণ করিতে যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির একত্র সন্নিবেশব্যতীত তাহার বিপরীত কিছুই হয় নাই। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতত সমাহিত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমায় এইরূপে এবং যাঁহারা তোমায় অব্যক্ত অক্ষররূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যোগবিত্তম কাহারা (গীতা ১২।১)?" এখানে কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির

* তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ। ২২।

† প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ। ২৩।

প্রাধান্য বা অপ্রাধান্যের বিষয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন উপাস্যবিষয়ে। সমুদায় বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের পরম অদ্ভুত রূপ, এবং কূটস্থ নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টির উপাসনায় যোগিশ্রেষ্ঠতা উপস্থিত হয়? শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিলেন, "যাহারা মন আমাতে নিবিষ্ট করিয়া, নিত্য সমাহিত এবং পরমশ্রদ্ধান্বিত হইয়া, আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ। অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বগত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নিত্য অক্ষরকে যাহারা ইন্দ্রিয়নিচয়সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে উপাসনা করে, এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত হয়, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (গীতা ১২।২—৪)।" আচ্ছা, যদি উভয়েই ঈশ্বরলাভ করিলেন, তবে এক জনকে যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া, অপরকে কেবল আমায় পায়, এইমাত্র কেন তিনি বলিলেন? কেন বলিলেন, ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। দুই ব্যক্তিই ঈশ্বরকে পাইলেন বটে, কিন্তু এক জন তাঁহাকে লীলাকারিরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাতে মুগ্ধ হইলেন, আর এক জন কূটস্থ অর্থাৎ আপনাতে আপনি অবস্থিত উদাসীন ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন, স্থাণুবৎ অচল হইলেন, কোন প্রকার ভাবাবেশে প্রমত্ত হইলেন না। এ অবস্থা সাধকের পক্ষে সম্ভোগের নহে, এ এক প্রকার আত্মসম্বন্ধে চৈতন্যবিরহিতত্বের অবস্থা। তাই যিনি দেখিলেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, ভাবাবিষ্ট হইলেন, তিনি যোগিবত্তম বলিয়া পরিগণিত হইলেন; কেন না যোগের যাহা যথার্থ উদ্দেশ্য, তিনি তাহা লাভ করিলেন। এ কথা বলিয়া, ভক্তিকে যোগাদি হইতে বাড়ান হইল, মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক কথা এই, ইহাতে বাড়ানও হয় নাই, কমানও হয় নাই, যোগ ও ভক্তিকে একত্র সম্মিলিত করা হইয়াছে, তাহা না হইলে 'যোগিশ্রেষ্ঠ', এ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। "একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ নিত্যযোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশেষ (গীতা ৭।১৭)" এই কথা বলিয়া, যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠভক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, তখনই শাণ্ডিল্যের বোঝা উচিত ছিল যে, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ তিনকেই সমভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। যোগ অর্থাৎ ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে স্থিতি করিয়া, নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান, কেন না "যোগ কর্ম্মে কৌশল (গীতা ২।৫০)।" যে অংশ লইয়া বিচার উপস্থিত, তাহার উপসংহারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ভক্তির সঙ্গে কর্ম্মের নিত্য যোগ সিদ্ধ হইতেছে। "যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক,

মৎপরায়ণ হইয়া, একান্ত যোগে আমার ধ্যান করত উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি (গীতা ১২।৬ —৭)।" এখানে ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক, ধ্যানযোগী হইয়া, ঈশ্বরনিবিষ্টচিত্তে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। কর্ম্মসমর্পণ—কর্ম্মত্যাগ অথবা ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা। "ব্রহ্মেতে সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, যে ব্যক্তি আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জলের সঙ্গে পদ্মপত্র যে প্রকার লগ্ন হয় না, সেই প্রকার সে পাপে লিপ্ত হয় না (গীতা ৫।১০)।" এ কথায় এই সিদ্ধ হইল যে, ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক, আসক্তিত্যাগকরতঃ, কর্ম্ম করাই কর্ম্ম না করা, এবং তাহাই যথার্থ কর্ম্মার্পণ। এরূপে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মজনিত যে অভিমান-দম্ভাদি পাপ হয়, তাহা সাধকেতে সম্ভবে না। আর যদিও বা বাহ্য অবান্তর কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা হইলেও যোগানুষ্ঠানরূপ কর্ম্ম পরিহৃত হইতেছে না। অপিচ উপাসনাও কর্ম্ম, শ্রবণকীর্ত্তনাদিও কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্ম ভক্তিতে অপরিহার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে, নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ হইতে পারে না, বলিয়াছেন, তাহা এই জন্যই। কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি এ তিনের সঙ্গে যে জ্ঞান অনুস্যূত, তাহা এ বিষয়ের বিচারের আরম্ভে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে *। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ সমুদায়ের সঙ্গে ঈশ্বরানুগ্রহ

* এস্থলে জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির যে একত্র স্থিতি শ্রীকৃষ্ণের মত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, আপাতদৃষ্টিতে ভাগবতের সহিত তাহার বিরোধ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে, এ বিরোধ কেবল দৃশ্যতঃ। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে চিত্তকাঠিন্য হয়, এজন্য সুকুমারস্বভাবা ভক্তির উহারা অঙ্গ হইতে পারে না;—

"জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎপ্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতূ প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥"

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ২ লহরী, ৪৮—৪৯ শ্লোক।

এই কথার প্রমাণস্বরূপ গোস্বামিপাদ ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"

ভাগবত, ১১ স্ক, ২০ অ, ৩১ শ্লোক।

: সংযুক্ত না হইলে যে কিছু হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রকারে তাহা সাধকহৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

এই শ্লোকটির পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিলে, এই প্রতীত হয় যে, এ স্থলে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিসঙ্কোচক বলিয়া নিবদ্ধ হইয়াছে, উহারা শুষ্ক জ্ঞান ও শুষ্ক বৈরাগ্য। মনুষ্য স্বভাবকর্তৃক পরিচালিত হইয়া, পরম্পরাগত কর্ম্ম ও বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে ; এই কর্ম্মে যখন কিছু কিছু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং ভোগের প্রতি আসক্তি কমিয়া আইসে, সেই সময়ে ভক্তিপথ আশ্রয়ণীয় ;—

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"

ভাগবত, ১১ স্ক, ২০ অ, ৮ শ্লোক।

সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে, ভক্তির আরম্ভের জন্য কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের প্রয়োজন, গোস্বামিপাদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তি যতই প্রবল হয়, ততই ঈশ্বরব্যতিরিক্ত বস্তুতে প্রবল বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়, এ কথাই বা তিনি কি প্রকারে অস্বীকার করিবেন ?

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাং সকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥"

ভাগবত, ১১ স্ক, ২০ অ, ২৯ শ্লোক।

এই জন্য গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,

"বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগো যত্র বিলীয়তে।"

এই তো গেল বৈরাগ্যের কথা। জ্ঞান যে ভক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সুস্পষ্ট অতিপূর্ব্বে নিবদ্ধ হইয়াছে।

"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অ, ৩৩ শ্লোক।

এখানে ভগবানের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানযোগে উহার গভীর হইতে গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়া, যে ব্যক্তি অনন্যমনে ভজনা করে, তাহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। গীতাতেও এই জন্য জ্ঞানী ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তবে যে জ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়াছে, উহা ভক্তিবিরোধী শুষ্ক জ্ঞান। কর্ম্ম ভক্তিতে নিষিদ্ধ, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কেন না ইহার পরেই ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া, সমুদায় কর্ম্ম ঈশ্বরে নিবেদন করিতে উপদেশ করা হইয়াছে।

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥"

ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অ, ৪০ শ্লোক।

ভজনীয়

ভগবান্‌কে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ভক্তি প্রবৃত্ত হয়, ইহা যদি সত্য হইল, তাহা হইলে দেখা সমুচিত, শ্রীকৃষ্ণ কীদৃশ ভজনীয় সাধকসন্নিধানে উপস্থিত করিয়াছেন। যিনি 'পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বামী, প্রভু, সাক্ষী, গতি, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, স্থিতিস্থান, প্রবেশস্থান, অবিনাশী কারণ' (গীতা ৯।১৭ -১৮), তিনিই শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট উপাস্য। সাধক যে সমুদায় বস্তু দিয়া ঈশ্বরযাজনা করেন, এমন কি স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু আছে, সকলেতেই তিনি অভিন্নভাবে অবস্থিত। শাস্ত্রসমুদায়েরও তাঁহা হইতে পৃথক্ স্থিতি নাই। জলবর্ষণাদি যাহা কিছু ক্রিয়া প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার মূলে তিনিই অবস্থিত। সংক্ষেপে কথা এই, যিনি ভক্ত সহ অতিমধুরসম্বন্ধে সর্ব্বদা বিবিধলীলানিরত, তিনিই ভক্তের ভজনীয় দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভজনীয় দেবতাকে অতিব্যাপী করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কখন ঈশ্বরকে কোথাও পুত্তলবৎ ক্ষুদ্র করিতে পারেন নাই, ইহা যদি দোষ হয়, তবে সে দোষ তাঁহার আছে।

শ্রীকৃষ্ণ যদিও উপাস্যকে ব্যাপকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি যখন অব্যক্ত কূটস্থ ব্রহ্মের উপাসনাপেক্ষা আবির্ভূত ব্রহ্মের উপাসনার সমধিক অনুমোদন করিয়াছেন, তখন তিনি যে ভক্তিযোগের উপাস্যকে ব্যাপক করিয়া, অনুরাগের ঘনত্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, ইহা কখনও মনে হয় না। ব্যাপক ব্রহ্মবস্তুতে অনুরাগ ঘনতম হয় না, ইহা অনেকের ভ্রম। কল্যাণগুণনিচয় যদি পরিমিত হয়, তবেই অনুরাগ খর্ব্ব হয়; ইহাই বাস্তবিক কথা। শ্রীকৃষ্ণ সেই অব্যক্ত অক্ষর পরব্রহ্মকেই পরমপুরুষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, ভক্তির ভজনীয় বলিয়া কখন তাঁহাকে ব্যাপিত্বে খর্ব্ব করেন নাই। অব্যক্ত অক্ষরকে পরমগতিরূপে

যোগের কথা তো বলা প্রয়োজনই করে না, কেন না কর্ম্মাদি সকলের সঙ্গে যোগ অভিন্নভাবে অবস্থিত। তাই শুষ্ক জ্ঞান, শুষ্ক বৈরাগ্যের নিষেধস্থলেও যোগের উল্লেখ আছে।

এক অনুরাগে স্বতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুসরণ হয়, ভক্তিসন্দর্ভে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে:—

"তর্হি বিষ্ণুসন্তোষপ্রয়োজনৌ এব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিভিঃ স্বতএব প্রবৃত্তী স্যাতাম্, তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ।"

নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তিতে লাভ করা যায়, যিনি সমুদায় ভূতের অন্তঃস্থ এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন (গীতা ৮।২২)।".. তবে যে তিনি বলিয়াছেন, "অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। যাহারা দেহধারী, তাহারা অব্যক্তবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ করিয়া থাকে (গীতা ১২।৫);" ইহা অব্যক্তসাধন দুঃখকর মনে করিয়া। বস্তুতঃ এরূপ বলা যে কেবল সাধন প্রণালীপ্রদর্শন ভিন্ন কিছু নহে, তাহা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যোগসাধনপ্রণালীতে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সে প্রণালী এই,—"বাহ্যচিন্তা-পরিহারপূর্ব্বক, অগ্রে দৃশ্যমান্ দিক্ চিন্তা করিয়া, পরে যে গৃহে অবস্থিত, সেই গৃহে মন স্থাপন করিবে। গৃহে মনঃস্থাপন করিবার পর, গৃহের যে অংশে অবস্থিত, তাহাতে মন স্থাপন করিবে। পরে নির্জ্জনবনে শরীরাভ্যন্তরে চিন্তা নিবিষ্ট করিবে। ক্রমে দন্ত, তালু, জিহ্বা, গলদেশ, গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধন চিন্তা করিবে *।" এখানে দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতে সর্ব্বাগ্রে মনঃস্থাপনের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে চিন্তার আরম্ভ দেহধারীর পক্ষে সহজ বলিয়া, যোগশাস্ত্রেও স্থূল ভূত হইতে সূক্ষ্মে গমন, তদনন্তর পরব্রহ্মে ধারণা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ চিন্তার প্রণালী সহজ বলিয়া, যদিও শ্রীকৃষ্ণ বাহ্য প্রণালীর পরিহার করেন নাই, তথাপি তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনয়ন করিয়া, একেবারে শরীর হইতে আত্মাকে ভিন্ন করিয়া, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন

---

* "যোগমেকান্তশীলস্তু যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।
দৃষ্টপূর্ব্বাং দিশং চিন্ত্য যস্মিন্ সন্নিবসেৎ পুরে।
পুরস্যাভ্যন্তরে তস্য মনঃ স্থাপ্যং ন বাহ্যতঃ।
পুরস্যাভ্যন্তরে তিষ্ঠন্ যস্মিন্নাবসথে বসেৎ॥
তস্মিন্নাবসথে ধার্য্যং সবাহ্যাভ্যন্তরে মনঃ।
প্রচিন্ত্যাবসথে কৃৎস্নং যস্মিন্ কালে স তিষ্ঠতি॥
তস্মিন্ কালে মনশ্চাস্য ন কথঞ্চন বাহ্যতঃ।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নির্ঘোষে নির্জ্জনে বনে॥
কায়মভ্যন্তরং কৃৎস্নমেকাগ্রঃ পরিচিন্তয়েৎ।
দন্তাংস্তালু চ জিহ্বাঞ্চ গলং গ্রীবাং তথৈব চ॥
হৃদয়ং চিন্তয়েচ্চাপি তথা হৃদয়বন্ধনম্॥"

অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ১৯ অ. ৩৩—৩৭ শ্লোক।

করিবার প্রণালীও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন *। তবে এখন জিজ্ঞাসা এই, বাহ্য জগতে ঈশ্বরকে দর্শন করিলে সেই ব্যক্তি যোগিশ্রেষ্ঠ, এরূপ কেন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। এরূপ বলিবার হেতু পূর্ব্বে যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ছাড়া ইহাও এক কারণ যে, যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করিতেন, তাঁহারা কখন আর তাঁহাকে জগতে দেখিতেন না। জগৎকে প্রকৃতিকৃত মিথ্যা বলিয়া তৎপ্রতি একেবারে উদাসীন হইতেন, উহাকে সর্ব্বথা তুচ্ছ করিতেন। ইহাতে ভগবানের লীলা-দর্শন ঘটিত না। ভগবানের লীলা না দেখিলে, কেবল ভক্তি হয় না, তা নহে, যোগীর যোগ অসম্পূর্ণ থাকে। যিনি বাহিরে ঈশ্বরদর্শন করিবেন, তিনি অন্তরে ঈশ্বরদর্শন করিবেনই, কেন না দর্শন আন্তরিক ব্যাপার। যিনি অন্তরে ব্রহ্মদর্শন করিলেন, তিনি বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিবেন, ইহা সকল সময়ে ঘটে না। ইহাতে যোগ অসম্পূর্ণ থাকে এবং অসম্পূর্ণযোগের অবস্থায় কখন তাদৃশ ব্যক্তিকে যোগিশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন আলম্বন জগৎকে ব্যাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি আত্মচিন্তায় আত্মাকে এবং অহম্‌রূপে ঈশ্বরচিন্তায় অহম্‌কে ব্যাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন †। এই ব্যাপকত্ব যে যত দুর স্পষ্টি, তত দুর নয়,

---

* "তপস্বী সততং যুক্তো যোগশাস্ত্রমথাচরেৎ।
মনীষী মনসা বিপ্র পশ্যন্নাত্মানমাত্মনি ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ১৯ অ, ১৮ শ্লোক।

কিরূপে দেখিবে, তাহাও বলিয়াছেন,—

"যথা হি পুরুষঃ স্বপ্নে দৃষ্ট্বা পশ্যত্যসাবিতি।
তথারূপমিবাত্মানং সাধু যুক্তঃ প্রপশ্যতি ॥
ইষীকাঞ্চ যথা মুঞ্জাৎ কশ্চিন্নিষ্কৃষ্য দর্শয়েৎ।
যোগী নিষ্কৃষ্য চাত্মানং তথা পশ্যতি দেহতঃ ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ১৯ অ, ২১—২২ শ্লোক।

উত্তরগীতায় আরও সুস্পষ্ট ধ্যাননিয়ম লিখিত আছে,—

"ঊর্দ্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ॥" (১অ, ৩৮ শ্লোক)

† উত্তরগীতায় লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা কিছু সালম্ব, তাহা অনিত্য, আবার যাহা নিরালম্ব, তাহা শূন্যমাত্র; এস্থলে যোগীরা কিরূপে ধ্যান করেন? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

তাহারও অতীত অনন্ত, তাহা "একাংশে সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এই কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে।

সমন্বয়

ভক্তিপথ আবিষ্কৃত হইয়া, বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ এ তিনের মত অতি সুন্দররূপে সমন্বিত হইয়াছে। বেদে যদিও ভক্তিশব্দের বিস্তৃত ব্যবহার নাই, তথাপি তদুক্ত সমুদায় অনুষ্ঠান ভক্তিপ্রণোদিত। এ ভক্তি অবশ্য উচ্চ ভক্তি নহে, নিকৃষ্ট ভক্তি; কেন না ইহার মধ্যে দুই শ্রেণীর ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, 'আর্ত্ত' এবং 'অর্থপ্রার্থী'। যদিও ভয়ে এবং অর্থাদির প্রার্থনায় বৈদিক সময়ে স্তোত্র, বন্দনা, এবং যাজনা হইয়াছে, তথাপি স্তোত্র সকল পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, স্তোত্রের বিষয়ীভূত দেবতা স্তোতার নিকটে পিতা, মাতা, সখা, সহায়, রক্ষক, নেতা, শাস্তা, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, স্রষ্টা, পরমশক্তি, সমুদায় পরিবর্ত্তনের মূলরূপে নিয়ত প্রকাশ পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির ভজনীয় যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ একতা আছে। বেদ ও পুরাণের ভজনীয়ের স্বরূপে একতা, এ কিছু সামান্য একতা নহে। যত প্রকার মতভেদ ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই সমুপস্থিত হয়। বাহ্য জগতের যখন যে অংশে বৈদিক ঋষিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, সেই স্থলে দেবাধিষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র দেবাধিষ্ঠান তাঁহারা দেখিতে পাইতেন না, কিংবা সে দিকে মনোনিবেশ করিতেন না, তাই ব্যাপিত্বের দিকে চিত্ত ধাবিত হইত না। বেদান্ত আসিয়া বৈদিক মতের অপূর্ণতা হরণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের ব্যাপিত্বভাব কি প্রকার সর্ব্বদা নয়নসম্মুখে রাখিতেন, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। বেদান্ত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া,* বেদের ইন্দ্রবরুণাদির স্থলে পরমাত্মা ও পরব্রহ্মকে স্থাপন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত হইতে ঈশ্বরকে তদ্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি, বৈদিক সময়ে ভক্তির যে নিম্নতর বিকাশ হইয়াছিল, সেই নিম্নতর বিকাশ হইতে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া, পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে পরমা ভক্তি অর্পণ করিয়াছেন। বেদের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণ হইয়া, তাঁহার

---

* "হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ম্।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী॥" (১অ, ৪০ শ্লোক)

এখানে অহমকে আলম্বন করিয়া, ব্যাপিত্বে দোষমোচন করা হইয়াছে।

সময়ের যোগিগণ চিন্মাত্র ব্রহ্মে চিত্তস্থাপনপূর্ব্বক, নিতান্ত শুষ্কভাবে কালযাপন করিতেন এবং তাহাই যোগনামে পরিগৃহীত হইত। তাঁহার সময়ের যোগশাস্ত্র এই জন্য যোগের সরস দিক্ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যোগমধ্যে ভক্তিরস সিঞ্চিত করিয়া উহাকে সরস করিয়াছেন, এবং তাদৃশ যোগই শ্রেষ্ঠ, তাহার ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া সকল প্রকারের কর্ম্মানুষ্ঠান করাতে, উহা দোষশূন্য এবং ঈশ্বরানুরাগবর্দ্ধক হইয়াছে। এক ভক্তিতে এই সকল সমন্বয়ের ব্যাপার দর্শন করিয়াই, শাণ্ডিল্য উহাকেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রদর্শিত পথরূপে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু এই পথের সঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ যে অভেদ্য সূত্রে মিলিতভাবে অবস্থিত, তাহা তাঁহার চক্ষে নিপতিত হয় নাই। কোন কোন স্থলে যোগ, কোন কোন স্থলে জ্ঞান, কোন কোন স্থলে এক ভক্তিতেই সমুদায় হয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আরগুলি না হইলেও হয়। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধক আপনার অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোন একটিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যথাসময় আরগুলি তাহার সঙ্গে আসিয়া সংযুক্ত হয়।

সাংখ্যমত

দোষনিরসন

শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে গ্রহণ করিয়া, সৃষ্টির তত্ত্ব নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সাংখ্য সৃষ্টিকে কখন মিথ্যা বলেন না, শ্রীকৃষ্ণও মিথ্যা বলেন না *। কিন্তু এই সাংখ্যের মত † শ্রীকৃষ্ণ অন্ধের ন্যায় গ্রহণ করেন নাই।

"ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৫অ, ৩৪ শ্লোক।

† সাংখ্যদর্শনের মত সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এই চতুর্বিংশতি প্রাকৃতিক তত্ত্ব। পুরুষকে লইয়া সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাংখ্যমতে সৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অসৎ হইতে নহে।

সাংখ্যমতের কোথায় দোষ আছে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন ; সুতরাং তিনি তাহার দোষপরিহার করিয়া, যতটুকু উহা হইতে গ্রহণীয়, তাহাই গ্রহণ

অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, বৌদ্ধগণের মত। যাহা আপনি নাই, তাহা কি প্রকারে, যাহা আছে, তাহার উৎপত্তির কারণ হইবে? সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি, যেমন পট ছিল না, তন্তুযোগে পট হইল, এই নৈয়ায়িক মতও সাংখ্যমতবাদিগণের মতে সিদ্ধ হয় না ; কেন না শশবিষাণবৎ যাহা পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না, তাহা কি প্রকারে সদ্বস্তুর কর্ত্তৃত্বে নিষ্পন্ন হইবে। সহস্র যত্নে নীল কি কখন পীত হয়? যাহা পূর্ব্বে গূঢ় ছিল—যেমন তিলে তৈল—তাহাই প্রকাশ পাইল, এই মাত্র হইতে পারে : যাহা একেবারে ছিল না, তাহা কি প্রকারে হইবে? সদ্ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত হইয়াছে, জগৎ বাস্তবিক অসৎ, এই বেদান্তবাদিগণের মতও সাংখ্য-মতে ঠিক নয় ; কারণ ব্রহ্ম শুদ্ধ চিদ্বস্তু, তাহাতে জড়ের আরোপ কি প্রকারে হইবে? চিৎ ও জড় এ দুইয়ের মধ্যে যখন স্বরূপগত সাদৃশ্য নাই, তখন আরোপ অসম্ভব।

যদি সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে সেই সৎ এমন ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া চাই, যাহাতে সকল কার্য্যের কারণত্ব তাহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। সুখ, দুঃখ, মোহ, এই তিনটি সর্ব্বত্র সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কোন বস্তুলাভে সুখ, অপচয়ে দুঃখ, অলাভে মোহ। সুখ সত্ত্বগুণের কার্য্য, দুঃখ রজোগুণের কার্য্য, মোহ তমোগুণের কার্য্য। মোহমধ্যে অচিন্ত্যতারূপ জড়ধর্ম্ম রহিয়াছে। এই সত্ত্ব, রজ, ও তম প্রকৃতির ধর্ম্ম, এই তিনের সমভাবে মিলনে প্রকৃতি, প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত, প্রধান। যখন কালবশতঃ সৃষ্টি হয়, তখন এই তিন গুণের তারতম্য উপস্থিত হইয়া, তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। 'ইটি এইরূপ' ঈদৃশ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, চিত্ত। মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতির বিকৃতি, আবার অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি। কেন না অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে সমুৎপন্ন হয়। "এটি আমার" 'এতদ্দ্বারা আমি কার্য্য করিব', অহঙ্কারের এই স্বরূপ। অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি হইয়াও, পঞ্চতন্মাত্রের এবং একাদশ ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতি। অহঙ্কারনিহিত অপ্রকাশাত্মক তমোগুণের বিকারে পঞ্চতন্মাত্র, এবং প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের বিকারে একাদশ ইন্দ্রিয়। ক্রিয়াকারিত্ব-বশতঃ রজোগুণ এ দুইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। পঞ্চতন্মাত্র যদিও অহঙ্কারতত্ত্বের বিকার, তথাপি উহারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের কারণ বলিয়া প্রকৃতি। এইরূপে একটি মূলপ্রকৃতি, আর সাতটি প্রকৃতিবিকৃতি, অর্থাৎ অন্যের উৎপত্তির কারণ হইয়া প্রকৃতি, অন্য হইতে উৎপন্ন হইয়া বিকৃতি। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত কোন বস্তুর মূল কারণ নয়, সুতরাং কেবল বিকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়ও সেইরূপ অন্যের কারণ নয় বলিয়া বিকৃতি. এইরূপে বিকৃতি ষোড়শসংখ্যক।

স্থূল জগৎ দর্শন করিয়া, মন কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমতঃ পৃথিব্যাদি পদার্থের

করিয়াছেন। তিনি যে দোষ পরিহার করিয়াছেন, হঠাৎ তাহা বুঝা কঠিন। তিনি

শব্দাদি-গুণ-দর্শনে শব্দাদি তন্মাত্রগুলি অনুমিত হয়। এই সকল কারণ চক্ষুরাদির অগোচর, আকাশাদিরূপে পরিণত হইয়া তবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে আমি দেখিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, ইত্যাদি একটি অভিমানের নিত্য যোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে অহঙ্কার অনুমিত হয়। আমি শব্দশ্রবণ করিতেছি, রসাস্বাদ করিতেছি ইত্যাদি অভিমান হইতে বুঝা যায়, তন্মাত্রগুলি এই অহঙ্কারেরই বিকার। এস্থলে যদি এরূপ বিতর্ক হয় যে, আমি শব্দশ্রবণ করিতেছি ইত্যাদি হইতে যখন জগতের কারণের উৎপত্তি, তখন এক জনের অহঙ্কারের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তো সকল জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাহার উত্তর এই যে, সাংখ্যমতে পুরুষ এক জন নন, বহু। এক জনের মুক্তিতে, তৎসম্বন্ধীয় অহঙ্কারের তিরোধান হইল, এবং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির কার্য্য বিলুপ্ত হইল; কিন্তু সহস্র সহস্র অবিমুক্ত ব্যক্তি রহিল, তাহাদিগকে লইয়া প্রকৃতির কার্য্য পূর্ব্ববৎ অবস্থিত করিল। "আমি দেখিতেছি" ইত্যাদির মধ্যে একটী বস্তু নিশ্চয় করিবার বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই নিশ্চয় করিবার সামর্থ্য ব্যতীত অহঙ্কার এক মুহূর্ত্তও অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং এই নিশ্চয় করিবার সামর্থ্য বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের মূল। যে সকল বিষয় নিশ্চিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সুখ, দুঃখ ও মোহের যোগাযোগ নিয়ত ঘটিতেছে। পুরুষ সুখী, দুঃখী বা মুগ্ধ এই প্রকার আপনাকে জানিতেছেন। বুদ্ধির স্বভাবের মধ্যে এই সুখ, দুঃখ ও মোহ নিহিত আছে বলিয়াই, এরূপ সুখ দুঃখ, মোহ পুরুষে উপরক্ত হইতেছে। এই সুখ, দুঃখ ও মোহ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ হইতে [illegible] এই সত্ত্ব রজ ও তমের আধার প্রকৃতিই তবে বুদ্ধির মূল। ইহার পর আর কারণান্বেষণে কোন প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং প্রকৃতিই সমুদায়ের মূলরূপে পরিগ্রহীতব্য। প্রকৃতি অচেতন হইয়া কি প্রকারে দেহাদি কার্য্যের কারণ হইল, এরূপ সংশয় করিবার কারণ নাই। পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি স্বতঃ সমুপস্থিত হয়, যেমন বৎসদর্শনে অচেতন দুগ্ধ আপনাপনি গাভী হইতে ক্ষরিতে থাকে। পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত থাকেন, এই মাত্র, কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন। অয়স্কান্তের সন্নিধানে থাকিয়া, তাহার কোন ক্রিয়া বিনাও যেমন লৌহ আপনি প্রবৃত্তিশীল হয়, প্রকৃতি তেমনি প্রবৃত্তিশীলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির এ প্রকার প্রবৃত্তি পুরুষকে মুক্ত করিবার কারণ হয়। যখন পুরুষ ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিবেন, তখন তাঁহার বিবেকের অভ্যুদয় হইবে, সেই বিবেকে যথার্থ আপনার তত্ত্ব অবগত হইয়া, পুরুষ প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যথার্থ তত্ত্ব এই যে, পুরুষ অসঙ্গ এবং উদাসীন, বুদ্ধির সুখদুঃখাদি তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তিনি আপনি আপনায় সুখী দুঃখী ইত্যাদি মনে করিতেছেন। এই তত্ত্ব জানিয়া, আর তিনি তাহাতে লিপ্ত হইবেন না।

বলিয়াছেন, "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জান। বিকার ও গুণ প্রকৃতিসমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হও। কার্য্য, কারণ ও কর্তৃত্বে প্রকৃতি এবং সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হন। পুরুষ প্রকৃতিসম্ভূত গুণনিচয় ভোগ করিয়া থাকে। গুণসমূহের প্রতি আসক্তি ইহার সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। এই দেহে যিনি পরম পুরুষ, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকে, ইনি সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যে ব্যক্তি এইরূপে গুণ-সহকারে প্রকৃতি ও পুরুষকে জানে, সে যে কোন প্রকারে কেন থাকুক না, আর পুনরায় জন্মায় না (গীতা ১৩।১৯—২৩)।" এস্থলে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের সমগ্র মত সুস্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, কেবল তাঁহার নিরীশ্বর-বাদকে তিনি উড়াইয়া দিয়াছেন ; কেন না সাংখ্যমত বলিতে গিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ব্যতীত তিনি পরম পুরুষ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া, সাংখ্যের পুরুষ সহ পরিগণিত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমধ্যে যোগসূত্রের ঈশ্বরতত্ত্ব সংযুক্তকরত, ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বের অনুমোদন করিয়াছেন। যদি এই টুকু হইত, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারিত যে, তিনি সাংখ্যের যে স্থলে মতদৌর্ব্বল্য ছিল, সেই স্থলে যোগোক্ত ঈশ্বরকে নিবিষ্ট করিয়াছেন, এই মাত্র, তদ্ভিন্ন আর অগ্রসর হয়েন নাই। সাংখ্য ঈশ্বর না মানিয়াও, বেদ ও শ্রুতিগুলিকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। যদি পুরুষকৃত নয়, তবে বেদবক্তা কে ? এই অনবস্থা উপস্থিত দেখিয়া, সেই অবকাশস্থলে যোগসূত্রপ্রণেতা বেদোপদেষ্টৃরূপে ঈশ্বরকে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বরেতে স্রষ্টৃত্ব স্বীকৃত হইল না, কেবল জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দেন, এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইল ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই পরম পুরুষের স্রষ্টৃত্ব, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব সকলই স্বীকার করিয়াছেন। "কল্পক্ষয়ে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়, কল্পের আদিতে আবার তাহাদিগকে সৃজন করিয়া থাকি। সমগ্র এই ভূতসমূহ প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া পরতন্ত্র। আপনার প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া, ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করিয়া থাকি। হে ধনঞ্জয়, সেই সকল [সৃষ্টি] কর্ম্ম আমায় বদ্ধ করে না, কেন না আমি উদাসীনবৎ অবস্থিত, সে সকল কর্ম্মে আসক্ত নহি। আমার অধিষ্ঠানে প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকে, আর এই কারণেই জগতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হয় (গীতা ৯।৭—১০)।"

এই অংশ পাঠ করিয়া, কে আর বলিবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের মত অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কত দূর কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা আবশ্যক। তিনি প্রকৃতিকে 'আমার প্রকৃতি' বলিয়াছেন। "ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আমার অষ্ট প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। জানিও, এ অপেক্ষা আর একটি আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে সেটী জীবপ্রকৃতি (গীতা ৭।৪—৫ ।।" 'আমার প্রকৃতি' এরূপ বলিবার অর্থ কি? বলিবার অর্থ এই যে, প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা তাঁহারই শক্তি। "প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া সৃজন করিয়া থাকি", এখানে আত্মবশে রাখার অর্থ কি? ঈশ্বরের শক্তি মহতী হইলেও, তাঁহার অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া, উহা কিছুই করিতে পারে না। প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসরণপূর্ব্বক। প্রকৃতি যদি তাঁহার শক্তি হইল, তবে তাহার যে সত্ব, রজ ও তমো গুণ, তাহাতো ঈশ্বরেরই হইল, ইহাতে তাঁহাতে গুণসম্বন্ধজন্য দোষ হইল। এতদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে সকল ভাব, সে গুলিকে আমা হইতেই জানিও; কিন্তু সে গুলিতে আমি নাই, আমাতেও সে গুলি নাই (গীত ৭।১২)।" ঈশ্বরের শক্তিতে যখন সমুদায় সৃষ্ট হইল, তখনই সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা হইতে স্বতন্ত্রতা সমুপস্থিত হইল। যদিও স্বতন্ত্রতা হইল, তথাপি মূলে স্বতন্ত্রতা নাই; যাহা কিছু আসিবার, স্রষ্টা হইতে সৃষ্টেতে আসিয়াছে। সুখ, দুঃখ, মোহ, এ তিন সৃষ্টেতে আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে এ সকল নাই। বিষয়সম্বন্ধবশতঃ কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন মোহ, এ সকল পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টেতেই আসে যায়; কিন্তু স্রষ্টাতে কখন আসে যায় না, স্রষ্টাকে উহারা স্পর্শও করিতে পারে না। জড়াংশে জড়ত্ব বা সৃষ্টে কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ উৎপাদন, ইহা যদি স্রষ্টা হইতে হয়, তাহাতে কিছু তাঁহার উপরে দোষ পড়ে না। কেন দোষ পড়ে না, এ কথা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, এবং তাহাতে মূল ছাড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই এখানে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য, যুক্তি বাহির করিয়া লওয়া পাঠকগণের হাতে।

ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বস্বীকার করিয়াও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়াছেন, ইহাও একটী পরস্পরবিরুদ্ধ কথা। কিন্তু কর্ত্তা হইয়াও, কেমন করিয়া অকর্ত্তা হওয়া

যায়, শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। ঈশ্বর সমুদায় করিতেছেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, ইহা দেখিয়া, তিনি সাধককেও সেই প্রকার হইতে উপদেশ দিয়াছেন। "কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমায় এইরূপে জানে, সে কখন কর্ম্মে বদ্ধ হয় না [গীতা ৪।১৪]।" সৃষ্টিকালে সৃষ্টপদার্থসমুদায়ে সৃষ্টের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, তৎপ্রকৃতি অনুসারে সমুদায়ক্রিয়ানিষ্পাদন, আপনি অসঙ্গ উদাসীন নির্লিপ্ত থাকা, ঈশ্বরের এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে অনেক প্রকার ভ্রান্তিতে নিপতিত হন। শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সযৌক্তিক বুঝিতে পারিলে, অনেকের সংশয় তিরোহিত হইতে পারে। সে সকল প্রতিসাধকের মীমাংসিতব্য বিষয় জানিয়া, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, ঈশ্বরের বিরুদ্ধ গুণনিচয় কি প্রকার একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে। "পরব্রহ্ম অনাদি, তাঁহাকে সৎও বলে না, অসৎও বলে না। সকল দিকে তাঁহার পাণিপাদ, সকল দিকে তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সকল দিকে তাঁহার কর্ণ, ত্রিলোক সমুদায় আবৃত করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন। সমুদায় ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, অথচ সমুদায় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অনাসক্ত অথচ সকলের পরিপালক, নিগুর্ণ অথচ গুণভোক্তা, ভূতগণের অন্তরেও বটেন, বাহিরেও বটেন, চরও বটেন, অচরও বটেন, দূরস্থও বটেন, নিকটস্থও বটেন, সূক্ষ্মত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণেতে তিনি বিভক্তের মত অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত বলা হইয়া থাকে। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত [গীতা ১৩।১২—১৭]।"

পুরুষ

উপরে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরাতিরিক্ত জগৎ ও জীবসমূহের মূল আর কেহ আছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। "আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান [গীতা ৭।১০]" এ কথায় ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যোক্ত পুরুষতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মত কি। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, জড়প্রকৃতি এবং

জীবপ্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতি তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ। যে কোন স্থলে জীবকে ব্যাপকরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলে এই জীবপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া যে সেই ব্যাপকত্ব উক্ত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র জড় এবং জীব, এই দুই নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সমগ্র জড়সমষ্টি জড়প্রকৃতি, এবং সমুদায় জীবসমষ্টি জীবপ্রকৃতি। সাধক যোগের অবস্থায় আপনাকে এই জীবসমষ্টির সহিত এক বলিয়া দর্শন করেন। এইরূপে দর্শন করিয়াই তাঁহার যোগ শেষ হইল না, আবার ঈশ্বরেতে আপনাকে প্রবিষ্ট দেখিবেন, ভিন্ন হইয়াও তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে সম্বন্ধানুভব করিবেন। এই ব্যাপক জীবপ্রকৃতির সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতেই জীবকে সমুদায়ে ব্যাপ্ত, সর্ব্বগত, অবিনাশী, অক্ষয়, নিত্য, অপরিমেয়, অজ, ক্ষয়-বৃদ্ধি-অবস্থান্তরপ্রাপ্তিবিরহিত, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অদাহ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অবিকারী, এইরূপ বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সমন্বিত করিয়াছিলেন (গীতা ২।২৪)। এখন সন্দিগ্ধ বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একজীববাদী ছিলেন, অথবা বহুজীববাদী ছিলেন। যোগাবস্থায় জীবসম্বন্ধে একত্বদর্শন, ইহা কিছু অনুচিত নহে; কিন্তু প্রতিদেহে এক এক জীবের অধিবাস, তাঁহা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য। "এক সূর্য্য যেমন এই সমুদায় লোককে প্রকাশিত করে, এক ক্ষেত্রী তেমনি সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে (গীতা ১৩।৩৩)", এ কথা পাঠ করিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ একজীববাদী ছিলেন। কিন্তু গতিমুক্তিবন্ধনাদিবিষয়ে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা এক জীবকে লক্ষ্য করিয়া নহে, ভিন্ন ভিন্ন জীবকে, ইহা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব যখন দেহ হইতে গমন করে, তখন সে আপনার শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া চলিয়া যায়, * ইহা শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মত। জীব যখন গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার চেতনাধিষ্ঠান হয়, এইরূপ প্রত্যেক দেহসম্বন্ধে নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া, তিনি দেহে দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব স্বীকার করিয়াছেন †। দেহীর দেহান্তরে গমন স্বীকার করাতে, দেহভেদে

* "স জীবঃ প্রচ্যুতঃ কায়াৎ কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ সমাবৃতঃ।
অঙ্কিতঃ স্বৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈর্ব্বাপ্যুপপদ্যতে ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ১৭ অ, ৩০ শ্লোক।

† "স জীবঃ সর্ব্বগাত্রাণি গর্ভস্যাবিশ্য ভাগশঃ।
দধাতি চেতসা সদ্যঃ প্রাণস্থানেষ্ববস্থিতঃ ॥

বহু দেহী তিনি যে মানিতেন, ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু যোগ হইলে, সকল দেহী একদেহী একাত্মস্বরূপে যোগীর নিকটে প্রকাশ পায়, এ মতে তাঁহার বিশ্বাস, দেহভেদে পৃথক্ পৃথক্ দেহী মানিয়াও, অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের মতের প্রতি অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে, এই একটি প্রভেদ প্রতীত হয় যে, কর্ম্মাবৃত হইলে জীবের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সমুপস্থিত হয়, এবং সেই কর্ম্ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেই পুরুষরূপে বা আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। কর্ম্মাবৃত জীবকে তিনি ভূতশব্দে উল্লেখ করিতেন। এই জন্য যেখানে জীবশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, সে স্থলে ভূতশব্দের তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

সাংখ্যকার পুরুষের কর্ত্তৃত্বস্বীকার করেন না। পুরুষ তাঁহার মতে অনাদি, নির্গুণ, সর্ব্বগত, চেতন, অকর্ত্তা, কিন্তু গুণভোক্তা। ভোগ করিলেই কর্ত্তৃত্ব না আসিয়া যায় না, অথচ অকর্ত্তা কিরূপে? সাংখ্যমতে ইহার মীমাংসা এই, পুরুষ সুখদুঃখাদির অতীত, সুখদুঃখাদি বুদ্ধির অনুভব, সেই অনুভব পুরুষ আপনার বলিয়া মনে করিতেছেন, তাই তিনি সুখী দুঃখী ইত্যাদি অনুভব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের এই অংশ গ্রহণ করিয়া, পুরুষকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য, উহাকে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পুরুষ যে সকল দ্রব্য ভোগ করে, তাহাকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব পুরুষের বিষয়, পুরুষ আপনি বিষয়ী *। পুরুষ সমুদায় ভোগ করে বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে

ততঃ স্পন্দয়তেঽঙ্গানি স গর্ভশ্চেতনান্বিতঃ।
যথা লোহস্য নিস্যন্দো নিষিক্তো বিম্ববিগ্রহম্॥
উপৈতি তদ্বিজানীহি গর্ভে জীবপ্রবেশনম্।
লোহপিণ্ডং যথা বহ্নিঃ প্রবিশ্য হ্যতিতাপয়েৎ॥
তথা ত্বমপি জানীহি গর্ভে জীবোপপাদনম্।
যথা চ দীপঃ শরণে দীপ্যমানঃ প্রকাশতে॥
এবমেব শরীরাণি প্রকাশয়তি চেতনা।
যদ্ যচ্চ কুরুতে কর্ম্ম শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
পূর্ব্বদেহকৃতং সর্ব্বমবশ্যমুপভুজ্যতে॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ১৮ অ, ৭—১২ শ্লোক।

"দ্রব্যমাত্রমভূৎ সত্ত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়ঃ।
যথা দ্রব্যঞ্চ কর্ত্তা চ সংযোগোঽপ্যনয়োস্তথা॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব অনুগীতা, ৫০ অ ১৪ শ্লোক।

জল যেমন লগ্ন হয় না, তেমনি সে তাহাতে লগ্ন হয় না *। পুরুষের এরূপ নির্লিপ্ত ভাব হইলেও, যখন দ্রব্যে মমতা উপস্থিত হয়, তখনই উহা বন্ধনের হেতু হয় †। গুণকৃত কর্ম্ম আপনার মনে করিয়া যখন পুরুষ বদ্ধ হইল, তখন সে কর্ম্মময় পুরুষ ; আবার যখন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান চলিয়া গেল, তখন সে বিদ্যাময় পুরুষ হইয়া মুক্ত হইল ‡।

পুরুষ যেন কর্ত্তা না হইল, তাহার স্বাধীনতা আছে কি না, এ কথা বিচার্য্য। পুরুষকে যখন সমুদায় প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রকৃতি-কৃত কোন বিষয়েরই সে কর্ত্তা নহে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, তখনই সে স্বাধীন। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া তাহার সে স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছে ; রজোগুণসম্ভূত কামক্রোধ তাহার জ্ঞানকে এমনই আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে স্বাধীন হইয়াও অস্বাধীন, পাপ করিতে না চাহিলেও পাপ করিয়া ফেলে। "এই কামরূপ দুষ্পূর অনল নিত্য শত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানস্থান, এই সকল দ্বারা জ্ঞান আবৃত করিয়া, কাম দেহীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে (গীতা ৩।৩৯—৪০)।" সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী কামশত্রুকে বিনাশ করিলে (গীতা ৩।৪১), জীব আর কিছুতে বদ্ধ হয় না ; তখন সে অসঙ্গ উদাসীন হইয়া, আপনাতে আপনি স্থিতি করে। এই আপনাতে আপনি স্থিতিই স্বাধীনতা।

"বিষয়ো বিষয়িত্বঞ্চ সম্বন্ধোঽয়মিহোচ্যতে।
বিষয়ী পুরুষো নিত্যং সত্ত্বঞ্চ বিষয়ঃ স্মৃতঃ ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ৫০ অ, ৮ শ্লোক।

* "সমঃ সংজ্ঞাগণৈশ্চৈব স সর্ব্বত্র ব্যবস্থিতঃ।
উপভুঙ্‌ক্তে সদা সত্ত্বমপঃ পুষ্করপর্ণবৎ ॥"
ঐ ঐ ১২ শ্লোক।

† "স্নেহাৎ সম্মোহমাপন্নো নাবি দাশো যথা তথা।
মমত্বেনাভিভূতঃ সংস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥"
ঐ ঐ ৩০ শ্লোক।

‡ "তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।
বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ ॥"
ঐ ৫১ অ, ৩৩ শ্লোক।

এইরূপে স্থিতি হইলে পাপ চলিয়া গেল। পাপ চলিয়া গেলে, সে তখন "ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয় (গীতা ৬।২৮)।"

গুণত্রয়

মনুষ্যপ্রকৃতি এবং তাহার ক্রিয়াতে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন প্রাকৃতিক গুণের বিস্তৃত নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিমিশ্র ভিন্ন, কোথাও কেবল এক গুণ প্রকাশ পায় না *। তবে যে গুণের প্রাধান্য থাকে, সেই গুণাংশের বিকাশানুসারে, তৎসমুৎপন্ন প্রকৃতি ও ক্রিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এই সকল গুণের কি প্রকার নিয়োগ হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

তমোগুণ—মোহ, অজ্ঞান, অদাতৃত্ব, কর্ত্তব্যহীনতা, স্বপ্ন, জড়ত্ব, ভয়, লোভ, শোক, সৎকর্ম্মদূষণ, অস্মৃতি, অবিপকতা, নাস্তিক্য, অনিয়তজীবিকত্ব, বিশেষ-ভাব অসংরক্ষণ, অন্ধতা, জঘন্য বিষয়ে প্রবৃত্তি, না করিয়াও কিছু করিয়াছি মনে করা, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমৈত্রী, বিকৃত বিষয়ে অভাববোধ, অশ্রদ্ধা, মূঢ়োচিত চিন্তা, অসরলত্ব, অনুরাগশূন্যত্ব, পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি, চেতনাবিরহিততা, গুরুত্ব অর্থাৎ এমনই স্থূল বা জড় ভাব যে জ্ঞানাদি কিছু সহজে প্রাবিষ্ট হয় না, বিষণ্ণচিত্ততা, অবশিত্ব, বিরুদ্ধদিকে কথার গতি, পরনিন্দায় প্রবৃত্তি, সাধুগর্হণ, অভিমান, ক্রোধ, অক্ষমা, ভূতদ্বেষ, বৃথা অনুষ্ঠান, বৃথা দান, বৃথা আহার, অতিরিক্ত বাক্যব্যয়, অসহিষ্ণুতা, সর্ব্বপ্রকারে নিয়মলঙ্ঘন, মিথ্যায় অভিরুচি,

* "নৈব শক্যা গুণা বক্তুং পৃথক্ত্বেনৈব সর্ব্বশঃ।
অবিচ্ছিন্নানি দৃশ্যন্তে রজঃ সত্ত্বস্তমস্তথা॥
অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে অন্যোন্যং চার্থ জীবনঃ।
অন্যোন্যমাশ্রয়াঃ সর্ব্বে তথান্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ॥
যাবৎ সত্ত্বং রজস্তাবদ্বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ।
যাবৎ তমশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তাবদিহোচ্যতে॥
সংহত্য কুর্ব্বতে যাত্রাং সহিতাঃ সঙ্ঘচারিণঃ।
সংঘাতবৃত্তয়ো হ্যেতে বর্ত্তন্তে হেত্বহেতুভিঃ॥
উদ্রেকব্যতিরিক্তানাং তেষামন্যোন্যবর্ত্তিনাম্।
বর্দ্ধ্যতে তত্তথা ন্যূনং ব্যতিরিক্তঞ্চ সর্ব্বশঃ॥"

অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৯ অ, ১—৫ শ্লোক।

বিবাদপরায়ণতা, অনুচিত আশা, ক্লান্তিবোধ, এই সকল তমোগুণ হইতে সমুপস্থিত হয়। ভ্রান্তি উৎপাদন, পাপে ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি তামসিক গুণের সাধারণ লক্ষণ। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা ইহার সাধারণ ক্রিয়া। শুষ্ক, পর্য্যুসিত, পচাগন্ধযুক্ত, অপবিত্রসামগ্রীভোজনে তামস জনের প্রবৃত্তি (গীতা ১৭।১০)।

রজোগুণ—বল, শৌর্য্য, দর্প, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ধনাদিতে অভিলাষ, খলতা, যুদ্ধে প্রবৃত্তি, মমতা, পালন, বধবন্ধন ও ক্লেশদানে প্রবৃত্তি, ক্রয়বিক্রয়, হেতুবাদ, ক্ষমা, অনুরাগ, সন্ধিবন্ধন, কাট মার ধর এইরূপ পরমর্ম্ম-চ্ছেদনে প্রবৃত্তি, উগ্রতা, দারুণ ভাব, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রদর্শন করিয়া শাসন করিবার প্রবৃত্তি, লৌকিক বিষয়ে চিন্তা, নিষ্ফল কথা, নিষ্ফল দান, বিদ্বেষ, সংশয়, আলাপ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, অবজ্ঞা, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা, তৃষ্ণা, অর্থাৎ লাভে অসন্তোষ, আশ্রয়শীলতা, নীতিমত্তা, অন্য হইতে ধনাদি গ্রহণ, নর নারী জীব দ্রব্য ও আশ্রিতগণেতে ভেদবুদ্ধি, সন্তাপ, অপ্রত্যয়, আমি এক জন এইরূপ বোধ, বহুল সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি, উৎসাহ, যশঃস্পৃহা, হিংসা, ঘৃণা, ইটি আমার চাই, ইটি আমার চাই, এইরূপ আগ্রহ, দ্রোহ, ছল, বঞ্চনা, জাগরণ, ভোগপ্রবৃত্তি, নৃত্য-গীত-দ্যূত-ক্রীড়া-প্রভৃতি আমোদে অভিরুচি, এই সকল রাজসগুণ। ইহার সাধারণ গুণ কর্ম্মের প্রতি আসক্তি। প্রবৃত্তি, তৃষ্ণা ও আসক্তি ইহার সাধারণ ক্রিয়া। অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অম্লোদ্গার জন্মায় এরূপ দুষ্পাচ্য আহার, রোগকর দ্রব্য-ভোজনে রাজসগুণের প্রবৃত্তি (গীতা ১৭। ৯)।

সত্ত্বগুণ—আনন্দ, প্রীতি, বৃদ্ধি, প্রকাশস্বভাব, সুখ, অকার্পণ্য, দেখাইবার ভাবের অভাব, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমত্ব, সত্য, সরলত্ব, অক্রোধ, অসূয়াশূন্যতা, শৌচ, দক্ষতা, পরাক্রম, অহেতুক জ্ঞান, অহেতুক আচরণ, অহেতুক সেবা, অহেতুক শ্রম, অহেতুক দান, অহেতুক যজ্ঞ, অহেতুক অধ্যয়ন, অহেতুক ব্রত, অহেতুক ধর্ম্ম, নির্ম্মমত্ব, নিরহঙ্কার, ধনাদিতে অভিলাষ-শূন্যতা, কামনাবর্জ্জিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, অনালস্য, অনিষ্ঠুরতা, অমোহ, খলতাশূন্যতা, হর্ষ, সন্তোষ, বিস্ময়, বিনয়, সাধু-চরিত্রতা, শান্তিনিরতত্ব, শুদ্ধি, শুভবুদ্ধি, মুক্তস্বভাব, উপেক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, নিত্য অপরিক্ষতধর্ম্মত্ব, শম, দম, স্বাত্মরতি এই সকল সাত্ত্বিক গুণ। শান্তি ও

প্রকাশকত্ব ইহার সাধারণ গুণ। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখানুরাগ ইহার সাধারণ ক্রিয়া। যে সকল বস্তুর আহারে আয়ু, বল, আরোগ্য বৃদ্ধি হয় এবং হৃদ্য, সেই সকল সামগ্রীর ভোজনে সাত্ত্বিক জনের প্রবৃত্তি (গীতা ১৭।৮)।

এই ত্রিবিধ গুণের ভিতরেই বন্ধনের হেতু আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "উহা (সত্ত্বগুণ) জ্ঞানাসক্তিতে ও সুখাসক্তিতে বদ্ধ করে (গীতা ১৪।৬)।" "ইহা (রজোগুণ) কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দেহীকে বদ্ধ করে (গীতা ১৪।৭।") "প্রমোদ, আলস্য ও নিদ্রাযোগে ইহা (তমোগুণ) আবদ্ধ করে (গীতা ১৪।৮)।"

গুণাতীতত্ব

সত্ত্বাদি গুণের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কে কোন্ গুণসম্পন্ন, তাহা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। তবে সকল লোকের ভিতরে সত্ত্বাদি অবিমিশ্রভাবে স্থিতি করে না, এ জন্য ঐ সকল লক্ষণও বিমিশ্ররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে যে ব্যক্তিতে যে লক্ষণগুলি সমধিক প্রস্ফুট এবং প্রায় নিয়ত কার্য্য করে, সে সকল ব্যক্তিকে সেই গুণপ্রধান লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সাধককে এই তিন গুণের অতীত হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে গুণাতীতত্বের লক্ষণ কি, দেখা প্রয়োজন। "প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, এ তিন প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করে না, নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করে না, উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হয়, এই সকল গুণ দ্বারা বিচলিত হয় না, গুণ সকল আপনার কাজ করিতেছে, এই জানিয়া স্থির হইয়া থাকে, একটুও নড়ে না, সুখে দুঃখে সমান, আপনাতে অবস্থিত, লোষ্ট্র-প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য, ধৈর্য্যশীল, নিন্দা ও স্তুতিতে সমান বোধ, মানাপমান ও শত্রু মিত্রে সমান, সকল প্রকারে উদ্যমত্যাগী", ঈদৃশ লোককে শ্রীকৃষ্ণ 'গুণাতীত' বলিয়াছেন (গীতা ১৪।২২—২৫)। প্রকাশ সত্ত্বের গুণ, প্রবৃত্তি রজের গুণ, মোহ তমের গুণ, এ তিন যদি আপনাতে প্রকাশ পায়, তবে তিনি এ সকলকে দ্বেষ করিবেন না, আবার নিবৃত্ত হইয়া গেলেও তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, এ কথার অর্থ কি? যাহা তিনি ভূয়োভূয় বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহার এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, আত্মা যখন দেহের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের সঙ্গে একত্র সংযুক্ত আছে, তখন প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এ তিনকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সময়ে সময়ে উহারা তাহার উপর কার্য্য করিবে; কিন্তু সে সময়ে আত্মা আত্মস্থ থাকিয়া,

এই সকল ব্যাপারে আপনি লিপ্ত হইবে না, উহারা যেমন উদিত হইবে, অমনি বিলীন হইয়া যাইবে। যখন কোন একটি বিষয় আত্মবান্ ব্যক্তির নিকটে প্রতি-ভাত হইতেছে না, অথবা কোন একটি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথবা কোন একটি বিষয়ে তাঁহার মুগ্ধতা উপস্থিত হইতেছে না, তাহাতেও তিনি নির্ব্বিকার থাকিবেন; কেন না তাদৃশ অভিলাষময় চিত্ত হইলে, কখন তিনি বিকারমুক্ত থাকিতে পারিবেন না। লক্ষণ মধ্যে 'সকল প্রকারের উদ্যমত্যাগী' এই একটি বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকারের কর্ম্ম ত্যাগকরত, ইন্দ্রিয়াক্রিয়াবিরত হইয়া, এক স্থানে প্রস্তরবৎ স্থির হইয়া থাকাকেই গুণাতীতত্ব বলিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উক্তির পূর্ব্বাপর বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহার মতে কর্ম্ম করিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যতা কর্ম্ম না করা বা উদ্যমত্যাগ। কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগ করিলে, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রেরণায় আত্মাতে যে ক্রিয়া সমুপস্থিত হয়, সে ক্রিয়া তাহার বন্ধনের কারণ না হইয়া, মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

এই গুণাতীতত্বের লক্ষণ নির্ব্বাচন করিবার আর একটি যে অভিপ্রায় আছে, তাহা যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। যোগে আত্মা সমুদায় আত্মার সহিত এক হইয়া ব্যাপিত্বে অবস্থিতি করিবে, মায়া মোহে মুগ্ধ হইবে না, শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগের ইহা একটি মুখ্য লক্ষ্য। এই একত্বের প্রতিরোধক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সত্ত্বাদিগুণ-জনিত প্রত্যেকের স্বভাব ও ক্রিয়া পরস্পরকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এই স্বভাব ও ক্রিয়াতে আবদ্ধ না হইয়া, যাঁহারা তাহার অতীত হন, তাঁহাদিগের ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়। এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবার ফল এই যে, অভেদজ্ঞানে ঈশ্বরের স্বরূপভূত জীবশক্তি বা পুরুষ সহ একত্ব হইয়া, ঈশ্বর সহ যোগ সমুপস্থিত হয়।

বেদের গুণাধীনত্ব

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশকালে বলিয়াছেন, সত্ত, রজ ও তম এই তিন গুণ বেদের বিষয়, তুমি তিন গুণের অতীত হও। বেদের গুণাধীনত্ব তিনি এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে প্রবেশ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। এইটি দেখাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ একটী আখ্যায়িকা

অবলম্বন করিয়াছেন, সে আখ্যায়িকা এই। দেব, ঋষি, নাগ ও অসুরগণ প্রজাপতির নিকটে, শ্রেয় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে দেবগণের দানে, ঋষিগণের ইন্দ্রিয়সংযমে, অসুরগণের দম্ভে, এবং সর্পগণের দংশনে প্রবৃত্তি হইল। উপদেষ্টা এক জন, একই শব্দে শিষ্যগণ সংস্কারলাভ করিল, অথচ সকলের অধ্যবসায় ভিন্ন হইল *। যত প্রকারের শাস্ত্র আছে, অনুশাসন আছে, সে সমুদায় এইরূপে পাত্রভেদে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে, এবং বহুমতভেদে পরিণত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি উপদেশে উহা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যোগের মত

আলম্বন

সাংখ্যমতগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের স্বাধীন ভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যোগসম্বন্ধে সে প্রকার স্বাধীন ভাব আছে কি না, ইহা দেখা একান্ত প্রয়োজন। তিনি যোগকেই যখন সর্ব্বপ্রধান করিয়াছেন এবং কর্ম্মাদি সকলই এই যোগের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, তখন এখানে তাঁহার স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। যোগসূত্র সেশ্বরসাংখ্য নামে অভিহিত; সাংখ্যের পুরুষ সহ পরিগণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সঙ্গে, যোগসূত্রকার ঈশ্বর আর এক তত্ত্ব সংযুক্ত করিয়া, ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব করিয়াছেন। অবিদ্যাদি-পঞ্চ-ক্লেশ-বিরহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মফল, ফলানুকূল চিত্তস্থ সংস্কার বা বাসনা, এ সকল দ্বারা যিনি কখন সংস্পৃষ্ট হন নাই, ঈদৃশ পুরুষবিশেষ তাঁহার মতে ঈশ্বর †। এখানে পুরুষবিশেষ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মুক্ত জীব এ সমুদায়ের স্পর্শবর্জ্জিত হন বটে, কিন্তু এক সময়ে তিনি এ সমুদায়ের বিষয় ছিলেন, ঈশ্বর কখন এ সমুদায়ের বিষয় হন নাই, হইতে পারেন না। যে সকল উপদেষ্টা হইয়াছেন,

---

* "একং শাস্তারমাসাদ্য শব্দেনৈকেন সংস্কৃতাঃ।
নানাব্যবসিতাঃ সর্ব্বে সর্পদেবর্ষিদানবাঃ॥"
অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ২৬ অ, ১১ শ্লোক।

† ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। যোগসূত্র ১। ২৪।

ইনি তাঁহাদিগের সকলেরই গুরু *। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের সঙ্গে সায় দিয়া কেবল পুরুষমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন না এবং কখন করেন নাই। তিনি পুরুষের উপরে পরমপুরুষ সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যোগনিবদ্ধ করিবার উপায় বলিয়াছেন। এখানে তিনি যোগসূত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থার কি প্রকারে বাহিরে গিয়াছেন, একবার দেখা যাউক।

পতঞ্জলি যোগীর আলম্বনরূপে ভূত, ইন্দ্রিয় ও জীব, এই তিনটি বিষয় সমুপস্থিত করিয়াছেন। পৃথিব্যাদি স্থূল ভূত, সূক্ষ্ম তন্মাত্র, চক্ষু-কর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয়, ব্যাস শুকাদি মুক্ত জীব, যোগসূত্রকারের মতে এই সকল ধ্যেয় বিষয়। স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে মুক্তপুরুষগণেতে চিত্ত লগ্ন হইয়া, উহা তদাকারত্ব প্রাপ্ত হয় †। যখন ধ্যেয় বিষয় চলিয়া যায়, তখন পুরুষ আপনাতে আপনি স্থিতি করে। এখানে দেখা যাইতেছে, পতঞ্জলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে যোগের বিষয় করেন নাই। ঈশ্বরাভিধায়ক ওঙ্কার প্রণবজপ ও তাহার অর্থচিন্তা, ঈশ্বরেতে সমুদায় অর্পণ, এইমাত্র তাঁহার যোগসূত্রে ঈশ্বর সহ যোগীর সম্বন্ধ। এ সকল অনুষ্ঠানের লাভ আপনাতে আপনি স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে সেশ্বর সাংখ্য বা যোগসূত্রের অনুসরণ করেন নাই। তিনি জীবাত্মা পরমাত্মার যোগকেই যোগ বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকেই যোগের বিষয় বলিয়াছেন।

পতঞ্জলি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কি পরে সূত্ররচনা করিয়াছেন, এ বিষয়ের বিচার নিষ্প্রয়োজন। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য যদি ব্যাসকৃত হয়, তবে এ পতঞ্জলি যে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ছিলেন, ইনি পাণিনিতন্ত্রের ভাষ্যকার নহেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। বেদান্তসূত্রে যোগশাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্বনিরসন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই স্থির হয় যে, এখনকার প্রচলিত সূত্র না হউক, ঈদৃশ একখানি সূত্রগ্রন্থ ব্যাসের সময়ে ছিল। পতঞ্জলি ভিন্ন অপরে যোগের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগের বিষয়ও নিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণই করুন, অথবা আপনি পরমাত্মাকে যোগের বিষয় করুন, তিনি যে এ বিষয়ে যোগসূত্র হইতে

---

* স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ১। ২৬।

† ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্র্হীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ। ১। ৪১।

স্বতন্ত্রপথাবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাতে বৌদ্ধভূমির সর্ব্বথা পরিহার হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে যোগীর প্রাপ্য বিষয় স্থির করিলেও, সাধকের পক্ষে যোগসূত্রের প্রদর্শিত পথ যে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্মে চিত্তস্থাপন করিয়া উপাসনা করা যদিও কৃষ্ণের অনভিমত নয়, বরং তিনি আপনি স্বয়ং কূটস্থ পরমাত্মারই ধ্যান করিতেন, তথাপি তিনি বাহিরে চিত্তস্থাপনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে ভিতরের দিকে গিয়া, পরিশেষে আত্মাতে পরমাত্মদর্শনের যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে যোগসূত্রকারের পথ এক প্রকার সুস্পষ্ট অবলম্বিত হইয়াছে। অহম্‌ভাবাপন্ন ঈশ্বরেতে চিত্তস্থাপনের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে, মুক্তপুরুষে না হউক, পুরুষবিশেষকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ধারণার বিষয় করা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত, বিলক্ষণ প্রতীত হয়। এটি তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহা তিনি সাধনার্থিগণের সৌকর্য্যার্থ পরিহার করিতে পারেন নাই। পতঞ্জলি, যাহার যাহা অভিমত, সে তাহা ধ্যান করিবে *, এই বলিয়া, পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। কোন প্রকারে চিত্তস্থির করা যখন তাঁহার উদ্দেশ্য, তখন এরূপ স্বাধীনতা কেনই বা তিনি দিবেন না। যোগে একই ব্যক্তিতে মুক্ত পুরুষের বা ঈশ্বরের আবির্ভাব সমভাবে পরিগৃহীত হইত। জন্মসময় হইতে অবতারে ঈশ্বরাবির্ভাব অবতারবাদিগণ † মানেন, যোগজনিত আবির্ভাব জীবনের যে কোন সময়ে সংঘটিত হয়।

* যথাভিমতধ্যানাদ্বা। ১। ৩৯।

† অবতারবাদের সহিত একটি অতিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখা সমুচিত। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "তোমার ও আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকল জন্মের কথা আমি জানি, তুমি জান না (গীতা ৪।৫)।" এই যে অবতারবাদের পুনঃ পুনঃ আগমন, ইহা পৌরাণিকগণের স্থিরতর মত। এ আগমন কেবল ঈশ্বরাবতারসকলের নহে, ঋষি মহর্ষিগণেরও এইরূপ যুগে যুগে অবতরণ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই কোন অবতার জগতে উপস্থিত হন, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেরই তৎসহ ভূতলে আসিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নর এবং আপনাকে নারায়ণ বলিয়া ভূয়োভূয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদবিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের নাম বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু পুরাণে সকল সময়ে ইঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ

বিভূতি

যোগসূত্রের একটি পাদের নাম বিভূতিপাদ। ইহার মধ্যে যোগে অনেক প্রকার অলৌকিক সামর্থ্য যোগীতে উপস্থিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এ সকল যে প্রকৃতযোগসম্বন্ধে অন্তরায়, তাহা যোগসূত্রে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে *। শ্রীকৃষ্ণ যখন সাক্ষাৎ ব্রহ্মলাভোপযোগী যোগের কথা বলিয়াছেন, তখন এ সকল যে বলিবেন না, তাহা তো অতীব স্বাভাবিক। তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা, যাহা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি উপদেশ না দিন, আপনার জীবনে ঐ গুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিতে গিয়া, ঐ সকল তাঁহাতে আপনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, অথবা তিনি চেষ্টা করিয়া এ সকল নিষ্পন্ন করিয়াছেন, ইহা বলা সহজ নহে।

চরিত্রযোগ

শ্রীকৃষ্ণ যে যোগের উপদেশদান করিয়াছেন, তাহা হঠযোগ নহে, অথবা

কেন হয়, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যাঁহার ভাবাপন্ন, তিনি তাঁহার অবতার বলিয়া উল্লিখিত হন। শ্রীচৈতন্যের সময়েও এইরূপ ভাবাবেশে তত্তদবতারের উল্লেখ হইয়াছে। মহাভারতের আদি এবং অন্তে, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কে কাহার অংশ, নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে নারদের অবতরণও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আবির্ভাব অনেক সময়ে যোগে যে কোন ব্যক্তি আপনাতে করিয়া লইতেন। ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশদানকালে, বিদুর সনৎসুজাতের সহিত যোগে অভিন্ন হইয়া, সনৎসুজাতই যেন উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিলেন, এইরূপে "মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই" ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়াছিলেন। এটি যে যোগের ব্যাপার, তাহা বিদুরের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

"ব্রাহ্মীং হি যোনিমাপন্নঃ সুগুহ্যমপি যো বদেৎ।
ন তেন গর্হ্যো দেবানাং তস্মাদেতদ্ব্রবীমি তে॥"

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৪০ অ, ৬ শ্লোক।

শূদ্র ব্রহ্মযোনিলাভ করিয়া বলিলে নিন্দনীয় হয় না, অতএব আমি উহা বলিতেছি, এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, বিদুর যোগে এক হইয়া আপনি বলিলেন।

* তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। ৩। ৩৯।

ভাগবতে উদ্ধবের নিকটে এই সকলের উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরলাভার্থিগণ এ সকলেতে বৃথা সময়ক্ষেপ করিবেন না বলিয়া, ঐ সকল ধিক্কৃত হইয়াছে।

বিকৃত আনন্দকে ব্রহ্মসংস্পর্শ ভাবিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করাও নহে। "রজো-গুণ নিবৃত্ত হইলে যোগীর মন প্রশান্ত হয়, মন প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত হইয়া, সে উত্তম সুখ লাভ করে। যোগী এইরূপে আত্মসমাধানকরত পাপশূন্য হয়, এবং সহজে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয় (গীতা ৬।২৯)।" এ স্থলে ব্রহ্মসংস্পর্শজন্য অত্যন্ত সুখের কথার যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি পাপশূন্যতার কথাও আছে। মানুষ কখন কি একেবারে পাপশূন্য হইতে পারে? একেবারে পাপশূন্য না হউক, তাহার রজোগুণের বিকার চলিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাহার পাপে প্রবৃত্তি আছে, তজ্জন্য মন চঞ্চল, সে কি প্রকারে যোগযুক্ত হইবে? পাপ করিতেছি, অথচ প্রকৃতিবশতঃ এ সকল হইতেছে, মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগে কখন যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি যদিও আত্মাকে নির্লিপ্ত করিবার জন্য, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের স্বভাববিহিত কার্য্যকে তাহাদের কার্য্য জানিয়া, তৎসম্বন্ধে আপনাকে নির্লেপ অনুভব করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি সর্ব্ববিধ পাপ যে যোগের অন্তরায়, ইহা তিনি ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মেতে এক ব্যক্তি সংস্থিত হইয়াছে কি না, ইহা যখন তিনি ব্রহ্মের সহিত গুণ-সাম্যে লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন পাপনির্ম্মুক্ত না হইয়া যোগ হইবে, ইহা তিনি কখন নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার এমনই সুকঠিন নিয়ম যে, তিনি যোগসাধনকে পাপবিমুক্তির উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ক্রমে যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপবিমুক্ত হইয়াছে, সে তো অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়ই (গীতা ৬।৪৫)।"

ধর্ম্মজীবন

নিত্যকৃত্য

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল, এখন দেখা সমুচিত, এই ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে কি প্রকার কার্য্য করিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাধনবিমুখ ছিলেন না, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রাতঃকালে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির যথোচিত

অনুষ্ঠান করিতেন *। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নিত্যানুষ্ঠানের প্রণালী নিবদ্ধ আছে। মহাভারতে যাহা সংক্ষেপে নিপিবদ্ধ হইয়াছে, † ইহা তাহারই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন, সুতরাং ভাগবতোক্ত প্রণালী এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে পরিগৃহীত হইল।

"ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জলস্পর্শকরত, স্থিরচিত্ত হইয়া, প্রকৃতির অতীত সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করিলেন, যিনি এক, স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি, ক্ষয়াদিশূন্য, আপনাতে অবস্থিতিপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার কলুষ হইতে নিবৃত্ত, ব্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত আত্মশক্তিযোগে যাঁহার সত্তা ও আনন্দস্বরূপ লক্ষিত। অনন্তর নির্ম্মল জলে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক, সোত্তরীয়বসনপরিধানকরত, সান্ধ্যোপাসনাদিক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিলেন এবং অগ্নিতে আহুতিদানপূর্ব্বক, বাগ্যত হইয়া, গায়ত্রীজপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যোপস্থান সমাধা করিয়া, পরমাত্মার কলা দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বিপ্র ও-বয়োবৃদ্ধগণকে অর্চ্চনা করিলেন। পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও তিল সহ সৎস্বভাবা, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গা, মৌক্তিকমালায় ভূষিতা,

* "অবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং কৃত্বা শৌচং যথাবিধি।
রথমোচনমাদিশ্য সন্ধ্যামুপবিবেশ হ॥"

উদ্যোগপর্ব্ব, ৮৩ অ, ২১ শ্লোক।

"প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্তু কৃতবান্ সর্ব্বমাহ্নিকম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি॥"

উদ্যোগপর্ব্ব, ৮৮ অ, ১ শ্লোক।

† "তত উত্থায় দাশার্হ ঋষভঃ সর্ব্বসাত্বতাম্।
সর্ব্বমাবশ্যকঞ্চক্রে প্রাতঃকার্য্যং জনার্দ্দনঃ॥
কৃতোদকানুজপ্যঃ স হুতাগ্নিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
ততশ্চাদিত্যমুদ্যন্তমুপাতিষ্ঠত মাধবঃ॥

* * * *

ততো বিমল আদিত্যে ব্রাহ্মণেভ্যো জনার্দ্দনঃ।
দদৌ হিরণ্যং বাসাংসি গাশ্চাশ্বাংশ্চ পরন্তপঃ॥
বিসৃজ্য বহুরত্নানি দাশার্হমপরাজিতম্।
তিষ্ঠন্তমুপসংগম্য ববন্দে সারথিস্তদা॥"

উদ্যোগপর্ব্ব, ৯৩ অ, ৫—৬ * * ১০—১১ শ্লোক।

বসনাচ্ছাদিতা, রৌপ্যমণ্ডিতখুরবিশিষ্টা, দুগ্ধবতী, প্রথমপ্রসূতা, নিয়মিতসংখ্যক গো কুণ্ডলাদিভূষিত বিপ্রগণকে দান করিলেন। আত্মবিভূতি গো, বিপ্র, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও ভূতসকলকে নমস্কারপূর্ব্বক মঙ্গলদ্রব্যস্পর্শ করিলেন। তদনন্তর সেই নরলোকভূষণ আপনার বসন ভূষণ ও মাল্যানুলেপনে আপনাকে ভূষিত করিলেন। ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ, দেবতাসকলকে দর্শনপূর্ব্বক, সকল জাতীয় পৌরজন এবং অন্তঃপুরচারিগণের যাহার যাহা অভিলষিত, তাহাদিগকে তাহা দিয়া এবং প্রজাগণকে তাহাদিগের কামনার বিষয়দানে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, আপনি আনন্দিত হইলেন। স্রক্, তাম্বুল এবং অনুলেপন অগ্রে বিপ্রগণকে, তদনন্তর সুহৃৎ অমাত্যপ্রভৃতি এবং পত্নীগণকে ভাগ করিয়া দিয়া, পরে আপনি গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সারথি সুগ্রীবাদি চারিটি ঘোড়ায় সংযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল; সারথির হাতে হাত দিয়া পর্ব্বতারোহী দিবাকরের ন্যায়, সাত্যকি ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া, রথারোহণ করিলেন। অন্তঃপুরস্থা নারীগণ সলজ্জ প্রেমদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, অতিকষ্টে তাঁহাকে যাইতে দিলেন, তিনিও হাসিয়া তাঁহাদিগের মন হরণ করিলেন। সমুদায় বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত সুধর্ম্মানামে প্রসিদ্ধ সভায় প্রবেশ করিলেন, যে সভায় প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের কামক্রোধাদির তরঙ্গ নিবৃত্ত হয় *।"

এই অংশ পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তৎকালের যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় ছিল, সমুদায় অনুষ্ঠান করিতেন, এবং স্বয়ং একমাত্র পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত এই কার্য্যগুলিকে গোস্বামিপাদগণ নরলীলার অনুকরণ, † এবং লোকশিক্ষার্থ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "পার্থ, তিন লোকের মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই, অপ্রাপ্য পাইবার নাই, অথচ আমিও কর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকি। আমি যদি নিরলস হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করিতাম, সর্ব্বথা লোক সকল আমার পথানুসরণ করিত (গীতা ৩।২২—২৩)।" শ্রীকৃষ্ণের এ কথায় এই প্রতীত হইতেছে যে, তিনি যখন

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্ক, ৭০ অ ৩—১৪ শ্লোক।

† "লোকশিক্ষার্থমেব নরলীলাকৌতুকার্থঞ্চ।"—বৈষ্ণবতোষণী

ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়াছেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য নাই। কেন নাই? এই জন্য নাই যে, যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার পাইবার কিছু অবশেষ নাই যে, তাহা পাইবার জন্য তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তবে তিনি কর্ম্ম কেন করেন? লোকদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য। এ সকল সৎকর্ম্ম আন্তরিক নয়, বাহ্যিক; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাহ্যকর্ম্মসম্বন্ধে। তিনি আপনি নির্লিপ্ত থাকিয়া, প্রতিদিন যে সকল নিয়মিত বাহ্যানুষ্ঠান করিতেন, তাহা লোকদিগের হিতার্থ এবং অনুষ্ঠানসাধনদ্রব্যসমূহে ব্রহ্মদর্শন জন্য। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মে চিত্তস্থাপন, ইহাই তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠেয় ছিল। এটি কখন সামান্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য নহে। এই কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ কখন হইতে পারে না, মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মত্যাগ তামস (গীতা ১৮।৭)।" শ্রীকৃষ্ণ এ কথা যেমন অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, তেমনি তিনি আপনার জীবনে উহা প্রতিদিন প্রতিপালন করিয়া সুদৃঢ় করিয়াছেন।

কৃষ্ণ কি শৈব?

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। তিনি আপনি শৈব ছিলেন কি না, ইহা একটি গভীর প্রশ্নের বিষয় *। তিনি পুত্রার্থী হইয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে বরলাভ করিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতরুদ্রীয় পাঠ করিতেন, ইহা মহাভারতে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তিনি হিমালয়ে উপমন্যুনামা শৈব ঋষির নিকটে দীক্ষিত হইয়া, মহাকঠোরব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুইবার হিমালয়প্রদেশে গিয়া শিবের আরাধনা করেন। প্রথমবারে দ্বাদশ বর্ষ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে পঞ্চমাসে তিনি মহাদেবের সাক্ষাৎকারলাভ করেন। তিনি শঙ্করের নিকটে এই আটটি বিষয়ে বর গ্রহণ করেন, ধর্ম্মে দৃঢ়ত্ব, যুদ্ধে শত্রুনিপাত, যশ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, পরম বল, যোগপ্রিয়ত্ব, শিবসন্নিকর্ষ, শত শত পুত্র। কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, ভগবতীর অনুরোধে তিনি তাঁহার নিকটে আরও আটটি বর গ্রহণ করেন,—

* "রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।
তং প্রসাদ্য তদা দেবং বদর্য্যাং কিল ভারত॥"

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪ অ, ১০ শ্লোক।

দ্বিজগণেতে অক্রোধ, পিতৃপ্রসন্নতা, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলে প্রীতি, মাতৃ-প্রসন্নতা, শান্তিপ্রাপ্তি ও দক্ষতা *। তপশ্চরণ করিয়া, কঠোরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক, দীর্ঘকাল সাধন পুত্রলাভার্থ বলিয়া যদিও উল্লিখিত আছে, তথাপি বর-গ্রহণের মধ্যে যে বিষয়গুলির উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল পুত্রলাভ উদ্দেশ্য ছিল না, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই বরমধ্যে যোগপ্রিয়ত্ব, ঈশ্বরসান্নিকর্ষ, ইহাও প্রার্থিতব্য বিষয় ছিল। শৈবগণ যোগবিষয়ে অগ্রসর। যোগজনিত-বিভূতিলাভ করিতে হইলে, তাঁহাদিগের শিষ্যত্বভিন্ন আর উপায়ান্তর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ যোগৈশ্বর্য্যলাভার্থী হইয়া, দীর্ঘকাল হিমালয়ে কঠোরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সাধন করিয়াছিলেন, ইহাই বাস্তবিক কথা। তিনি এইরূপ যোগসাধনে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় জগৎকে যে ধারণার বিষয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিশ্বরূপদর্শনে প্রতিপন্ন হয়; কেন না আপনি যাহাতে বিশ্বাস করা না যায়, তৎপ্রতি ইচ্ছাশক্তির প্রবল বেগ সমুপস্থিত হয় না। যে বিষয়ে ইচ্ছাশক্তির প্রবলবেগ থাকে না, অপরেতে তাহা প্রতিফলিত করা সম্ভবপর নহে।

দ্বিজভক্তি

শ্রীকৃষ্ণের বরের মধ্যে একটি বর এই যে, দ্বিজগণের প্রতি অক্রোধ। তিনি আপনি আপনার জীবনের যে একটী ঘটনা প্রথমে আপনার পুত্র প্রদ্যুম্নকে এবং তৎপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার বরের প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। একদা দুর্ব্বাসা তাঁহার গৃহে আসিয়া বলেন, আমাকে নিতান্ত কোপনস্বভাব জানিয়া কেহ স্থান দেয় না, তুমি কি আমায় তোমার গৃহে স্থান দিবে? ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অতি আদরের সহিত তাঁহাকে আপনার গৃহে বাসস্থান দেন। তিনি কোন দিন একাই বহু লোকের অন্ন ভোজন করিতেন,

---

"ধর্ম্মে দৃঢ়ত্বং যুধি শত্রুঘাতং যশস্তথাগ্র্যং পরমং বলঞ্চ।
যোগপ্রিয়ত্বং তব সন্নিকর্ষং বৃণে সুতানাঞ্চ শতং শতানি॥"

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৫ অ, ২ শ্লোক।

"দ্বিজেষ্বকোপং পিতৃতঃ প্রসাদং শতং সুতানাং পরমঞ্চ ভোগম্।
কুলে প্রীতিং মাতৃতশ্চ প্রসাদং শমপ্রাপ্তিং প্রবৃণে চাপি দাক্ষ্যম্॥"

ঐ ঐ ৩ শ্লোক

কোন দিন অল্পই ভোজন করিতেন। কোন দিন এমন হইত যে, ঘরে থাকিতেন না। কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন। বয়সে তাঁহার সমান পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না। হয় তো এক দিন ঘরের মধ্যে গেলেন, গিয়া শয্যার আস্তরণ ও সেবার্থনিযুক্ত অলঙ্কৃত কন্যাগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দগ্ধ করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। এক দিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পায়স ভোজনের অভিলাষ জানাইলেন। বহুভোজনসামগ্রী সহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উত্তপ্ত পায়স দিলেন। তিনি পায়স ভোজন করিয়া অবশিষ্ট পায়স শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্টের বিচার না করিয়া, সমুদায় মাথা ও শরীরে সেই পায়স মাখিলেন। সম্মুখে রুক্মিণী দণ্ডায়মানা ছিলেন, দুর্ব্বাসা হাসিয়া তাঁহার গাত্রে পায়স মাখাইয়া দিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া রথে গিয়া উঠিলেন। রথে উঠিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনে দুঃখ বা ঈর্ষা কিছুই হয় নাই। দুর্ব্বাসা তদবস্থায় রুক্মিণীকে লইয়া রথে বাহির হইলেন। দশার্হগণ সকলেই এতদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, অন্য কোন জাতি হইলে তাহার মাথা লইয়া ফিরিয়া আসা সুকঠিন হইত। দুর্ব্বাসা রথে চলিয়া যাইতে রুক্মিণী পথে নামিয়া পড়িলেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন, এবং উৎপথে দক্ষিণ মুখে দৌড়াইলেন। এতদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ পায়সমাখা শরীরে "মুনিবর ক্ষমা করুন, মুনিবর ক্ষমা করুন" এই বলিতে বলিতে, পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। তখন তেজস্বী দুর্ব্বাসা তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তুমি প্রকৃতিতে জিতক্রোধ, আমি তোমার কোন অপরাধ দেখিতে পাই নাই। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি তোমায় বর দিতেছি, তুমি সকল লোকের অতীব প্রিয় হইবে। অন্নে যেমন তাহাদিগের প্রীতি, তেমনি তোমাতে প্রীতি হইবে। তুমি এই পায়স যে যে স্থলে মাখিয়াছ, সে সে স্থলে মৃত্যুর অধিকার নাই। তুমি পদতলে পায়স মাখ নাই, ইহা আমার অতীব অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছে *। দ্বিজবর দুর্ব্বাসা এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব জগতে ব্যক্ত করিলেন।

* যদুবংশধ্বংস হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসার বাক্য স্মরণ করিলেন, এই যে লিখিত

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজজাতির প্রতি কেন এ প্রকার ভক্তিমান্ ছিলেন, তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন। দ্বিজজাতি একান্ত তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তপস্যার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন। এমন কি, তপস্যায় সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যপর্য্যন্ত লাভ হয়, এ কথা তিনি ভূয়োভূয় বলিয়াছেন। তিনি আর কিছুরই ভয় করিতেন না, কেবল এক তপস্যার প্রভাবকে ভয় করিতেন। বস্তুতঃ যাহারা তপস্যাপরায়ণ, তাঁহাদিগের জ্ঞানশক্তিপ্রভাব অতীব প্রবল। তাঁহারা সর্ব্বদা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত। যাহারা তপস্যাবিমুখ, সুতরাং ধর্ম্মবলবিরহিত, তাহাদিগের শারীরিক বা মানসিক বীর্য্য কিছুই নহে, পৃথিবী ইহার প্রমাণ অনেক দেখিয়াছে। রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের চরণধৌতের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যে তপস্যার প্রতি ভক্তিপ্রণোদিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তপঃপ্রভাবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কি প্রকার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, দুর্ব্বাসার প্রতি ব্যবহারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

উপেয়বাদিত্ব

উপায় ও উপেয় এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। উপেয়লাভের জন্য যখন উপায়াবলম্বন, তখন সকলেই বলিবেন, উপেয়ই উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ, উপেয়ের জন্যই উপায়ের মূল্য। অতএব কোন কোন পণ্ডিতের মত এই, উপেয় যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তাহা হইলে উপায় সদোষ হইলেও সদোষ নহে। যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহাতে, শ্রীকৃষ্ণ যে উপেয়বাদী; অর্থাৎ উপেয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গত হইলে, উপায় সদোষ হইলেও সদোষ নয়, এই মতপক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ সমুপস্থিত হয় না। তিনি এই মতবাদী ছিলেন বলিয়াই, যুদ্ধস্থলে অসত্য ও ছলের অনুমোদন করিয়াছেন। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, যুদ্ধে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। যেখানে তিনি দেখিলেন যে, অধর্ম্মপক্ষীয়গণকে অসত্য বা ছল অবলম্বন না করিলে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে তিনি উপেয় ধর্ম্মের জয় সিদ্ধ করিবার জন্য তদবলম্বন

হইয়াছে, তাহা এই কথা। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসার বাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পদতল বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইবে।

করিতে অপরকে প্ররোচিত করিয়াছেন। কিন্তু যদিও তিনি উপেয়বাদী ছিলেন, আপনি স্বয়ং কোথাও অসত্যাবলম্বন করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত নাই। বরং তিনি মৃতজাত পরিক্ষিতকে চেতনায় আনিবার সময়ে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রে যে যে স্থলে মিথ্যা বলিবার ব্যবস্থা আছে, সে সে স্থলেও কখন তিনি অসত্য বলেন নাই; অতএব তাঁহার সত্যবাদিত্বের বলে পরিক্ষিত চেতনালাভ করুক। ইহাতে এই প্রতীত হয়, যে সকল লোকের ত্রিগুণবিষয়ক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের জয়সাধনার্থ শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে ছল বা অসত্য অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করিতেন। অর্জ্জুন তাঁহার কথায় ছল বা অসত্য অবলম্বন করেন নাই, ইহাতে তিনি কখন তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তিনি ঈদৃশ আচরণ ভালবাসিতেন বলিয়াই, তাঁহার কথা না শুনাতে, তিনি তৎপ্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার সদৃশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক কৌশলে তাঁহার সে অভিমান ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। অর্জ্জুন যে কথায় সায় দিলেন না, যুধিষ্ঠির জয়ের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহাই করিলেন। তাঁহার যে দুর্ব্বলতা ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; তাই তিনি পর সময়ে তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "আপনার কর্ম্মও স্থৈর্য্যলাভ করে নাই, শত্রুও পরাজিত হয় নাই।" পরম্পরাগত উপেয়বাদ শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি মত অপেক্ষা তাঁহার জীবন যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাঁহার আত্মজীবনের ক্রিয়ায় তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ক্ষাত্রধর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতে ক্ষাত্র বল প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষাত্র ধর্ম্ম চিরজীবন রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধে প্রাণিবধ বধ নহে, প্রত্যুত হত ব্যক্তির স্বর্গগমনের জন্য, ইহা তিনি বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধের উৎপত্তিসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতিহাসবিদ্গণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। পুরাকালে কাহারও ধন-জন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না; দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। দস্যুগণ সর্ব্বদা ধনাদিলুণ্ঠন করিত এবং লুণ্ঠনকালে অনেক লোককে বধ করিয়া চলিয়া যাইত। এই দস্যুগণের নিবারণ জন্য অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মিত এবং যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মতে স্বয়ং ইন্দ্র উহার প্রবর্ত্তক। ঋগ্বেদপাঠে যখন

এইরূপ অবগত হওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ এ কথা কেনই বা বলিবেন না। যাহারা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক অপরের বিত্তাদি হরণ করিত, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দস্যুমধ্যে গণ্য করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ ঈদৃশ দস্যুগণের আক্রমণ হইতে জনসমাজকে রক্ষা করিবেন, এ জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত, এই বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধকর্ম্মের অনুমোদন করিতেন; অর্জ্জুনকে এই জন্যই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, অন্য কোন কারণে নহে। যাঁহারা মনে করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কেবল ছল-চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের ইহা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি ক্ষাত্রধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তিনি অর্জ্জুনকে কিছুতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেন-না। তবে গুণাতীত ধর্ম্ম কি, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু অর্জ্জুন যে সে ধর্ম্মে সে পর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই, এখনও ক্ষাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হে কুন্তীতনয়, স্বভাবজাত স্বকর্ম্মে তুমি বদ্ধ রহিয়াছ, মোহবশতঃ যাহা করিতেছ না, অবশ হইয়াও তাহা করিবে (গীতা ১৮।৬০)।"

বিশ্বাসের পরীক্ষা

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণানুসারে লোকের প্রকৃতি ভিন্ন হয় এবং নির্গুণ ধর্ম্মে সুদৃঢ় না হইলে, সে প্রকৃতি কখন জয় করিতে পারা যায় না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা আপনার মতের একটি প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যত দিন লোক প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই, তত দিন তাহাকে কোন প্রকারে প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে বলপ্রকাশপূর্ব্বক মুক্ত করা যাইতে পারে না। তিনি এ সম্বন্ধে এত দূর দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন অবিনয়ী হইতে চলিল, অথচ তিনি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিলেন না। রোধ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের প্রবল প্রবৃত্তি কলহ বিবাদ বা প্রজাগণের প্রতি অত্যাচারে পরিণত না হয়, এ জন্য সেই প্রবৃত্তিচরিতার্থের উপায়ান্তর করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির অপরিহার্য্যত্ববিষয়ে একান্ত বিশ্বাস তাঁহাকে শেষ জীবনে ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত করিয়াছিল। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ পরস্পরকে বধ করিল, এ দৃশ্য তিনি দেখিলেন, দেখিয়া সমুদায় ক্লেশ বহন করিলেন, এই তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষা। যাহা অপরিহার্য্য, প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা হইবে, এই জানিয়াই তিনি ধৈর্য্য

ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলবিনাশে তাঁহার যে শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ সে সমুদায়ের স্পষ্ট নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এক যোগকেই যে তিনি দুঃখের অপহারকরূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবন তাহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

উপদিষ্টত্ব

শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল উপদেশ দিয়াছেন, না, আর কোথা হইতে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন? তিনি বাল্যকালে বৃন্দাবনে তাঁহার ভাবী জীবনের মূলতত্ত্ব আপনার অভ্যন্তরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু তিনি যদি প্রকৃতির নিকটে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের নিকটে কিছু শিক্ষা করেন নাই, এ কথাই বা বলা যাইবে কি প্রকারে? তিনি গভীর শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, ইহা তাঁহার উপদেশনিচয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কথায় কথায় বলিতেন, দেখিতেছি, তুমি বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই। এ কথায় এই প্রকাশ পাইত যে, তিনি যেমন প্রকৃতির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেন, তেমনি বিস্তীর্ণ জনসমাজ হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতেন, কেন না তিনি বিস্তীর্ণ জনসমাজকেও প্রকৃতির রঙ্গভূমি বলিয়া জানিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে, আঙ্গিরসবংশোৎপন্ন ঘোর ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষযজ্ঞবিষয়ে উপদেশ দান করেন *। ক্ষুধা, পিপাসা, অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য ক্ষোভ, এই-গুলি দুঃখকর জন্য পুরুষযজ্ঞে দীক্ষা; পান, ভোজন, সুখপ্রাপ্তি, এইগুলি উহার উপসদ (অল্পভোজনীয় দিনসমূহের অবসানে পানাদিনিমিত্ত স্বাস্থ্যসুখ-প্রাপ্তি); হাসা, খাওয়া, মৈথুনাচরণ উহার স্তুতশস্ত্র (ঋগুচ্চারণ), তপ, দান, ঋজুতা, অহিংসা, সত্যবচন, এইগুলি উহার দক্ষিণা (৩।১৭।১—৪)। শ্রীকৃষ্ণ যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তৎসহ এই পুরুষযজ্ঞের যে সাদৃশ্য আছে, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। এই বিদ্যালাভ করিয়া, তিনি অন্য বিদ্যার প্রতি লালসাশূন্য হইলেন, এ কথাও তাঁহার সম্বন্ধে সত্য হইয়াছিল। ঘোর এবং কৃষ্ণ উভয়ে ঋক্‌কর্ত্তা

* "তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১৭।৬।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোরও আঙ্গিরসবংশোৎপন্ন, কৃষ্ণও আঙ্গিরস-বংশোৎপন্ন। ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত কৃষ্ণ ঋক্‌কর্ত্তা অথবা যদুবংশোৎপন্ন, এ সম্বন্ধে সংশয় হয়; কিন্তু 'দেবকীপুত্র' এই বিশেষণ দেখিয়া, যদুবংশোৎপন্ন কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। যদি এরূপ হয়, ছান্দোগ্যোপনিষৎ কৃষ্ণের সময়ে নিবদ্ধ, স্থির হইল। অনেক ঋক্ যখন যযাতিপ্রভৃতি নৃপতির সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ছান্দোগ্যোপনিষৎ কৃষ্ণের সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা তত অসম্ভব নয়। ভাষাসম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাতেও সংশয় করিবার কারণ নাই। তাপনীগুলি যখন অনেকটা বেদান্তের ভাষায় নিবদ্ধ, তখন ছান্দোগ্য সেই ভাষায় লিখিত হওয়া আর আশ্চর্য্য কি ? তবে এ কথা বলিতে হইতেছে, ঘোর ঋষি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপদিষ্ট উপদেষ্টার উপদেশের যে উৎকৃষ্ট নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

উপদেষ্টৃত্ব

শ্রীকৃষ্ণের যে সময়ে অভ্যুদয় হয়, সে সময়ের উপদেষ্টা, এবং তৎপর সময়ের উপদেষ্টায় অনেক পার্থক্য। সে সময়ে যিনি উপদেষ্টা হইতেন, তিনি ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীষ্ম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে উপদেষ্টৃ-পদে বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই উপদেষ্টৃপদে বরণ এবং ঈশ্বররূপে গ্রহণ তাঁহাদিগের পক্ষে একই ছিল। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে কি মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহার সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে অবলোকন করিতেন। তিনি যখনই উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরভাবে উপনীত করিয়াছেন, মানবীয় ভাবে নহে। এরূপ যে তিনি একা করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অভেদ ভাব প্রচলিত ছিল। যিনি যখন কোন ধর্ম্মমত পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি এইরূপ আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্ন বিশ্বাস করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন এই অভিন্ন ভাব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন অবলোকন করিতেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। যদিও তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আর তো তেমন করিয়া পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে বলিতে সমর্থ হইব না, আমি যে যোগযুক্ত হইয়া সেই পরমবেদ বলিয়াছিলাম" (অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা,

১৬অ, ১২—১৩ শ্লোক), তবু এ কথার এই অর্থ হইতে পারে যে, একবার ঈশ্বর মুখ হইতে সাধক যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, আবার সেই পুরাতন কথা সাধককে কখন তিনি বলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, "পুনরায় সে স্মৃতির উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই (অনুগীতা, ১৬অ, ১০ শ্লোক)", ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর সহ যথার্থ অভিন্নতাই প্রকাশ পাইতেছে; কেন না তিনি যদি ঈশ্বরে বাস না করিতেন, তাহা হইলে পুরাতন কথা লইয়া পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেন, এবং সে সকলও যেন এই মাত্র ঈশ্বরমুখ হইতে শ্রুত, এইরূপে শিষ্যসন্নিধানে উপস্থিত করিতেন। অর্জ্জুনকে এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যাদেশের মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই সহজ কথা।

শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে নিরন্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরভাবে গ্রহণ ভীষ্ম-প্রভৃতিও করিয়াছেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত যে, মহাভারতের এবং শ্রীচৈতন্যের সময়ের ধর্ম্ম একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ভীষ্ম-অর্জ্জুন-প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মা শ্রীচৈতন্য অপরাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে ইনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিলেন, ইঁহার নিকটে ইনি প্রেমমাধুর্য্যে পূর্ণ। এক জনকে লইয়া অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ পার্থক্যে এই দেখায় যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কেবল এক প্রকারের ভাব ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন ভাব ছিল, পাত্রভেদে তাঁহার এক এক ভাব প্রস্ফুটাকারে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভীষ্ম-প্রভৃতি তাহার জীবনের এক দিক্ দেখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য অপর দিক্ দেখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রেমাংশ লইয়া বাড়াবাড়ী করা হইয়াছে, সমস্ত মহাভারত পাঠ করিয়া, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু পরসময়ের সাধকগণের চক্ষে সেই অংশই বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং তাহাতেই শ্রীমদ্ভাগবতের উৎপত্তি। মহাভারতে নাই, এ কথা শুনিলে, মনে হইতে পারে যে, বাস্তবিক তাহা শ্রীকৃষ্ণেতে ছিল না; পরসময়ে কেবল কল্পনার সাহায্যে তাঁহাতে এ অংশ সংযুক্ত করা হইয়াছে। বৃন্দাবনের ঘটনাগুলির উল্লেখ মূলেই যদি মহাভারতে না থাকিত, তাহা হইলে এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের বিকাশ বৃন্দাবনে হইয়াছে, ইহা বলিতে অভিপ্রায়

না থাকিলেও, হরিবংশ প্রভৃতিতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্য জ্ঞানৈশ্বর্য্য পরিহার করিয়া, মথুরা দ্বারকার ঘটনাসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক, বৃন্দাবনের ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন; ভীষ্ম-প্রভৃতি তাহার বিপরীতে, পর সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিয়া, তিনি যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই লইয়াছেন, ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

পরম্পরাগত উপদেষ্টৃগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ অনুবর্ত্তিগণের নিকট ঈশ্বরত্বপ্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার সমুদায় জীবন তরঙ্গবর্জ্জিত ছিল; জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, কর্ত্তব্যপালন, এ সমুদায় পরস্পরের ভিতরে এমনই অনুপ্রবিষ্ট ছিল যে, কোন একটি বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থলে নিপতিত হইত না। তবে যে ব্যক্তিতে যাহা প্রধান ছিল, সে ব্যক্তি সেই অংশই তাঁহাতে বিশেষরূপে দেখিতে পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যত্ব প্রদর্শন না করিয়া, ঈশ্বরত্বপ্রদর্শন করিলেন কেন, এ প্রশ্ন বৃথা। পৃথিবীকে ঈশ্বর কি, তাহা না দেখাইয়া, ভক্ত কি, দেখান বিফল। যাহারা ঈশ্বরকে জানিল না, তাহারা তাঁহার ভক্তকে বুঝিবে কি প্রকারে? সমুদায় প্রাচীন কালের পর্য্যালোচনা করিয়া, এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরপ্রদর্শন জন্য উপদেষ্টৃমাত্রের জীবন নিঃশেষ হইয়াছে। "যে আমায় দেখিয়াছে, সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে" মহর্ষি ঈশার বচনের এই অংশ প্রাচীন উপদেষ্টৃগণের সাধারণ কথা। শ্রীকৃষ্ণেতে যে মানবীয়াংশ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য নহে, তাহা মানবেতে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাতে ঈশ্বরত্বদর্শন করিলেও, তাঁহার আচার্য্যত্ব * কখন অস্বীকার করেন নাই।

ভাগবত ও কৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর ভাগবত নিবদ্ধ, এ কথা তো বলিতেই হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনে বৃন্দাবনে গোপ, গোপবালক ও গোপকন্যাগণ সহ যে উদার ব্যবহার, তাহা লইয়া ভক্তির উন্নত অঙ্গপ্রদর্শন ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানৈশ্বর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার প্রেমমাধুর্য্য প্রদর্শিত

---

* "যোগাচার্য্যো রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা
স্থানং প্রাপ স্বং মহাত্মাপ্রমেয়ম্।"
মহাভারত, মৌসলপর্ব্ব ৪ অ ২৬ শ্লোক।

হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই, বৃন্দাবনের ভাব কে প্রথমে আশ্রয় করেন, এবং কাহারই বা প্রেরণায় ভাগবতের অভ্যুদয় হয়? নারদকৃত ভক্তিসূত্রে গোপীগণকে ভক্তির আদর্শস্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই নারদের প্রেরণায় ব্যাস ভাগবত নিবদ্ধ করিয়া শুকদেবকে শিক্ষা দেন, ভাগবতে এরূপ লিখিত আছে। পরিক্ষিতের রাজত্বকালে শুক তাঁহার নিকটে ভাগবত প্রচার করেন। ভারত ও ভাগবতের রচনাগত ও বিষয়গত পার্থক্য দেখিলে, নারদের ভাবে উদ্দীপ্ত ব্যাস, ব্যাসের ভাবে উদ্দীপ্ত শুককর্তৃক মূলানুসারী ভাগবত নিবদ্ধ *, ইহাই প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ভগবানের ঐশ্বর্য্য, গোপীগণেতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের মাধুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এ প্রেম আবার শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে সমুদ্দীপ্ত সুতরাং ভক্তিসম্বন্ধে গোপীগণের প্রাধান্য হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যাবরণে আবৃত বিশুদ্ধ প্রেম যে মূলীভূত হেতু, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে

---

* মহাভারত শান্তিপর্ব্বের চরমভাগে 'শুকাভিপতন' নামক অধ্যায় পাঠ করিয়া, অনেকে মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্ব্বে শুক যোগে কলেবরত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং পরসময়ে স্বপিতা ব্যাসের নিকটে ভক্তিশাস্ত্রশিক্ষা, ইহা কবিকল্পনামাত্র। "গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎ পরম্" (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৩ অ. ২৭ শ্লোক) শব্দাদিগুণপরিহার করিয়া, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন এরূপ উল্লেখ দেখাইয়া দেয় যে তিনি যোগে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর শুক তখন তখনই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা মানেন না; কেন না তখনও তিনি যখন সর্ব্বভূতের দর্শনপথগত ছিলেন, তখন তাঁহার দেহপরিত্যাগ হইয়াছিল, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্রামানুজভাষ্যের ব্যাখ্যাকার শ্রীমচ্ছঙ্করের এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি পথ দেখিয়াছি (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩২ অ. ৮ শ্লোক)", "ভূতগণ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল", তিনি "সর্ব্বভূতগত হইলেন (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৩অ, ২৩ শ্লোক)", যখন এরূপ লেখা আছে, তখন তিনি যে যোগে তখনই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। "ভূতগণ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল" এ পাঠ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এটি সংশয়াস্পদ। যদিই বা মানিয়া লওয়া হয় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই কেন না ইহাতে তিনি যে যোগে ভূতগণের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই দেখায়। "আমি পথ দেখিয়াছি" এ কথা তিনি যখন নারদকে বলিয়াছিলেন, সে সময়ে দেহে বিদ্যমান ছিলেন। 'শব্দাদিগুণপরিহার করিয়া, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন' এ কথাগুলিতে তনুত্যাগ বুঝায় না; কেন না নারদের উপদেশমত যখন তিনি প্রথমে যোগে রত হন, তখনই "স দদর্শ তদাত্মানং সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতম্ (শান্তিপর্ব্ব, ৩৩২ অ, ৫ শ্লোক)" তিনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়-

হইবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবননিহিত প্রেম-মাধুর্য্য মথুরা ও দ্বারকাতেও প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সেখানে মহিষীগণেতে আত্মসুখসম্বন্ধ থাকাতে, বালক কৃষ্ণে তৎসম্বন্ধশূন্য গোপীগণের উদার প্রেমের ব্যবহারই নারদাদি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া, ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগবত ভক্তি বলিতে গিয়া, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-বৈরাগ্য পরিহার করেন নাই, প্রস্ফুটভাবে সকলগুলিকে একত্র সমন্বিত করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ভীষ্ম-অর্জ্জুন-শাণ্ডিল্য-প্রভৃতি, আধুনিক সময়ে রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের দিক্ দিয়া উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া, জ্ঞানবিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের দিক্ প্রাচীন কালে নারদ-ব্যাস-শুক-প্রভৃতিকে এবং আধুনিক সময়ে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত, শ্রীচৈতন্য-প্রভৃতিকে উদ্দীপ্তহৃদয় করিয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানৈশ্বর্য্যপরায়ণ, তাঁহারা ভগবদ্গীতা এবং যাঁহারা প্রেমমাধুর্য্যপরায়ণ, তাঁহারা ভাগবত অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক, তদবলম্বনে আপনার পন্থা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্ত্ব, গোপীগণেতে ভক্তত্ব, এইরূপ ভিন্নতা ছিল। প্রেমপুণ্যে শ্রীচৈতন্যে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে। যোগে ঈশ্বর সহ কি প্রকার অভিন্নভাবে স্থিতি করা যায়, এবং তদ্রূপে স্থিতি করিলে

সমূহের সহিত আপনাকে সর্ব্ববিবর্জ্জিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। যদি বলা যায়, যদি এইরূপই হইবে, তবে ব্যাস এত অধীর হইয়া রোদনই বা করিলেন কেন, মহাদেবই বা কেন তাঁহার পুত্রের যোগপ্রভাবের কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পুত্র প্রব্রজন করিলেন, সংসার-ত্যাগ করিলেন, সমুদায় সম্বন্ধ কাটিলেন, এ জন্য পিতার তো শোক করিবারই কথা। ঈদৃশ ব্যক্তিকে মহাদেবের পুত্রের যোগিত্বের কথা কহিয়া সান্ত্বনাদান, ইহা অতি স্বাভাবিক। সুতরাং "যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব" ভাগবতের (১ স্ক, ২ অ, ২ শ্লোক) এ সকল কথায় অনবধানতা প্রকাশ পায় নাই, বাস্তবিক ঘটনাই উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগবত মহাভারতের পরে রচিত, অগ্রে শুকের দেহপতন হইয়াছিল, ইহা যদি বাস্তবিক ঘটনা হয়, তাহা হইলে ভাগবত ওরূপ কথা লিখিলেন কি প্রকারে? অবশ্য মৌলিক ভাগবতের সাত বার সংস্করণ হইয়াছিল, সংস্করণকর্ত্তা এক জন নহেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। "যং প্রব্রজন্তং" এ শ্লোক যদি সূতের না হইয়া আর কাহারও হয়, এরূপ সংশয় করিলেও, ভাগবতের সেই সংস্কর্ত্তা মহাভারত দেখেন নাই, সুতরাং ভ্রমে পড়িয়াছেন, এ কথা বলা সাহসিকতা। এ যে সাহসিকতা নয়, উপরে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

তাহার বাহ্য বিকাশ কি প্রকার হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; ভক্ত হইতে হইলে কিরূপ হইতে হয়, তাহা প্রদর্শন করেন নাই। এ জন্য তাঁহার প্রতি যাঁহারা একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের হইতে এ ভাব গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের যোগাভ্যন্তরে লুক্কায়িত প্রেমকে প্রস্ফুটরূপে পরিগ্রহ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বৈরাগী ভক্ত হইয়া, প্রেমযোগে হৃদয়ে ঈশ্বরকে বান্ধিলেন, সুতরাং এক দিকে তাঁহাতে ঈশ্বর আবির্ভূত হইলেন, অপর দিকে ভক্তত্ব প্রকাশ পাইল। এরূপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের এই বিষয়ে পার্থক্য রহিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম সহ যে নিত্য অভিন্নতাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য প্রকাশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য ব্রহ্ম সহ যে অভিন্নতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অত্যারূঢ় ভাবের অবস্থায় 'আমিই সেই' এইরূপ যে প্রেমোন্মাদ হয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোপীগণ অত্যারূঢ় ভাবের অবস্থায় 'আমিই সেই কৃষ্ণ' (ভাগবত, ১০স্ক, ৩০অ, ৩।১৭ শ্লোক) এইরূপ যে প্রমত্তযোগের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ভক্তত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।

ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাকে গোপীগণের সর্ব্বপ্রধানারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এরূপ করিলেন কেন, ইহা জানিবার বিষয়। গোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই অনুরাগ পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ লাভ করে, ইহা মানিতে হইবে। যে অনুরাগ 'মহাভাবে' পরিণত হয়, সে অনুরাগ সকলেতে সম্ভবে না, এক জনেতে সম্ভবপর। সেই এক জন তিনি তাঁহাকেই স্থির করিলেন, রাসকালে আর সকলকে পরিহার করিয়া, যাঁহাকে লইয়া তিনি বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গোপীসম্বন্ধে "এ অবশ্য ভগবান্ হরিকে আরাধনা করিয়াছে" ভাগবতে (১০স্ক, ৩০অ, ২৪ শ্লোক) এই উক্তি আছে বলিয়া, ইঁহাকে রাধারূপে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য বিশ্বাস করিতেন, আনন্দঘন ঈশ্বর আপনার আনন্দ ও চিৎস্বরূপের সারভূত যে প্রেম, তৎসম্ভূত ভাবনিচয়সহকারে নিত্যকাল বিহার করেন *। এই

---

* শ্রীচৈতন্যের এই বিশ্বাস দার্শনিক ভূমির উপরে স্থাপিত। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, তিনি নিজানন্দে নিজে পরিতৃপ্ত। তাঁহার বিহার ও ক্রীড়া আপনারই আনন্দসহকারে। সেই

সকল ভাব তাঁহারই স্বরূপশক্তি, ভক্তজনে সামান্যতঃ ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর যখন ভূতলে অবতরণ করেন, তখন এই সকল ভাবের অবতরণ হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অবতরণ ভিন্ন ভিন্ন গোপকন্যাতে এবং মহাভাবের অবতরণ শ্রীরাধিকাতে হইয়াছিল। যাহারা ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তিতে এই সকল ভাব আবির্ভূত হইয়া একাকার হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণসময়ে তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে, মথুরায় এবং দ্বারকাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব গোপকন্যা ও মহিষীগণেতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মহিষীগণও গোপকন্যা-গণের আবির্ভাব। গোপী বৈষ্ণবমতে প্রকৃতি, ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি, আনন্দ ও চিৎস্বরূপের সারভূত প্রেম। যদিও সুকোমলা ভক্তি নারীস্বরূপা, তথাপি পুরুষ-গণেতেও উহা আবির্ভূত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ ভক্তিতে ঈশ্বরসহকারে বিহার করিতে অভিলাষী হওয়াতে, তাঁহারা নারীত্বলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যে মহাভাবের এবং অন্যান্য ভক্তগণেতে অন্যান্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভক্তিতে নারীভাব প্রাপ্ত না হইলে, ঈশ্বরের লীলাবিহারভূমি হওয়া যাইতে পারে না, ইহা শ্রীচৈতন্যের বিশেষ মত। এই ভাবপ্রাপ্তি সর্ব্বথা অন্যাভিলাষপরিহার করিয়া, ঈশ্বরভজনায় প্রবৃত্ত না হইলে হয় না। ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে কেহ উহাকে লাভ করিতে পারে না, এই এক কথাতেই, ভক্তি ও পুণ্যের ঘনিষ্ঠযোগ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন, এই ষড়্‌বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় ছিল; কিন্তু সে সকলেতে এরূপ উচ্চ মত দৃষ্ট হয় না। এক শ্রীচৈতন্য এই অভূতপূর্ব্ব মত প্রকাশ করিয়া, ভক্তিপথের পূর্ণতাসাধন করিয়াছেন। জগৎ, জীব ও আত্মাতে ব্রহ্মদর্শনে একত্বরূপ মহাযোগ শ্রীকৃষ্ণের; ঈশ্বরের প্রেমাংশসম্ভূত ভাবনিচয়ের আবির্ভাবে মনোবৃত্তিসমূহকে পূর্ণ করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমিক ভক্তগণ সহ একত্বরূপ মহাভাব শ্রীচৈতন্যের। এই মহাযোগ ও মহাভাব বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে একাধারে মিলিত হইয়া, এক অভূতপূর্ব্ব মহাব্যাপার পৃথিবীতে উপস্থিত করিয়াছে। শম্!

আনন্দই তাঁহার প্রেম। ঈশ্বরের আনন্দ লাভ করিয়া যে ভাবে প্রেম সমুপস্থিত হয়, সেই জীবে ঈশ্বরের বিহার ঈশ্বরের স্বরূপ আবির্ভূত হওয়াতেই হইয়া থাকে। যোগ ঈশ্বরে নর প্রকৃতি বা পিতৃভাব এবং ভক্তি ঈশ্বরে নারীপ্রকৃতি বা মাতৃভাব প্রদর্শন করে।